ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ)

শরীয়তী রাষ্ট্রব্যবস্থা

অনুবাদ

জুলফিকার আহমদ কিসমতী



শরীয়তী রাষ্ট্রব্যবস্থা

মূল

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)

অনুবাদ

মওলানা জুলফিকার আহ্‌মদ কিস্‌মতী

[বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রবীণ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক]

আহসান পাবলিকেশন

কাটাবন ❒ বাংলাবাজার ❒ মগবাজার

শরীয়তী রাষ্ট্রব্যবস্থা
মূল : ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)
অনুবাদ : মওলানা জুলফিকার আহ্‌মদ কিসমতী

ISBN : 984-70012-0000-8

প্রকাশক
মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া
আহ্‌সান পাবলিকেশন
১৯১ মগবাজার (ওয়ারলেস রেলগেট)
ঢাকা-১২১৭, ফোন : ৮৩৫৩১২৭

প্রকাশকাল
জানুয়ারী, ২০০৮
জিলহাজ্জ, ১৪২৯
পৌষ, ১৪১৪

প্রচ্ছদ
নাসির উদ্দীন

কম্পোজ
র‍্যাক্স কম্পিউটার
কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস (৪র্থ তলা)
ঢাকা-১০০০, ফোন : ৮৬২২১৯৫

মুদ্রণ
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেট, ঢাকা-১২১৭

মূল্য : একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

SHARIATI RASTRO BEBOSTHA : (Shariati Conduct of State) Written in Arabic by Imam Ibn Taymiah (R) Translated into Bengali by Maulana Zulfiqar Ahmad Qismati and Published by Ahsan Publication Dhaka, Printed in January, 2008 Price : Tk. 150.00 only ($ 3.00)

AP-55/2008

আমাদের কথা

ইসলাম একমাত্র পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। মানব জীবনের এমন কোন দিক নেই যেখানে ইসলামের কোন দিক-নির্দেশনা নেই। মানব জীবনের সকল স্তরে ইসলামের সুনির্দিষ্ট অনুশাসন বিদ্যমান। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক, চারিত্রিক প্রভৃতি অংগনে ইসলামী আদর্শের একটি সুবিন্যস্ত ছাপ রয়েছে। গায়রুল্লাহর গোলামী ও মানুষের মনগড়া মতবাদের চোখ ধাঁধানো শৃঙ্খল থেকে ইসলাম মানব জাতির মুক্তি ঘোষণা করেছে এবং সর্বযুগ উপযোগী অবকাঠামো উপহার দিয়েছে। ইসলামী অনুশাসনমালার ব্যবহারিক দিক হচ্ছে শরীয়ত। শরীয়ত নির্ধারিত সীমানা বা চৌহদ্দীর মধ্যেই মুসলমানদের বিচরণ করতে হবে। এর বাইরে যাওয়ার অধিকার তাদের নেই। যদি কেউ এর বাইরে চলে যায় অর্থাৎ সীমানা লঙ্ঘন করে তাহলে সে আল্লাহদ্রোহী বলে গণ্য হবে।

মানব জীবনের বৃহত্তর বিচরণ ক্ষেত্র ইসলামী আদর্শের বলয়ভুক্ত। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পদ্ধতিও এর বাইরে নয়। সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে অদ্যাবধি রাষ্ট্র প্রশাসনকে কেন্দ্র করে যত মতবাদের জন্ম হয়েছে তা মানব মস্তিষ্ক প্রসূত। একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা এর ব্যতিক্রম। এর রচয়িতা এবং নিয়ন্ত্রণকারী স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। তাই এটা নিঃসন্দেহে নির্ভুল। জীবন পথের বন্ধুর পথ-পরিক্রমায় ধাপে ধাপে হোঁচট খাওয়ার সম্ভাবনা যেখানে প্রবল, সেখানে মানব রচিত মতবাদ যথার্থ অবদান রাখতে পারে না। কেননা তাতে ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা প্রচুর। আল্লাহ প্রদত্ত নির্ভুল বিধিমালার অনুসরণই মানুষকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে পারে। আর এর প্রকৃষ্টতম উপহার হচ্ছে শরীয়ত অনুমোদিত অনুশাসন পদ্ধতি।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন আলিম (মুহাদ্দিস, ফকীহ) ও মশহূর মুজাদ্দিদ (সংস্কারক)। শিরক ও বিদ'আত এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম মিল্লাতকে তাওহীদের মূল মন্ত্রে উজ্জীবিত করে আল্লাহ তা'আলার

খাঁটি বান্দা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর লেখনী ছিল অত্যন্ত ক্ষুরধার। রাষ্ট্র প্রশাসন ব্যবস্থায় অনৈসলামিক ভাবধারার মূলোৎপাটন করে তিনি মুসলিম সমাজকে নির্ভেজাল ইসলামী আদর্শের নিরিখে অবগাহিত করতে চেয়েছিলেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর লেখা اَلسِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ নামক গ্রন্থটি একটি অনবদ্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থের বাংলা তরজমাই হচ্ছে 'শরীয়তী রাষ্ট্রব্যবস্থা'। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক মওলানা জুলফিকার আহ্‌মদ কিস্‌মতী-এর অনুবাদক। জনাব কিস্‌মতী সাহেব একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক এবং চার-পাঁচ ভাষায় ব্যুৎপত্তিশালী, বহু মূল্যবান গ্রন্থের প্রণেতা, অনুবাদক ও সম্পাদক। তাঁর অনুবাদ বেশ প্রাঞ্জল ও সাবলীল।

বর্তমান সংস্করণে অনুবাদক গ্রন্থটি পুনঃ সম্পাদনা করায় অনুবাদটি আরও সমৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে মৌলিক পুস্তকের অভাবকে অস্বীকার করা যায় না। শরীয়তী রাষ্ট্রব্যবস্থা ও দণ্ডবিধির মৌলবিধান সম্বলিত গ্রন্থটি এ দেশের মুসলমানদের বহু দিনের প্রতিক্ষিত একটি অভাব দূরীকরণে যথেষ্ট অবদান রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস। পাঠক সমাজের হাতে এ জাতীয় একটি পুস্তক তুলে দিতে পেরে পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র দরবারে লাখো শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ্ আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন। – আমীন!

মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া
প্রকাশক

সূচিপত্র

❐ লেখকের ভূমিকা-৯

❐ অনুবাদকের কথা-১৩

❐ ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী-১৬

১. শরীয়তী শাসন কর্তৃত্বের দায়িত্ব ও কর্তব্য-২৫

২. ক্ষমতা ও শাসন কর্তৃত্বের যোগ্যতা-৩৪

৩. জনদরদি সাহসী নিষ্ঠাবান নেতৃত্ব-৩৯

৪. ইসলামে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের লক্ষ্য :
কুরআন সুন্নাহ্‌র শিক্ষা, আইন-কানুন বাস্তবায়ন-৪৭

৫. মাল-সম্পদ, ঋণ, যৌথ ব্যবস্থা, মুজারাবাত, আল্লাহর
নির্দেশিত মোকদ্দমার ফয়সালা ইত্যাদি-৫৬

৬. রাষ্ট্রীয় সম্পদ তিন প্রকার-৬৩

৭. যাকাতের খাতসমূহ-৬৯

৮. গনীমতের মালের আলোচনা এবং কর্মকর্তাদের অবৈধ কমিশন প্রসঙ্গ-৭১

৯. সরকারী আয়ের খাতসমূহ-৮৫

১০. ন্যায় বিচার ঃ অপরাধের খোদায়ী দণ্ডবিধি-১০৩

১১. ডাকাত-ছিনতাইকারীদের সাজা এবং যুদ্ধকালীন সময় সামরিক বাহিনীর যেসব কাজ নিষিদ্ধ-১২০

১২. সরকার বা রাষ্ট্র প্রধান হত্যাকারীদের শাস্তি প্রসঙ্গ-১৩২

১৩. সাক্ষ্য কিংবা নিজ স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে চোরের হাতটাকা প্রসঙ্গ-১৪৬

১৪. ব্যভিচারী ও সমকামীদের প্রস্তরাঘাতে সাজা-১৫২

১৫. মদ্যপায়ীদের সাজা-১৫৬

১৬. অপবাদের শাস্তি-১৬৬

১৭. যেসব অপরাধের সাজা অনির্ধারিত এবং শাসক ও বিচারকের ইচ্ছাধীন-১৬৭

১৮. যে ধরনের কোড়া দ্বারা অপরাধীকে শাস্তি দেবে এবং যেসব অঙ্গে কোড়া মারা যাবে না-১৭৭
১৯. শাস্তি ও শাস্তি প্রাপ্তদের শ্রেণী বিভাগ-১৭৮
২০. ফরয-ওয়াজিবের উপর আমল ও হারাম থেকে রক্ষার জন্যেই শাস্তি-২১০
২১. অশ্লীলতা, হত্যাকাণ্ড, নিকটাত্মীয়, দুর্বল, পর সম্পদ জবর দখল থেকে দূরে থাকা-২১৪
২২. জখমের কিসাস ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কিসাস-২২৫
২৩. বিভিন্ন ধরনের মানহানির কিসাস-২২৭
২৪. যিনা-ব্যভিচারের অপবাদ দানকারীর শাস্তি প্রসঙ্গে-২৩০
২৫. স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক ও অধিকার-২৩২
২৬. ধন-সম্পদের মীমাংসায় ন্যায়দণ্ড বজায় রাখা-২৩৪
২৭. দেশ পরিচালনায় পরামর্শ ভিত্তিক ব্যবস্থা-২৩৬
২৮. ক্ষমতা গ্রহণ ও শাসন পরিচালনা মহাদীনী কাজ-২৪২

লেখকের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান সত্তার জন্য, যিনি তাঁর নবী-রাসূলগণকে সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণাদি সহকারে মানব জাতির নিকট প্রেরণ করেছেন। যিনি মানুষের জন্যে সরল সোজা পথে চলার উদ্দেশ্যে এবং ন্যায়-নীতির অনুসারী হবার লক্ষ্যে নবী-রাসূলগণের সাথে কিতাব এবং মীযান তথা ন্যায়ের মানদণ্ড পাঠিয়েছেন। (সকল প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য) যিনি লোহা ও লৌহজাত বস্তু প্রেরণ করেছেন, যার মধ্যে একদিকে রয়েছে কঠিন শক্তি ও ভীতি, অপরদিকে রয়েছে মানব কল্যাণের অসংখ্য উপকরণ।

আল্লাহ্ তা'আলাই এ ব্যাপারে সব চাইতে বেশী অবগত যে, কার সাহায্য করা এবং কাকে পয়গম্বর বানানো উচিত। তিনিই একক শক্তিমান, প্রবল পরাক্রমশালী সত্তা, যিনি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে নবুয়্যত ধারার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন এবং তাঁকে শেষ নবী বানিয়েছেন।

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَه ...... شَهِيْدًا -

"আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে পথ-নির্দেশক বিধি-বিধানসমূহ এবং সত্য জীবন ব্যবস্থা দিয়ে এজন্যে প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি সকল মনগড়া জীবন ব্যবস্থা ও ধর্ম মতাদর্শের উপর এর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন।" (সূরা ফাতাহ : ২৮)

মহানবীর মদদকল্পে তিনি পাঠিয়েছেন "সাহায্যকারী বলিষ্ঠ দলীল," জ্ঞান-প্রজ্ঞা, কলম, হিদায়াত, যুক্তি-প্রমাণ, ক্ষমতা, শক্তি-সামর্থ্য, প্রভাব প্রতিপত্তি ও (শক্তির প্রতীক) তরবারী। বলাবাহুল্য, মান-মর্যাদা ও অন্যায়-অসত্যের উপর বিজয়ের জন্যে এ সকল গুণ অত্যাবশ্যক। আমি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত মা'বূদ হবার যোগ্য অপর কোন সত্তা নেই, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁর কোন সহকর্মী ও সমকক্ষ নেই। এ সাথে আরও ঘোষণা করছি যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহ্র একজন বান্দা ও রাসূল। তাঁর প্রতি আল্লাহ্র অসংখ্য রহমত বর্ষিত হোক। রহমত বর্ষিত হোক তাঁর বংশধর ও সকল সাহাবীর উপর। তাঁদের উপর নেমে আসুক শান্তি, করুণার অফুরন্ত ধারা। আমার এই ঘোষণা ও সাক্ষ্যদান হোক সেই মর্যাদার অধিকারী, যদ্দারা ঘোষণাকারী সকল সময়ের জন্যে খোদায়ী নিরাপত্তা ও তত্ত্বাবধানে চলে যায়।

গ্রন্থটি লেখার মূল প্রেরণা

মূলতঃ এটি একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ হলেও তাতে আল্লাহ প্রদত্ত রাজনৈতিক বিধি-ব্যবস্থা এবং মহানবীর প্রতিনিধিত্বের বিষয়সমূহ পরিপূর্ণরূপে বিবৃত হয়েছে। এ থেকে সকল শাসক, শাসিত, রাজা-প্রজা কারও পক্ষেই কোন অবস্থায় আপন দায়িত্বের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন বা তা থেকে অব্যাহতি লাভের কোন অবকাশ নেই। এ গ্রন্থ রচনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সকল কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা এবং দেশের নীতি নির্ধারক, পরিচালকবৃন্দকে এমন উপদেশ বা পথ নির্দেশনা প্রদান করা, যা আল্লাহ তা'আলা ঐসব শাসক-পরিচালকের উপর অপরিহার্য করে দিয়েছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন :

اِنَّ اللّٰهَ يَرْضٰى لَكُمْ ثَلاَثَةً اَنْ تَعْبُدُوْهُ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـئًا وَاَنْ تَعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَلاَ تَفَرَّقُوْا وَاَنْ تَنَاصَحُوْا مَنْ وَلاَّهُ اللّٰهُ اَمْرَكُمْ ـ

"তিনটি কাজে আল্লাহ তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। (১) তোমরা একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব করবে, (২) তাঁর সাথে অপর কাউকে শরীক করবে না, (৩) সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ় হস্তে ধারণ করবে এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না আর আল্লাহ তোমাদেরকে যাদের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করেছেন, তাদেরকে সদোপদেশ প্রদান করবে।"

"আস্‌সিয়াসাতুশ্ শারইয়্যা" বা শরীয়তী রাষ্ট্রব্যবস্থা গ্রন্থটির মূল ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহর কিতাবের সে সকল আয়াত, যেগুলোতে বলা হয়েছে যে–

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا ـ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ـ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ـ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا ۢ بَصِيْرًا. (٥٨) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ـ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ـ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلاً.

"(মুসলমানগণ!) আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ করছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ অর্থাৎ মানুষের অধিকারসমূহ ঐগুলোর মালিক তথা হকদারদের কাছে পৌছে দাও। তোমরা যখন জনগণের পারস্পরিক বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্যোগ নাও, তখন ন্যায়-নীতির মধ্য দিয়ে তা ফয়সালা করো। আল্লাহ তোমাদের যে উপদেশ প্রদান করেন, সেটা তোমাদের জন্যে কতই না উত্তম। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ সব কিছুই অধিক শুনেন, অধিক দেখেন। (হে মুসলমানগণ!) তোমরা আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলো এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশ মেনে চলো আর মেনে চলো তোমাদের (রাষ্ট্রীয়) দায়িত্বশীল নেতাদের নির্দেশও। অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন প্রকার মতবিরোধ দেখা যায়, আল্লাহ তা'আলা এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের শর্ত হচ্ছে, বিরোধীয় বিষয়টির ফয়সালা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের হাওলা করো। এটা যেমন তোমাদের জন্য উত্তম, তেমনি পরিণামের জন্যে অতি শ্রেয়।" (সূরা নিসা : ৫৮-৫৯)

শরীয়ত বিশেষজ্ঞ আলিমদের অভিমত হলো, প্রথমোক্ত আয়াতটি إِنَّ اللَّهَ ...يَأْمُرُكُمْ রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারক কর্মকর্তা এবং প্রশাসনিক কর্তৃত্বের সাথে সংশ্লিষ্টদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। তারা যেন জনগণের অধিকারসমূহ তাদের দোরগোড়ায় পৌছে দেন এবং মামলা-মোকদ্দমা ও জনগণের অন্যান্য অভিযোগের ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করেন।

দ্বিতীয় আয়াতটির أَطِيعُوا اللَّهَ... مِنْكُمْ মধ্যদিয়ে প্রজা সাধারণ ও বিভিন্ন বাহিনীর লোকদের বলা হয়েছে, তারা যেন নিজ নিজ নেতা ও কর্মকর্তাদের কথা মেনে চলেন। এসব কর্মকর্তাই সরকারী সম্পদ বণ্টন এবং যুদ্ধের নির্দেশসমূহ জারি করেন, যুদ্ধ বিগ্রহ ইত্যাদিতে কাজ করেন। তবে যে স্তরের নেতাই হোন তিনি আল্লাহ্র অবাধ্য হওয়ার নির্দেশ দিলে তা মানা যাবে না এবং আল্লাহর নির্দেশের পরিপন্থী কোনো আইন বা হুকুম করলে কখনও তা পালন করবে না। এ ব্যাপারে মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন যে,

لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ.

"স্রষ্টার অবাধ্যতাজনিত কাজের হুকুম করা হলে তা মানা জায়েয নেই।"

অতএব, যখন কোন ব্যাপারে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তখন তোমরা মনোনিবেশ করো কুরআন ও সুন্নাহ কি বলে সে দিকে অতঃপর সে অনুযায়ীই ফয়সালা করো। বিবাদমান ব্যক্তিরা যদি এভাবে বিরোধ নিষ্পত্তি

না করে, তখন রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের উপর ফরয হলো উপরোল্লেখিত আয়াতের নির্দেশ অনুসারে কাজ করা এবং আল্লাহর নির্দেশকেই কার্যকর করা। আল্লাহর নির্দেশ হলো :

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

"কল্যাণ এবং সংযমী হবার কাজে তোমরা একে অপরের সহযোগিতা করো এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে অপরকে সহযোগিতা করো না।" (সূরা মায়িদা : ২)

এ আয়াত অনুযায়ী কাজ করা হলে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা হবে এবং তাদের হকও যথারীতি আদায় হবে।

উল্লেখিত আয়াতের মধ্যে আমানত আদায় করা ও হকদারের হকসমূহ তার কাছে যথাযথ পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য, আমানত আদায় তথা জনগণের অধিকার প্রদান করা ও তাতে ন্যায়-নীতির অনুসরণ– এ দু'টি বিষয়ই হচ্ছে ন্যায়-নীতির শাসন, সৎ নেতৃত্ব এবং কল্যাণ রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য। এর মধ্যদিয়েই আমানত আদায় হবে।

অনুবাদকের কথা

ইসলাম এবং রাজনীতি বিষয়ক এ গ্রন্থখানা ৭ম ও ৮ম হিজরীর বিশ্ব বিখ্যাত রাজনীতিবিদ, সংস্কারক শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)-এর সুবিখ্যাত গ্রন্থ– "আস্‌সিয়াসাতুশ্‌ শারঈয়া"-এর বঙ্গানুবাদ "শরীয়তী রাষ্ট্রব্যবস্থা"। পাঠক-পাঠিকাদের খিদমতে বাংলা ভাষায় এই মূল্যবান গ্রন্থখানা পেশ করতে পেরে আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) এ গ্রন্থখানা এমন এক যুগে লিখেছিলেন যখন গোটা মুসলিম বিশ্ব তার রাজনৈতিক দৃঢ়তা, স্থিতিশীলতা প্রায় হারিয়ে ফেলে। মুসলমানদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব হয়ে পড়ে বিপর্যস্ত। পরস্পর বিরোধী বহু মতবাদের প্রসার ঘটে। ইসলামী রাষ্ট্র দিনের পর দিন প্রায় দুর্বল হয়ে পড়ে।

মূলত হিজরী সপ্তম শতক ছিল মুসলমানদের জন্য একটি পরীক্ষার যুগ। এ অধঃপতনের প্রধান কারণ ছিল চরিত্র ও কর্মে কুরআন ও সুন্নাহর মৌল নীতিমালার অনুসরণ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলার সাধারণ ব্যাধি, রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা এবং অস্থিরতা আল্লাহর আযাবের রূপ ধরে গোটা জাতির উপর আপতিত হয়েছিল।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)-এর কাছে এ দৃশ্য ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তিনি শেষ পর্যন্ত আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে মসী ও অসি উভয় প্রতিরোধের অস্ত্র ধারণ করলেন। জাতির সামনে জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তব্য রাখলেন। তাঁর সত্য ভাষণ অনেকের স্বার্থে আঘাত হানলো, অনেক সংকীর্ণ ও স্থূল চিন্তার লোক বিরুদ্ধাচরণ শুরু করলো। তিনি কোন প্রকার বিরোধিতাকে পরোয়া না করেই নির্ভীকচিত্তে ন্যায় ও সত্যের বাণী বলে যেতে লাগলেন। অবশেষে এক পর্যায়ে মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য-সংহতির ভাব জাগ্রত হতে থাকলো।

বর্তমানে মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রশ্নে অনৈক্য, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও হীনমন্যতা লক্ষ্য করা যায়। হিজরী সপ্তম শতকের তুলনায় তা কিছুমাত্র অধিক নয়। এটা ঠিক যে, এখন প্রায় প্রতিটি মুসলিম দেশেই রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মুসলমানরা রাজনৈতিক ভারসাম্য ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। তার প্রধান কারণ হলো, ঐ সকল মৌল নীতিমালা থেকে তাদের বিচ্যুতি, যেগুলোকে ইসলাম "আস্‌সিয়াসাতুশ্‌ শারঈয়া" বলে উল্লেখ করে থাকে।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র) তাঁর এ গ্রন্থে ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে লিপিবদ্ধ করেছেন। এ গ্রন্থে তিনি এ বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন যে, মানব জীবনের সকল বিভাগ– চাই সেটা প্রশাসনিক হোক, কি নৈতিক বা ব্যবহারিক, অর্থনৈতিক– এজন্য ইসলাম যে ব্যবস্থা দিয়েছে, সেটাই শাশ্বত ও চূড়ান্ত। ইসলামের প্রদত্ত এসব নীতিমালার অনুসরণ ছাড়া সমাজকে দুর্নীতি মুক্ত রাখা, এর উন্নতি, অগ্রগতি ও শ্রীবৃদ্ধি যেমন সম্ভব নয়, তেমনি সরকারী প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাকে কলুষমুক্ত, শক্তিশালী ও স্থিতিশীল রাখাও অসম্ভব।

"আস্‌সিয়াসাতুশ্‌ শারঈয়া"-এর লেখক শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) এমন এক বিশ্ব বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, যাঁর পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না। তিনি যে বিষয় বস্তুর উপর কলম ধরেছেন, সে বিষয়েরই চূড়ান্ত আলোচনা করেছেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থরাজির সব চাইতে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তাঁর বক্তব্য কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক। বিশেষ করে তিনি বুখারী এবং মুসলিম থেকে অধিক প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। ছোট বড় বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন।

"আসসিয়াসাতুশ শারঈয়া" গ্রন্থটি অধিক বড় না হলেও এর মধ্যে তিনি রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক মৌল নীতিমালাসমূহ কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে স্পষ্ট তুলে ধরেছেন।

পরিতাপের বিষয় যে, আজকের মুসলিম মিল্লাতের সামনে এ মূল্যবান গ্রন্থ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও হীনমন্যতা ও অজ্ঞতাবশতঃ মুসলমানদের কেউ কেউ রাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে অপরের দ্বারে ধর্ণা দেয়। অথচ ইসলাম রাজনৈতিক যে সকল মৌল বিধান ও নীতিমালার উপর দেশ শাসন ও রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনার ভিত্তি স্থাপন করেছে, এর সাহায্যে গোটা মুসলিম দুনিয়া পুনরায় নিজের মধ্যে ইসলামের সেই প্রাণসত্তা খুঁজে পেতে পারে, যা ইসলামের সোনালী যুগে ছিল। বিশ্বের মানব রচিত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার অন্তসার শূন্যতা ও মানব সমাজে শান্তি আনয়নে ব্যর্থতার দাবী হলো, ইসলামী মূল্যবোধ-এর সুমহান নীতিমালার ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন-প্রশাসন ব্যবস্থাকে পুনরায় সক্রিয় করে তোলা।

পৃথিবীর সকল শাসক, প্রশাসক বিশেষ করে মুসলিম দুনিয়ার রাষ্ট্র প্রধান ও প্রশাসনযন্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সামনে গ্রন্থটি এমন এক পথনির্দেশক গ্রন্থ, তাঁরা যদি এটি গভীর মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করেন, তাহলে নিঃসন্দেহে তাঁদের সামনে সুষ্ঠু রাষ্ট্র পরিচালনা ও জনকল্যাণ রাষ্ট্র উপহার দানের লক্ষ্যে ইসলামী রাজনীতির এক বাস্তব ছবি ফুটে উঠবে। এর ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনার

দ্বারা তাঁরা জন-সমস্যাবলীর সমাধান, তাদের জীবনমানের উন্নতি বিধানে সকলের হৃদয় জয় করতে পারেন– শান্তি পিয়াসী জগদ্বাসীকে দিতে পারেন সার্বিক শান্তি, কল্যাণ, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির নতুন পথনির্দেশনা।

গ্রন্থটির যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ব্যাখ্যা সাপেক্ষ, সেখানে এ গ্রন্থের বিশিষ্ট ভাষ্যকার আবুল আলা মুহাম্মদ ইসমাইলের বক্তব্যকে টীকারূপে ব্যবহার করে এর গুরুত্বকে আরও বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ইসলামের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উপর লিখিত আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার এ সুপ্রাচীন মূল্যবান গ্রন্থখানার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করায় 'আহসান পাবলিকেশনের' প্রতি জানাই আন্তরিক শুকরিয়া ও মুবারকবাদ।

ইসলামের জন্যে নিবেদিত প্রাণ মর্দে মুজাহিদ আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র) মানব কল্যাণের যে সুমহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে এ গ্রন্থখানা রচনা করেছেন, এর বঙ্গানুবাদের পেছনেও অভিন্ন লক্ষ্যই সক্রিয়। আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বস্তরে নাগরিক চরিত্রকে অপরাধ প্রবণতা মুক্ত করা, সকল প্রকার দুর্নীতির উচ্ছেদ ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য চাই খোদায়ী নিরপেক্ষ আইন। শ্রেণী বৈষম্যমুক্ত এই আইন ও ব্যবস্থার অনুপস্থিতিই সমাজে অন্যায় অবিচারজনিত অপরাধ প্রবণতার জন্ম দেয়। অবশেষে ঐ অপরাধ প্রবণতা সমাজ চরিত্রে আরও হাজারো অপরাধ প্রবণতাকে উস্‌কে দেয়। প্রত্যেক কাজে জবাবদিহিতার চেতনা সম্বলিত এই খোদায়ী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এ সবের অবকাশ নেই বলেই সৎ নেতৃত্বের অধীন এই ব্যবস্থা সমাজে, রাষ্ট্রে শান্তি কল্যাণ ও জনসমৃদ্ধি আনতে সক্ষম। "আল্লাহর দীনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে" এ গ্রন্থ সহায়ক হোক, এই গ্রন্থ পাঠে রাষ্ট্রীয় নীতি আদর্শের ব্যাপারে সকল বিভ্রান্তির অবসান ঘটুক, আল্লাহর কাছে এ মুনাজাতই রইল।

– জুলফিকার আহ্‌মদ কিস্‌মতী

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

মুসলিম জাতিকে অনুকূল প্রতিকূল উভয় অবস্থার মধ্যদিয়েই সামনে এগিয়ে আসতে হয়েছে। খৃস্টীয় তের এবং চৌদ্দ শতকের মুসলিম দুনিয়ার ইতিহাস ছিল বড় করুণ ও মর্মান্তিক। সর্বত্র অশান্তি, অস্থিরতা ও ভাঙ্গনের জোয়ার দেখা দিয়েছিল। তাদের সকল ঐতিহাসিক বীরত্বের কাহিনী যেন আরব্য উপন্যাসের কাহিনীতে পরিণত হয়েছিল। ভীরুতা, নিষ্ক্রীয়তা মুসলমানদের আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিল।

ঠিক সে সময় অর্থাৎ তের শতকের প্রারম্ভে মঙ্গোলিয়ার মরুচারী তাতারিয়া গোষ্ঠী প্রগৈতিহাসিক যুগের অসভ্য বর্বরদের অনুকরণে তাদের দলপতি চেংগীজ খানের নেতৃত্বে মুসলিম জাহানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সর্বপ্রথম আজকের রুশ অধিকৃত বুখারার তৎকালীন শাসনকর্তা সুলতান মুহাম্মদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। জীহুন নদীর উত্তরে এক বিশাল প্রান্তরে সুলতানের চার লাখ আট হাজার সৈন্য চেংগীজ বাহিনীকে আক্রমণ করে এবং প্রথম দিনের যুদ্ধেই এক লাখ ৬০ হাজার সৈন্য নিহত হয়। এভাবে পরবর্তী যুদ্ধে সুলতান মুহাম্মদের সৈন্যরা নির্মমভাবে পরাজিত ও নিহত হয়। এরপর মঙ্গোলীয় তাতার সৈন্যরা মুসলিম রাজ্যগুলো একের পর এক ধ্বংস করে সামনে অগ্রগর হতে থাকে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অন্য দিক থেকে সুসমৃদ্ধ দামেশক ও তৎকালীন মুসলিম দুনিয়ার রাজধানী বাগদাদ নগরীও তাতারীদের অত্যাচার ও ধ্বংসের লীলাভূমিতে পরিণত হয়।

রাজনৈতিক এ পতনের সাথে সাথে মুসলমানরা ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা ও চরিত্রেও অধঃপতনের শেষ প্রান্তে গিয়ে উপনীত হয়। তৎকালীন সময় শিক্ষিত বলতে সমাজের আলিমদেরকেই বুঝাতো। আলিমগণের মধ্যে ইখতিলাফ ও মতবিরোধ চরমে উঠে। সাধারণ বিষয়কে কেন্দ্র করেও একদল মুসলমান আরেক দলকে নির্মমভাবে হত্যা করতে ও তিরস্কারবানে জর্জরিত করতে দ্বিধা করতো না। আলিমদের পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ দলাদলির ফলে মুসলিম সমাজ শতধাবিভক্ত ও দুর্বল হয়ে পড়ে। মুসলমানদের সেই অনৈক্যের সুযোগে দুশমনরা এ জাতির সব তছনছ করে ফেলে।

অপরদিকে ইসলামের প্রাণসত্তাকে নিঃশেষকারী বিদ'আত, শিরক, পীর পূজা, কবর পূজা ইত্যাদি কুসংস্কার মারাত্মকরূপে বিস্তার লাভ করে। তাওহীদের বাস্তব সংজ্ঞা এক রকম বিলুপ্ত হবার পথে। কুরআন, সুন্নাহ্‌র শিক্ষা অনুসরণের চাইতে বিদ'আতী পীর-মাশায়েখের বক্তব্যকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হতে থাকে। ইসলামের বিশুদ্ধ ধারণা ও এর নির্মল জ্যোতি প্রায় বিলুপ্তির পথে। অজ্ঞতার অন্ধকার যখন এভাবে মুসলমানের ঈমানী জ্যোতিকে প্রায় নিষ্প্রভ করে দিচ্ছিল, ঠিক তখনই দামেশকের আকাশে এক উজ্জ্বল সূর্যের উদয় ঘটলো। তিনিই হলেন আল্লামা তাকিউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আবদুল হালীম ইবনে আবদুস সালাম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবুল কাসিম শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া আল হাওয়ানী আল দামেশকী।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া ইতিহাসের এই ক্রান্তিলগ্নে আবির্ভূত হয়ে বাতিল আকীদা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেন। তিনি এ সবের বিরুদ্ধে এক রকম জিহাদ ঘোষণা করেন। জিহাদী প্রেরণাদীপ্ত তাঁর এই সংস্কারধর্মী আন্দোলন ছিল বহুমুখী। লেখা, বক্তৃতা ও আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে সশস্ত্র লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ সকল উপায়ে তাঁর এই প্রতিরোধ চলে। সকল প্রকার বিরোধিতা ও অজ্ঞতার মধ্যেই তিনি তাঁর অনুসারীদের নিয়ে নির্ভীকভাবে কাজ করে যান। ন্যায় এবং সত্যের বাণীকে সমুন্নত রাখতে গিয়ে তাঁকে অনেক দুঃখ কষ্টেরই সম্মুখীন হতে হয়। তিনি বন্দী জীবন যাপন করেন। কারা-জীবনের দুঃসহ যন্ত্রণা তিনি ঈমানী শক্তি বলে সহ্য করেন।

শাসকবৃন্দ রাজা-বাদশাহ, আমীর-উমারাদের অনৈসলামিক ভূমিকার প্রতিবাদ ও বিরোধিতার কারণেই তিনি তাদের রোষানলে পড়েন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) সততা, নিঃস্বার্থতা ও আল্লাহর পথে ঈমানী দৃঢ়তার পরিচয় দিতে গিয়ে যেই জুলুম-নিপীড়ন ও ভ্রুকুটি সহ্য করেছেন, তার নজির অতি বিরল। দীনের জন্যে আত্মত্যাগের কঠিন অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি যদি "আফজালুল জিহাদ" তথা "অত্যাচারী শাসকের সামনে ন্যায় ও সত্য কথা বলা উত্তম জিহাদ"-এর চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সংগ্রামের পথ দেখিয়ে না যেতেন, তাহলে পরবর্তী যুগে বিভ্রান্ত অত্যাচারী মুসলিম শাসক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মারমুখো ব্যক্তিদের সামনে হক কথা বলার লোকের অভাব দেখা দিত। সংগ্রামী ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)-এর গোটা কর্ম জীবনের প্রতি তাকালে তাঁর সম্পর্কিত এ সকল বক্তবকে অতিশয়োক্তি বলার কোন উপায় নেই।

প্রায় আটশ বছর অতীত হয়ে যাবার পরেও তাঁর লিখিত মূল্যবান গ্রন্থসমূহের চাহিদা ও জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়নি। মিসর, হেজাজ, ইরান প্রভৃতি দেশের অসংখ্য লাইব্রেরীতে ইবনে তাইমিয়া (র)-এর গ্রন্থাবলী সংশ্লিষ্ট সমাজের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে আছে। বার্লিন, লন্ডন, ফ্রান্স ও রোমের বহু পাঠাগারের শোভাবর্ধন করছে এ সংগ্রামী মনীষীর জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থাবলী।

তিনি তাঁর ক্ষুরধার লেখনী দ্বারা একদিকে ইসলামের 'সীরাতুল মুস্তাকীম'কে যাবতীয় আবিলতা মুক্ত করার চেষ্টা করেছেন, অপরদিকে সকলকে যাবতীয় বিভ্রান্তির পথ পরিহার করে আল্লাহ্‌র শাসন ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর যুগে যে তাগুতী শক্তি ইসলাম এবং মুসলমানদের চলার পথকে অবরোধ করে এগিয়ে এসেছিল, তিনি তার বিরুদ্ধে তরবারীও ধারণ করেন। ফলে চেংগীজী বর্বরদের পাশবিক বিক্রমকেও এর সামনে প্রতিরুদ্ধ হতে হয়েছিল। বলাবাহুল্য, ইসলামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র) যেভাবে সর্বাত্মক সংগ্রাম করে গেছেন, পরবর্তী যুগে সঠিকভাবে প্রতিটি মুসলিম দেশের ইসলামী নেতৃত্ব যদি সেই জিহাদী ভাবধারা অনুসরণ করতে পারতেন, তাহলে মুসলিম দুনিয়ার ইতিহাস অন্যভাবে গড়ে উঠতো। তা না হওয়াতেই মুসলমানরা আজ সর্বত্র তাগুতী শক্তির করুণার পাত্র।

জন্ম

৬৬১ হিজরী সালে রবিউল আউয়াল মাসের দশ তারিখ হাররান নামক এক শহরে ইবনে তাইমিয়া (র)-এর জন্ম হয়। তাঁর সাত বছর বয়সে যখন এ শহরটি তাতারীদের আক্রমণের শিকার হয়, তিনি তখন তাঁর পিতার সাথে জন্মভূমি ত্যাগ করে দামেশকে চলে যান। কুরআন হিফজসহ অন্যান্য প্রাথমিক শিক্ষা তিনি ঘরেই লাভ করেন। অতঃপর ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের তৎকালীন প্রাণকেন্দ্র দামেশকের বড় বড় সুদক্ষ উস্তাদদের কাছে তিনি ইসলামী শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

তাঁর জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও কর্ম-কৌশলের কথা অল্পদিনেই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। হাদীসশাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্ব এতই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, জনগণ এই বলে বলাবলি করতো, "ইবনে তাইমিয়া যে হাদীসকে হাদীস বলে জানেন না, তা আদৌ হাদীস নয়।" ইবনে তাইমিয়া সকল সমস্যার সমাধান কুরআনের আয়াতের আলোকে পেশ করতেন। তিনি পূর্ববর্তী যুগের তাফসীরকারকদের কোন ভ্রান্তি থাকলে, তা পরিষ্কার ভাষায় তুলে ধরতেন। মাত্র বিশ বছর বয়সে, তিনি এই জ্ঞান বৈদগ্ধ ও দক্ষতা অর্জন করেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল গম্ভীর, সরস ও মিষ্ট; ঐতিহাসিক ইবনে

কাসীরের মতে "ইবনে তাইমিয়া (র)-এর উপদেশপূর্ণ অপূর্ব ও জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শুনে অনেক বড় বড় পাপী, আল্লাহদ্রোহীও তওবা করে সৎপথের অনুসারী হয়েছে।" শেখ সালেহ্ তাজুদ্দীন বলেন : আমি ইবনে তাইমিয়া (র)-এর অধ্যাপনা কক্ষে রীতিমতো হাযির থাকতাম। তিনি বন্যার গতিতে ছুটতেন, খরস্রোতা নদীর মতো প্রবাহিত হতেন। শ্রোতামণ্ডলী চোখ মুদে স্তব্ধ বসে থাকতো। অধ্যাপনা শেষে তাঁকে অধিক গম্ভীর ও ভয়ঙ্কর মনে হতো অথচ তিনি ছাত্রদের সাথে স্নিগ্ধ হাসি ও খোশ মিজাযে কথা বলতেন। অধ্যাপনার সময় তাঁকে মনে হতো, তিনি এক অদৃশ্য জগতে বিচরণ করছেন এবং পর মুহূর্তে দুনিয়ার বাস্তব জগতে ফিরে এসেছেন। জীবনের অধিকাংশ সময় কারা-প্রকোষ্ঠে অতিবাহিত করলেও তাঁর স্বল্পকালীন শিক্ষকতার যুগে ছাত্রদের সংখ্যা কয়েক হাজারে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর কয়েকজন ছাত্র যারা ছিলেন বিদ্যায়, জ্ঞানে, প্রতিভায়, কর্মদক্ষতায় ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে তৎকালীন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। যেমন, আল্লামা ইবনে কাইয়্যেম, আল্লামা যাহবী, হাফিজ ইবনে কাসীর, হাফিজ ইবনে কুদামাহ্, কাযী শরফুদ্দীন, শায়খ শরফুদ্দীন প্রমুখ মনীষীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আরবী ভাষায় গ্রীক দর্শনের অনুবাদ শুরু হয় হিজরী দ্বিতীয় শতকে। তখন থেকে মুসলিম সমাজের উপর গ্রীক দর্শনের বস্তুবাদী মর্মবাদের প্রভাব পড়ে। ফলে মানুষ খাঁটি ইসলামী জীবন দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি হারিয়ে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সকল কিছু চিন্তা করতে শুরু করে। আব্বাসীয় রাজত্বের শুরুতে এ যুক্তিবাদী আন্দোলন অন্ধ আবেগের রূপ নেয়। এই মু'তাযিলাবাদ "খালকে কুরআনের" ন্যায় তুমুল ঝগড়ার উৎপত্তি করে। মুতাযিলাবাদ কুরআন পন্থীদেরকে গ্রীক দর্শনের দুর্জয় প্রভাবে পরাজিত করছিল। "কালাম শাস্ত্র" মুসলিম সমাজকে সূক্ষ্ম মানতিকী আলোচনায় ব্যস্ত রেখে বাস্তব কর্মজগত থেকে একেবারে গাফিল করে দিচ্ছিল।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) মুসলিম দুনিয়াকে এ অবাঞ্ছনীয় অর্থহীন গুমরাহীর পথে ধাবিত হতে দেখে এর বিরুদ্ধে কলম ধারণ করেন। ৬৯৮ হিজরীতে তিনি একটি কিতাব লিখে 'মুতাকাল্লেমীন'-এর আকীদা ও ধ্যান-ধারণার তীব্র সমালোচনা করেন এবং একে বাতিল প্রমাণ করে কুরআন ও সুন্নাহর নির্ভেজাল আদর্শকে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন। এ গ্রন্থ ভ্রান্ত মতাবলম্বীদের বুকে তীরের আঘাত হানে। এ কিতাবের দ্বারা তিনি চিন্তা জগতে এক নতুন বিপ্লব নিয়ে আসেন। এর কারণেই তাঁর নির্যাতনমূলক জীবনের সূচনা ঘটে।

ইমামের মতবাদ সম্পর্কে মিসরের শাসনকর্তা নাসের শাহের নিকট বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপিত হলে ৭০৫ হিজরীতে তিনি দামেশকের গভর্নরকে স্থানীয় আলিমদের একটি মজলিস ডাকার ও ইমামের মতবাদ পরীক্ষা করে দেখার নির্দেশ দেন। একাধিক বৈঠকে ইমামের মতই প্রাধান্য লাভ করে।

সূফীদের নাম ভাঙ্গিয়ে ভণ্ডপীর-ফকীর-দরবেশের পেশাধারী একশ্রেণীর লোক যেমন আজকাল অর্থোপার্জন করে এবং তাদের কাছে অসংখ্য মানুষ ভিড় জমায়, তৎকালেও মুসলিম সমাজ এ ফিত্‌নায় কম ভারাক্রান্ত ছিল না। আহ্‌মদিয়া ও নিসারিয়া ফকীর সম্প্রদায় দুটির একটি যুক্ত দল ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)-এর বিরুদ্ধে দামেশকের গভর্নরের কাছে তিক্ত সমালোচনা করলে, তিনি তাঁকে ডেকে পাঠান। ইমাম অকুতভয়ে জবাব দেন, এ ফকীরদের দু'টি দল রয়েছে– (১) একটি পরহিযগারী, সাধুতা, নৈতিকতা ও দারিদ্র্যের কারণে প্রশংসার যোগ্য। তবে এদের অধিকাংশই ভণ্ড ফকীর। শিরক, বিদ'আত ও কুফুরী ধারণার পংকিলতায় নিমজ্জিত। ইসলামের মৌল শিক্ষা কুরআন-হাদীসকে পরিত্যাগ করে মিথ্যা ও প্রতারণাকেই জীবনের সম্বল করে নিয়েছে। এরা দুনিয়ার মূর্খ মানুষগুলোকে ধোঁকা দিয়ে নানা প্রকার বিদ'আত, শিরকের জালে জড়িত করে। নিজেদের পকেট ভর্তির জন্য সদাসর্বদা সাধুতার ভান করে থাকে। নিজেদের চারি পাশে এমন এক বিষাক্ত পরিবেশের সৃষ্টি করে নেয় যে, যারাই তাদের সংস্পর্শে যেতো, তাদের মানসিক গোলামে পরিণত হতো। নিজেদের পকেট উজাড় করে সেই বিদ'আতী ফকীরদের পদমূলে সর্বস্ব ঢেলে দিত।

ইমামকে মিসরে তলব

ইমামের সত্য ভাষণে গভর্নর নিরব থাকলেও অন্যদের পক্ষ থেকে গোপনে তাঁর বিরুদ্ধে ভীষণ চক্রান্ত চলে। নাসরুল্লাহ মুঞ্জী মিসরের রাজন্যবর্গকে ইমামের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। তাঁরা দামেশকের গভর্নরের কাছে লিখে পাঠায় যেন ইমামকে মিসরে পাঠানো হয়। গভর্নর জবাবে বললেন : তাঁর সাথে দু'বার আমার সাক্ষাৎ ঘটেছে কিন্তু তাঁর মতবাদে কোন দোষ পাইনি। অবশ্য পরবর্তীতে তাঁর প্রতি নির্দেশ এলো, "ভালো চাওতো শাহী ফরমান অনুযায়ী কাজ করতে দ্বিধা করো না।" গভর্নর মজবূর হয়ে ইমামকে মিসর পাঠান।

৭০৫ হিজরীতে ১২ই রমযান সোমবার ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) দামেশক থেকে বের হলে শহরবাসী তাঁর পেছনে পেছনে তিন মাইল পর্যন্ত গিয়েছিলো। বিদায় সম্বর্ধনায় আগত জনগণ অশ্রুসিক্ত নয়নে ইমামের প্রতি তাকিয়ে থাকে।

মিসরে পৌঁছে তিনি কায়রো শহরে শুক্রবার দিন একটি কেল্লার অভ্যন্তরে প্রধান বিচারপতি ও রাজদরবারীদের এক সমাবেশে তাঁর মতামত নির্ভীকচিত্তে বর্ণনা করেন। কিন্তু তারপরও তিনি রেহাই পাননি। অন্য মিথ্যা অভিযোগে তাঁকে আটক রাখা হয়। ৭০৭ হিজরীতে তিনি মুক্তি পান। অতঃপর তিনি জামেয়াতুল হিকাম-এর মসজিদে জুমার নামায পড়ান এবং প্রায় ৪ ঘন্টা– 'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন'- (অর্থাৎ "একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি আর একমাত্র তোমার কাছেই সাহায্য কামনা করি।") আয়াতের তাফসীর বর্ণনা করেন। এভাবে মিসরে কিছু দিন থেকে তিনি তাঁর মতাদর্শ (ইসলাম) প্রচার করতে থাকেন এবং যাবতীয় ভ্রান্ত মতবাদের সমালোচনা ও প্রতিবাদ করতে লাগলেন। মুহীউদ্দীন ইবনে আরাবীর অদ্বৈতবাদের ভ্রান্তি স্বপ্রমাণ তুলে ধরতে লাগলেন। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদের জন্যে এটা ছিল অসহ্য। সূফী তাজুদ্দীন সাধারণ মানুষকে সভা-সমিতির মাধ্যমে ক্ষেপিয়ে তুলে তাঁর বিরুদ্ধে কতিপয় অভিযোগ আনেন এবং সরকারের নিকট তাঁর শাস্তি বিধানের দাবী তোলেন। সরকার তখন তাঁকে প্রথমে নজরবন্দী এবং পরে কারাগারেই আবদ্ধ করে রাখেন। কারা-জীবনেও তিনি বসে থাকেননি। নানান প্রকার অবৈধ খেল-তামাশা ও লক্ষ্যহীন জীবনবোধে লিপ্ত কয়েদীদের মধ্যে তিনি ইসলামের শিক্ষা দান কাজ শুরু করেন। তাদের নামাযী ও চরিত্রবান করে তোলেন। এতে জেলখানার পথহারা মানুষগুলো মনুষ্যত্বের সন্ধান পায়।

কারা প্রকোষ্ঠে ইমাম ইবনে তাইমিয়া

শত্রুরা ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)-এর এ কাজের টের পেয়ে ষড়যন্ত্র করে তাঁকে আলেকজান্দ্রিয়ার জেলে স্থানান্তর করে। এখানে একটি দুর্গে ১৮ মাস থাকাকালে একাধিকবার তাঁর মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে পড়ে, যাতে মুসলিম জাহানের লোকেরা কেঁদে কেঁদে অস্থির হতো। ৭০৯ হিজরীতে বাদশাহর হুকুমে তিনি মুক্তি পেয়ে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে কায়রো রওনা দিলে স্থানীয় জনগণ এক বিরাট মিছিল করে তাঁকে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে দেন এবং তাঁর জন্য দোয়া করেন। কায়রোর মাশহাদ-এ তিনি অবস্থান কালে কুরআন-হাদীস ও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।

এ সময় (৭১১ হিঃ) জামে মসজিদে প্রতিপক্ষীয় একদল লোক এসে ইমামের উপর হামলা করে এবং তাঁকে এক নির্জন ঘরে আটক করে নির্মমভাবে প্রহার করে। শহরে এ খবর ছড়িয়ে পড়লে তাঁর নিকট লোকজন দলে দলে দৌড়ে আসে এবং অভিপ্রায় ব্যক্ত করে যে, হুযূর অনুমতি দিলে গোটা মিসর শহর জ্বালিয়ে

দেব। কিন্তু তিনি কোনরূপ প্রতিশোধ না নিয়ে বরং বললেন : আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম। এরপরও তিনি অনেক দিন মিসরে থেকে পরে বায়তুল মুকাদ্দাস সফর করে স্বদেশ ভূমি দামেশকে ফিরে আসেন। জনগণ আনন্দে মিছিল করে তাঁর আগমন সম্বর্ধনা জানায়।

স্বদেশ ভূমি দামেশকে প্রত্যাবর্তন

দামেশকে আসার পর তিনি দীনী শিক্ষা বিস্তার, গ্রন্থ প্রণয়ন ও মানব সেবামূলক কাজে হাত দেন। তাঁর নির্ভীক কর্মতৎপরতা ও স্পষ্ট ভাষণে কায়েমী স্বার্থবাদী কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকদের গা-জ্বালার সৃষ্টি হয়। তারা আবার সরকারের কাছে অভিযোগ আনলে এ মর্মে সরকারী ফরমান জারী হয় যে, ইবনে তাইমিয়া আর কোন ফতোয়া জারী করতে পারবেন না।

কিন্তু ইমাম বললেন, "সত্য গোপন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।" তাঁর পক্ষ থেকে সরকারী ফরমানের এহেন বিরুদ্ধাচরণে ৭২০ হিজরীতে 'দারুস্ সাদাত'-এ অনুষ্ঠিত এক অধিবেশনে ইমামকে পুনরায় বন্দী করার সরকারী ফরমান জারী হয়। তখন তিনি পাঁচ মাস আঠার দিন পর্যন্ত দুর্গে বন্দী ছিলেন। এক বছর পর তাঁকে মুক্তি দেয়া হলে তিনি সেই পুরাতন কাজ শুরু করেন। ইমাম জ্ঞান প্রসারের কাজে নিমগ্ন হন। তিনি দেখলেন, বহু বুযুর্গের কবর পূজা হচ্ছে। মকসূদ হাসিলের জন্য হাজার হাজার মানুষ কবরে শায়িত বুযুর্গদের কাছে প্রার্থনা জানাবার জন্যে দলে দলে ছুটে আসছে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া ৭২৬ সনে ফতোয়া জারী করলেন যে, "কবর যিয়ারত করার নিয়তে দূর দেশ সফর করা জায়েয নয়। এ ফতোয়া জারীর পর তাঁর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বিরুদ্ধবাদীরা বড় বড় সভা করে তাঁর বিরুদ্ধে আগুন ঝরা বক্তৃতা দেয়। মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলে। কেউ বলে জিহবা কেটে দিতে হবে, কেউ বলে চাবুক মারতে হবে। কারও মত হলো যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করে রাখতে হবে। একদল মিসরের বাদশাহ্র কাছে দাবী তুলল, তাঁকে যেন কতল করা হয়। পরে সরকার তাঁকে কারারুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। গ্রেফতারকারী পুলিশ তাঁর নিকট গেলে তিনি সহাস্যে তাদের সাথে কারাগারে চলে যান। বাগদাদে এ খবর পৌছুলে সেখানকার তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ আলিমগণ ইমামের ফতোয়াকে ইসলামের মূল ভাবধারার সাথে সামঞ্জস্যশীল বলে তাঁর প্রতি সমর্থন জানান। তাঁরা বাদশাহর কাছে দু'খানা চিঠি পাঠান। ঐ সকল চিঠির সারমর্ম হলো : ইমাম ইবনে তাইমিয়া যুগশ্রেষ্ঠ শতাব্দীর মুজতাহিদ ইসলামী মিল্লাতের নেতা, পৃথিবীর সাত একলীমের ধনভাণ্ডারও তাঁর মূল্য দিতে

অক্ষম। আশ্চর্যের বিষয় যে, জাতির এ কর্ণধার যেখানে রাজপ্রাসাদে থাকার কথা, তাঁকে রাখা হয়েছে কারাগারে। তাঁর প্রতি ভিত্তিহীন দোষারোপ করা হয়েছে। তাঁকে আশু মুক্তি দেয়া উচিত।

ইরাকীরা ইমামের কারা-নির্যাতনের কথা শুনলে সারা দেশে অন্তর্বেদনার প্রচণ্ড আগুন জ্বলে উঠে। আলিমদের সম্মিলিত এক ঘোষণায় বলা হয়, ইমাম ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্য সন্দেহাতীতভাবে সত্য। সুতরাং শায়খুল ইসলামকে দীনের খিদমতের জন্য মুক্তি দেয়া হোক। তাতে বিশ্ব-মুসলিমের প্রতি বিরাট অনুগ্রহ করা হবে। বাগদাদের শ্রেষ্ঠ ওলামা-এ-কিরামের এ চিঠি মিসর বাদশাহ্র দরবার পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি কিংবা পৌঁছুলেও তা এমন সময় যে, তখন ইসলামী দুনিয়ার শতাব্দীর এ উজ্জ্বল সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে। ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ মর্দে মুজাহিদ শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া চিরদিনের তরে এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) জীবনের শেষ দিনগুলো কারাগারে ইবাদত বন্দেগী, কুরআন তিলাওয়াত ও এর গবেষণাতেই কাটাতেন। শেষবারে ইমাম দীর্ঘ তিন বছর তিন মাস কালেরও বেশি দিন কারারুদ্ধ ছিলেন। কারাগারের এ নিষ্ঠুর বন্দী জীবনও কেটেছে তাঁর অসংখ্য মৌলিক ও মূল্যবান গ্রন্থ রচনায়।

ইসলামের শিক্ষা আদর্শ থেকে বিচ্যুতির ফলে সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে মুসলমানদের উপর আল্লাহ্র গযব রূপে তাতারীদের যেই হামলা আসে, তখনও মুসলিম বিশ্বে অসংখ্য আলিম ছিলেন, পীর-মাশায়েখ ছিলেন। কিন্তু আরাম-আয়েশ বাদ দিয়ে এ মহাবিপদের মুকাবিলা করা এবং মুসলিম জনতাকে সংগঠিত করার মতো লোক খুব কমই ছিল। উদ্ভাবনী জ্ঞান দিয়ে সে দায়িত্ব পালন করেছিলেন একমাত্র ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)। ইসলাম মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে একটি বিপ্লবের আহ্বান নিয়ে এসেছে– বাতিলের সাথে মিতালি করে চলার জন্যে নয়, ইমাম ইবনে তাইমিয়া অসহ্য কষ্ট-নির্যাতনের মধ্যদিয়ে তারই প্রমাণ রেখে গেছেন। আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠাকল্পে বাতিলের বিরুদ্ধে লেখা, বক্তৃতা ও প্রয়োজনে অস্ত্রধারণ করেছেন এবং কষ্ট ত্যাগের মধ্যদিয়েও কি করে ঈমানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়, ইমাম ইবনে তাইমিয়ার সংগ্রামী জীবন উন্মুক্ত গ্রন্থতুল্য এরই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

[এক]

শরীয়তী শাসন কর্তৃত্বের দায়িত্ব ও কর্তব্য

প্রথম পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু হলো : নেতৃত্বের অধিকারী, পৌর কর্মকর্তা, রাষ্ট্রীয় প্রশাসকবৃন্দ, বিচারকমণ্ডলী, বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, অর্থবিভাগীয় কর্মকর্তাগণ, মন্ত্রীবর্গ, মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ, সাদকা-খয়রাত ও সরকারী যাকাত আদায়কারী-গণের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কিত আলোচনা।

দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ব্যাপারটি দুই প্রকার। (১) কর্তৃত্ব এবং নেতৃত্ব। মহানবী (সা) যখন মক্কা জয় করেন, তখন তিনি কা'বা শরীফের চাবিসমূহ বনী শাইবা থেকে নিয়ে নিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচা আব্বাস (রা) এ সকল চাবি চেয়ে বসলেন যেন হাজীদের পানি পান করানোর ব্যবস্থাপনা এবং একই সাথে কা'বার অভিভাবকত্ব লাভ ও কা'বার খেদমতের দায়িত্বও নিজে পেতে পারেন। কিন্তু তাঁর এই আগ্রহ আল্লাহ পছন্দ করেননি। তিনি আয়াত নাযিল করলেন এবং কা'বা শরীফের কার্যসমূহ পূর্ববর্তী খাদেম বনী শাইবার লোকদেরকেই প্রদান করার নির্দেশ দিলেন। অতএব এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, নেতার জন্যে ফরয (কর্তব্য) হচ্ছে মুসলমানদের কোনো কাজকে এমন ব্যক্তিদের হাতে সোপর্দ করা, যারা ঐ কাজের জন্যে অধিক যোগ্যতার অধিকারী। যেমন মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন,

مَنْ وُلِّيَ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَوَلّٰى رَجُلاً وَهُوَ يَجِدُ مَنْ هُوَ اَصْلَحُ لِلْمُسْلِمِيْنَ فَقَدْ خَانَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ـ

"মুসলমানদের কোন কাজে কেউ কর্তৃত্ব লাভ করার পর যদি সে এমন এক ব্যক্তিকে শাসক নির্বাচন করে, যার চাইতে সেই এলাকায় অধিক যোগ্যতর মুসলমান রয়েছে, তাহলে সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো।"

مَنْ قَلَّدَ رَجُلاً عَمَلاً عَلٰى عِصَابَةٍ وَهُوَ يَجِدُ فِىْ تِلْكَ الْعِصَابَةِ اَرْضٰى مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللّٰهَ وَخَانَ رَسُوْلَهُ وَخَانَ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

যে (রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা) সেনাবানিহীতে এমন ব্যক্তিকে নেতা নির্ধারণ করে, যার চাইতে জাতীয় সেনাবাহিনীতে আরও যোগ্যতর ব্যক্তি রয়েছে, সে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো। বিশ্বাসঘাতকতা করলো মুসলমানদের সাথে। (আল হাকিম তাঁর সহীহ হাদীস সংকলনে এটি রেওয়ায়েত করেছেন।)

কোন কোন আলিম এটিকে হযরত উমরের (রা) বাণী বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, হযরত উমর (রা) একথাটি তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন। উমরের (রা) ছেলেই একথার বর্ণনাকারী। হযরত উমর (রা) বলেন,

مَنْ وُلِّىَ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَوَلّٰى رَجُلاً لِمُوَدَّةٍ اَوْ قَرَابَةٍ بَيْنَهَا فَقَدْ خَانَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالْمُسْلِمِيْنَ -

"যে বক্তি মুসলমানদের কোন ব্যাপারে (নির্বাহীর) দায়িত্ব পেয়ে (যোগ্যতর লোককে বাদ দিয়ে) এমন ব্যক্তিকে কর্মকর্তা নিযুক্ত করে, যার সংগে তার স্নেহের সম্পর্ক আছে কিংবা সে তার স্বজন, তবে সে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো।"

বিষয়টির ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করা শাসনকর্তাদের প্রথম কর্তব্য। রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে কোন্ লোক প্রকৃত যোগ্য, শহর ও পৌর এলাকাসমূহে (এবং স্থানীয়) প্রশাসনে কি ধরনের সরকারী প্রতিনিধি বা কর্মকর্তা নিয়োগ বাঞ্ছনীয়, এ ব্যাপারে যাচাই-বাছাই ও পরামর্শ করা অপরিহার্য। কারণ, যারা সেনা ইউনিটের কমাণ্ড অফিসার হবে, যারা ছোট বড় ইসলামী সেনাদলের নেতৃত্ব দেবে, যারা মুসলমানদের নিকট থেকে নানা প্রকার শুল্ক কর আদায় করবে, যারা জনগণের অর্থ ব্যবস্থার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে, তারাই এসবের নিয়ন্ত্রক। সরকারী প্রশাসনিক কাজ কর্মের পরিচালকও তারা। এজন্যে উচ্চ কর্মকর্তা ও প্রধান শাসকের জন্যে একান্ত অপরিহার্য বিষয় হলো, এমন সব লোককে সরকারী গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে নিয়োগ দান করা, যারা মুসলমানদের জন্যে উত্তম এবং যোগ্য বলে গণ্য। এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যোগ্য লোক থাকতে যাতে কোন অযোগ্য ব্যক্তি নিয়োগপত্র পেয়ে না যায়। এ নীতি রাষ্ট্রীয় সকল প্রশাসনিক বিভাগে অবশ্যই পালনীয়। যেমন, নামাযে ইমাম ও মুয়ায্যিন, শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক, হজ্জ অনুষ্ঠানে খতীব বা কর্মকর্তা, খাবার পানির ব্যবস্থাপক, (নদ-নদী, খাল) ঝর্ণার তত্ত্বাবধায়ক রাষ্ট্রীয় কোষাগারের সংরক্ষক, সেনানিবাসের প্রহরী,

সেখানকার অস্ত্রনির্মাতা, অস্ত্রাগারে পাহারাদার, ছোট বড় বিভিন্ন বাহিনীর পরিচালক, বাজারের শুল্ক আদায়কারী, গ্রামীণ তথা স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। এদের প্রত্যেকের নিয়োগে সততা ও যোগ্যতাকেই প্রাধান্য দিতে হবে।

কেউ মুসলিম সমাজের নেতা ও শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী হলে তাঁর দায়িত্ব হলো নিজের অধীনস্থ এমন সব লোককে কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করা, যারা সৎ বিশ্বস্ত এবং সংশ্লিষ্ট কাজের ব্যাপারে দক্ষ, পারদর্শী। এমন সব ব্যক্তিকে কিছুতেই সামনে এগিয়ে নেয়া উচিত নয়, যারা নিজেরাই কর্তৃত্ব পাবার খাহেশ পোষণ করে কিংবা পদের দাবী করে। বরং যারা পদলোভী, উক্ত পদ পাবার প্রশ্নে তাদের এই লোভই হচ্ছে বড় অযোগ্যতা।

সহীহ আল বুখারী এবং সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে,

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ قَوْمًا دَخَلُوْا عَلَيْهِ سَئَلُوْهُ وَلَايَةً فَقَالَ اِنَّا لاَ نُوَلِّىْ اَمْرَنَا هٰذَا مَنْ طَلَبَهٗ ـ

রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা তাঁর দরবারে কিছু লোক উপস্থিত হয়ে তাঁর পক্ষ থেকে শাসন কর্তৃত্ব প্রাপ্তির অনুরোধ জানালো। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : যারা স্বেচ্ছায় কর্তৃত্ব চায়, আমরা এমন লোককে কোন কিছুর কর্তৃত্ব দেই না। (বুখারী-মুসলিম)

আবদুর রহমান ইবনে সুমারা কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ لاَ تَسْئَلِ الْاِمَارَةَ فَاِنَّكَ اِنْ اُعْطِيْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ اُعِنْتَ عَلَيْهَا ـ وَاِنْ اُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِّلْتَ اِلَيْهَا ـ

(اخرجاه فى الصحيحين)

"হে আবদুর রহমান! নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব চেয়ে নিও না। অপ্রার্থিতভাবে যদি তোমার হাতে নেতৃত্ব আসে, তাহলে তুমি দায়িত্ব পালনে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য পাবে আর যদি তুমি নেতৃত্ব চেয়ে নাও, তাহলে সেটার (ভালমন্দের) পুরো দায়িত্ব তোমার উপরই বর্তাবে (এবং তুমি আল্লাহর সাহায্য পাবে না।")

মহানবী (সা) বলেছেন,

مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ وُكِّلَ اِلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَطْلُبْ

الْقَضَاءَ وَلَمْ يَسْتَعِنْ عَلَيْهِ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهٗ. (رواه اهل السنة)

"যে ব্যক্তি বিচারকের পদ চায় আর এজন্য কারুর সাহায্য প্রার্থনা করে, তার উপর সে কাজের (ভালমন্দ) সোপর্দ করা হবে। আর যে বিচারকের পদ দাবী না করে এবং এজন্যে কারুর সাহায্য না চায়, তা হলে আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে একজন ফেরেশতা পাঠান। ঐ ফেরেশতা তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।" (আহলুস সুন্নাহ)

অতএব প্রধান শাসক যদি দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলেন এবং অধিক সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে বন্ধুত্ব, স্বজনপ্রীতি, আঞ্চলিকতা, ক্ষমতার অপব্যবহার, স্বদেশীকতা যেমন ইরানী, তুর্কী, রোমী কিংবা অপর কোন সম্পর্কের ভিত্তিতে অযোগ্য ব্যক্তিকে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন, তাহলে সেটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা হবে। ঠিক তেমনিভাবে উৎকোচ অথবা অপর কোন সুযোগ- সুবিধার বিনিময়ে কিংবা এ জাতীয় অন্য কোন সংকীর্ণ স্বার্থ যদি কারও নিয়োগের কারণ হয় অথবা যোগ্য সৎ ব্যক্তির প্রতি কপটতা ও বৈরিতার কারণে তাকে বাদ দিয়ে অযোগ্য অসাধু ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয়, তাহলে সেটাও অবশ্যই আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও সাধারণ মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা বৈ কিছু নয়। আল্লাহ তা'আলা এহেন বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে নিষেধ করে বলেছেন–

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اَمَانَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ - (سورة انفال : ٢٧)

"হে মুমিনগণ! জেনে শুনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করো না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানত সম্পর্কেও না।" (সূরা আনফাল : ২৭)

অতঃপর আল্লাহ ইরশাদ করেন,

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ اَجْرٌ عَظِيْمٌ -

"জেনে রেখো, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি হচ্ছে একটি ফিৎনা বা পরীক্ষা। নিঃসন্দহে আল্লাহর নিকটই রয়েছে বিরাট প্রতিদান। (সূরা আনফাল : ২৮)

মহান আল্লাহর একথা বলার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, মানুষ অনেক সময় নিজ সন্তান ও আপনজনদের ভালবাসায় আচ্ছন্ন হয়ে তাদেরকে রাষ্ট্রীয় কোন গুরুত্বপূর্ণ কর্তৃত্ব দিয়ে বসে। অযোগ্যকে ক্ষমতার অধিকারী বানিয়ে দেয়। এটা অবশ্যই

আল্লাহর আমানতে খেয়ানত ছাড়া কিছু নয়। এমনিভাবে সম্পদের প্রাচুর্য ও অর্থের পাহাড় গড়ে তোলার ব্যাপারে তার আগ্রহের শেষ থাকে না। তার এই সম্পদপ্রীতি তাকে অযোগ্য ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিতে এবং অন্যায়ে প্রবৃত্ত হতে বাধ্য করে। সে অন্যায়, অবৈধ পন্থায় সম্পদ লাভ করতে গিয়ে জনগণকে শোষণ করে। কোন কোন এলাকার আঞ্চলিক শাসক বা বড় সরকারী কর্মকর্তা এমন চরিত্রের হয়ে থাকে যে, সে উর্ধ্বতন কর্তা ব্যক্তিকে তোষণে পারদর্শী। ফলে তোষামোদী লোকদেরকে অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও আপন লোকদের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করে বসে। এহেন ব্যক্তি নিঃসন্দহে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও আমানতের খেয়ানত করে।

দায়িত্বপূর্ণ সরকারী ব্যক্তি যদি আল্লাহকে ভয় করে লোভ সংবরণ করতে পারে এবং নিজ ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে বিরত থাকতে সক্ষম হয়, তাহলে আল্লাহ তাকে ন্যায়নীতির উপর অটল থাকতে সাহায্য করেন। তাকে সকল প্রতিকূলতা থেকে হেফাযত করেন।

যে শাসক নিজ প্রবৃত্তির দাস, আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দেন। তার উদ্দেশ্য ও আশা আকাংখার স্বপ্নসৌধকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেন। তার সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনকেও অসম্মানজনক অবস্থায় রাখেন। সে হারায় তার অবৈধ পন্থায় অর্জিত সম্পদসমূহ।

এ সম্পর্কে একটি বিখ্যাত ঘটনা আছে যে, একবার আব্বাসী শাসকদের একজন আলিমদের ডেকে বললেন, আপনারা নিজেদের দেখা কিংবা শোনা কিছু ঘটনা লিপিবদ্ধ করুন। একবার উমর ইবনে আবদুল আযীযকে (রহ) আমি দেখেছি, জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললো, “আমীরুল মু'মিনীন! আপনি আপনার সন্তানদেরকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ থেকে দূরে রেখেছেন। তাদেরকে ফকীর ও অসহায় অবস্থায় রেখে যাবার পথ করেছেন। তাদের জন্যে আপনি কিছুই রেখে যাচ্ছেন না।” উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ) তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তিনি বললেন, ঠিক আছে, সন্তানদেরকে আমার সামনে হাজির করো। তাদের সকলকে সামনে হাজির করা হলো। খলীফার সন্তান সংখ্যা ছিল দশের উর্ধ্বে। তাদের সকলেই ছিল অপ্রাপ্তবয়স্ক। সন্তানদের দেখে তিনি কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, বৎসগণ! তোমাদের যা হক ছিল তা আমি তোমাদের পুরোপুরি দিয়ে দিয়েছি– কাউকে বঞ্চিত করিনি। এছাড়া জনসাধারণের কোন সম্পদ আমি তোমাদের দিতে পারবো না। তোমাদের প্রত্যেকের অবস্থা তো এই যে, হয় তোমরা সৎ সাধু ব্যক্তি হবে

আর আল্লাহ তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী, নয় তোমরা অসৎ ও অসাধু হবে। আমি অসৎ ও অসাধু ব্যক্তিদের জন্যে কিছুই রেখে যেতে চাই না। কারণ ঐ অবস্থায় তারা আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হবে। قُومُوا عَنِّى "যাও, সকলে এবার আমার নিকট থেকে যেতে পারো, এটুকুনই আমার কথা।"

অতঃপর তিনি বলেন, মহাপ্রাণ উমর ইবনে আবদুল আযীযের সেই সন্তানদেরকেই আমি পরবর্তীকালে দেখেছি, তাদের কেউ কেউ শত শত ঘোড়ার অধিকারী ছিলেন, সেগুলো আল্লাহর রাস্তায় দান করেছেন। ইসলামের মুজাহিদগণ সেগুলোর উপর সওয়ার হয়ে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় জিহাদ করতেন।

অতঃপর সেই আব্বাসী খলীফা বললেন, উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ) ছিলেন "খলীফাতুল মুসলিমীন"।

পূর্বে তুর্কীদের দেশ এবং পশ্চিমে মরক্কো ও স্পেন তাঁর শাসনাধীন, সাইপ্রাস দ্বীপ, সিরীয় সীমান্তবর্তী এলাকা, তরসূস ইত্যাদিতে তাঁর শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। দক্ষিণে ইয়ামেনের শেষ সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃতি ঘটেছিল তাঁর শাসনের। এতদসত্ত্বেও তাঁর সন্তানরা পৈত্রিক উত্তরাধিকার থেকে অতি সামান্য কিছুরই মালিক হয়েছিলেন। কথিত আছে যে, তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদের পরিমাণ যা ছিল তা সন্তানদের মাথা পিছু বিশ দেরহামের চাইতেও কম ছিল।[১] অথচ ঐ সময়ই আমি খলীফাদের মধ্যে এমন সব শাসকও দেখেছি, যারা এত বিপুল পরিমাণ সম্পদ রেখে গিয়েছিলেন যে, তাঁদের মৃত্যুর পর যখন সন্তানরা সেগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করেছে, তখন প্রত্যেকের ভাগে ৬ শ' কোটি পর্যন্ত 'আশরাফী' পড়েছে। তারপরও ঐ সকল সন্তানের কেউ কেউ শেষে ভিক্ষা করতো। এ সম্পর্কে অসংখ্য কাহিনী, চাক্ষুষ ঘটনাবলী এবং পূর্ববর্তীদের শ্রুত অনেক অবস্থার কথা বিক্ষিপ্তভাবে যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে। সেগুলোতে জ্ঞানবানদের জন্য বহু কিছু শিক্ষার আছে।

নবী জীবনের আদর্শ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব ও শাসন ক্ষমতাও একটি আমানত, এই আমানত যথাযথভাবে রক্ষা করা 'ওয়াজিব।'

---

১. আল্লাহ নেক বান্দাদের সাহায্য করেন, যেমন 'উমর ইবনে 'আবদুল আযীযের (রহ) সন্তানদের করেছিলেন, উত্তরাধিকার সূত্রে তারা তেমন কিছু পায় নাই। কিন্তু আল্লাহ তাদের এমন সাহায্যই করেছিলেন যে, প্রত্যেকেই বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছিলেন। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :
"আমার অভিভাবক তো আল্লাহ যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনিই সৎকর্মপরায়ণদের অভিভাবকত্ব করে থাকেন। (৭ : ১৯৬) –সম্পাদক

বিভিন্নভাবে পূর্বাহ্নেই এ বিষয়ে হুশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে। আবু যর গিফারী (রা)-কে মহানবী (সা) নেতৃত্ব সম্পর্কে বলেছেন,

اِنَّهَا اَمَانَةٌ وَاِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْىٌ وَنَدَامَةٌ اِلاَّ مَنْ اَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَاَدَّى الَّذِىْ عَلَيْهِ فِيْهَا - (رواه مسلم)

"নেতৃত্ব হচ্ছে একটি আমানত। এ নেতৃত্ব (ক্ষেত্র বিশেষে) কিয়ামতের দিন লজ্জা ও অনুতাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তবে যিনি ন্যায়-নীতি ভিত্তিক নেতৃত্বের অধিকারী ছিলেন এবং এর হক সঠিকভাবে পালন করেছেন, তার কথা আলাদা।" (মুসলিম)

ইমাম বুখারী (রহ) কর্তৃক সহীহ বুখারীতে হযরত আবু হুরায়রার (রা) একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে যে,

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا ضُيِّعَتِ الاَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ - قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا اِضَاعَتُهَا ؟ قَالَ اِذَا وُسِدَ الاَمْرُ اِلَى غَيْرِ اَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ - (بخارى)

মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন, "আমানত নষ্ট (তথা খেয়ানত) হতে থাকলে তোমরা কিয়ামতের প্রতীক্ষায় থেকো।" বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! "আমানত নষ্ট" বলতে কি বুঝায়? হযরত বললেন, যখন শাসন ক্ষমতা ও নেতৃত্ব কর্তৃত্বের আসনে অযোগ্য ব্যক্তিদের আগমন ঘটে, তখন তোমরা কিয়ামতের প্রতীক্ষায় থেকো। (বুখারী)

আমানতের এই অর্থের প্রেক্ষিতেই এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ্র 'ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, ইয়াতীমের অভিভাবক বা অসী, ওয়াকফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক এবং কোন দায়িত্বে নিয়োজিত ইনচার্জ বা প্রতিনিধির যদি সংশ্লিষ্ট মালিকের সম্পদ থেকে ব্যয় করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন উত্তম পদ্ধতিতে তা ব্যয় করবে (অর্থাৎ স্বীকৃত পরিমাণের বেশী ব্যয় করবে না এবং কোনরূপ আত্মসাৎ করবে না।) যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন,

وَلاَ تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلاَّ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّه.

"ইয়াতীম বয়োঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হইও না।"

শাসক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তারা হচ্ছেন বকরীর রাখালের ন্যায় জনগণের রক্ষক বা তত্ত্বাবধায়ক। যেমন, মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعْيَتِهِ فَالامَامُ الَّذِىْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ـ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِىْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِىَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ـ وَالْوَلَدُ رَاعٍ فِى مَالِ اَبِيْهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْعَبْدُ رَاعٍ فِىْ مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ اَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ـ (اخرجاه فِى الصحيحين)

"তোমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের রক্ষক। প্রত্যেককে তার অধীনস্থদের কার্যকলাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। সমাজ ও রাষ্ট্রের যিনি নেতা, তাঁকে তাঁর অধীনস্থ জনগণের কার্যাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীগৃহের রক্ষক। উক্ত গৃহে যা তার কর্তৃত্বাধীন সে ব্যাপারে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। সন্তান তার পিতৃ সম্পদের রক্ষক, সে সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। দাস ভৃত্য তার মনিবের মাল-সম্পদের রক্ষক। তাকে সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। সাবধান! মনে রেখো, তোমাদের প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জন্য রক্ষক। সকলকে নিজ নিজ অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে।"

মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন যে,

مَامِنْ رَاعٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللّٰهُ رَعْيَةً يَمُوْتُ يَوْمَ يَمُوْتُ وَهُوَ عَاشٍ لَهَا ـ اِلاَّ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ـ (مسلم)

"আল্লাহ যাদেরকে অপরের উপর রক্ষণা বেক্ষণের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব দিয়েছেন, সে যদি তার দায়িত্ব পালনে উদাসীন থেকে মারা যায়, আল্লাহ তার জন্যে বেহেশতের গন্ধও হারাম করে দেবেন।" (মুসিলম)

একবার আবু মুসলিম খাওলানী (রহ) হযরত মুআবিয়া (রা) ইবনে আবু সুফিয়ানের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন,

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا الاَجِيْرُ ـ "(হে মজুর! তোমার প্রতি সালাম)"

দরবারের সভাসদগণ বললেন– 'আইউহাল আজীর' না বলে اَيُّهَا الْاَمِيْرُ বলুন। তিনি অতঃপর বললেন, اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا الْاَجِيْرُ পুনরায় বলা হলো "আইউহাল আমীর" বলুন। কিন্তু আবু মুসলিম খাওলানী একই বাক্যের তিনবার পুনরাবৃত্তি করেন। উপস্থিত লোকজন বার বার তাঁকে 'আইউহাল আমীর' বলতে স্মরণ করিয়ে দেন। অবশেষে আমীর মু'আবিয়া বললেন, আবু মুসলিমকে তোমরা বলতে দাও। তাঁর কথার অর্থ তিনিই ভাল জানেন। অতঃপর আবু মুসলিম বললেন, হে মু'আবিয়া! তুমি একজন মজুর। এই বকরীর দলের দেখা শোনা করার জন্যে তোমাকে বকরীর প্রভু মজুরীর ভিত্তিতে নিয়োগ করেছেন। তুমি যদি চর্ম রোগাক্রান্ত বকরীসমূহের তত্ত্বাবধান কর এবং রুগ্ন বকরীগুলোর চিকিৎসা করে সেগুলোর রক্ষণা বেক্ষণ কর, তাহলে বকরীর মালিক তোমাকে এর মজুরী দেবেন। আর যদি চর্ম রোগাক্রান্ত বকরীগুলোর খোঁজখবর না নাও, রুগ্ন বকরীসমূহের চিকিৎসা না কর এবং সেগুলোর রক্ষণা বেক্ষণে যথাযথ দায়িত্বের পরিচয় না দাও, তাহলে এগুলোর মালিক তোমাকে শাস্তি দেবেন।"

একজন শাসকের উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণের জন্যে এ ঘটনাটিই যথেষ্ট। কারণ, গোটা মানবজাতিই হচ্ছে আল্লাহর বান্দা। রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাগণ হচ্ছেন আল্লাহর বান্দাদের পরিচালনার জন্যে তাঁরই প্রতিনিধি। জনগণের জানমাল মানসম্ভ্রম সবকিছুর হেফাযতের দায়িত্ব তাঁদের উপর ন্যস্ত।

দেশের বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক এবং কৃষি ফসল উৎপাদনের উৎসভূমি সংক্রান্ত ব্যাপারে যোগ্য ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও এসব ব্যাপারে অনভিজ্ঞ ও অযোগ্য কোনো ব্যক্তিকে ঐ পদে নিয়োগ প্রদান করা অবশ্যই খেয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতার কাজ। রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ এমন কাজ করলে তিনি খেয়ানতকারী হবেন। কারণ দেশের অর্থনীতি ও এর প্রাণসত্তা কৃষি শিল্প বাণিজ্য সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি ব্যবসায়ে পণ্য উপকরণাদি অন্যায্য দামে বিক্রি করে দেবে। ভাল এবং সাধু খরিদদার, যিনি অতিরিক্ত বা ন্যায্য মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও, হুমকি, বন্ধুত্ব ও নিকটাত্মীয়তার দরুন তাকে ন্যায্য মূল্যে পণ্য সামগ্রী না দেওয়া খেয়ানত ছাড়া কিছু নয়। তাতে পণ্য সামগ্রীর মালিক অব্যশই তার প্রতি বিদ্বিষ্ট হবেন এবং নিন্দা জ্ঞাপন করবেন।

কাজেই রাষ্ট্রীয় উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ফরয হলো, কোনো খেয়ানতকারী ব্যক্তিকে প্রতিনিধি বা শাসন পরিচালক না করা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও দেশের অর্থনীতি কিংবা ভূমি ইত্যাদির ব্যাপারে ভাল অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে সরকারী প্রতিনিধি বা শাসক নিয়োগ করা।

[দুই]

ক্ষমতা ও শাসন কর্তৃত্বের যোগ্যতা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় হলো : যোগ্যতর ব্যক্তিকেই ক্ষমতা ও শাসন কর্তৃত্ব দেয়া উচিত। যোগ্যতর ব্যক্তির অনুপস্থিতিতেও যোগ্য ব্যক্তিকেই ক্ষমতা ও শাসন কর্তৃত্ব প্রদান। প্রশাসনিক প্রত্যেক স্তরের বিভিন্ন পদে আদর্শ ব্যক্তিকে ক্ষমতাসীন ও প্রতিনিধি করা। শাসন কর্তৃত্বের জন্যে শক্তি ও বিশ্বস্ততা অপরিহার্য, যেন শরীয়তী বিধানের প্রয়োগ ও জনগণের অধিকার আদায়ের কাজ সহজ হয়। বিচারকের প্রকারভেদ।

উপরোক্ত আলোচনার পর এখন এটা অনুধাবন করা প্রয়োজন যে, নেতার উপর কি কি ফরয? সংক্ষেপে বলতে গেলে তা হলো, তিনি এমন সব ব্যক্তিকে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি, কর্মকর্তা কিংবা দেশের কোন এলাকার শাসক নিযুক্ত করবেন, যারা সৎ ও যোগ্য। তবে কোন কোন সময় এমন অবস্থা দেখা দেয় যে, কাজের জন্য ইপ্সিত যোগ্যতাসম্পন্ন লোক পাওয়া যায় না। সে সময় নেতার কর্তব্য হলো আপেক্ষিক যোগ্যতার ভিত্তিতে ঐ কাজে লোক নিয়োগ করা। প্রত্যেক পদের জন্যে তুলনামূলক বিচারে যে যোগ্য, তাকেই সে পদে বসানো। পূর্ণ নিরপেক্ষতা, সততা ও বিচার বুদ্ধি প্রয়োগের মাধ্যমে যদি নেতা এ কাজটি সমাধা করেন, তাহলে তিনি তাঁর কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করলেন। আর তখনই তাঁকে ন্যায়পরায়ণ নেতা বলা যাবে। মহান আল্লাহর কাছেও তিনি ন্যায়পরায়ণ শাসকরূপে বিবেচিত হবেন। অবশ্য তারপরও বিভিন্ন কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা দেবে না, এমনটি জোর দিয়ে বলা যায় না। তবুও এছাড়া আর করারই বা কি থাকবে। আল্লাহ তায়ালাও সম্ভাব্য চেষ্টার কথাই বলছেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে :

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ـ

"হে মুসলমানগণ! তোমাদের দ্বারা যতটুকুন সম্ভব তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চলো।" (সূরা তাগাবুন : ১৬)

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ـ

"আল্লাহ কারুর উপর তার সাধ্যাতীত বোঝা অর্পণ করেন না।" (সূরা বাকারা : ২৮৬)

জেহাদের নির্দেশ দিতে গিয়ে আল্লাহ্ বলেছেন :

فَقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - لاَتُكَلَّفُ اِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

"তোমরা আল্লাহর পথে দুশমনদের সাথে লড়ো। তোমার আপন সত্তা ব্যতীত অপর কারুর দায়িত্ব তোমার উপর নেই। তবে হাঁ, অন্যান্য মুসলমানদেরও এ ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করো। (সূরা নিসা : ৮৪)

আল্লাহ্ আরও ইরশাদ করেন ;

يَاۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لاَيَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ -

"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজের দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন থাকো। তোমরা সঠিক পথে থাকলে, গোমরাহ্ ব্যক্তিরা তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না।" (সূরা মায়েদা : ১০৫)

অতএব প্রশাসনিক সকল পর্যায়ে যেই শাসক বা কর্তৃপক্ষ সৎ লোক নিয়োগে সম্ভাব্য সকল চেষ্টা ত্রুটি করবেন না এবং আপন কর্তব্য পালনে পূর্ণ সচেষ্টা হবেন, তাতে ধরে নেয়া যাবে যে, তিনি হেদায়েত বা সঠিক পথের অনুসারী।

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন :

اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِاَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَااسْتَطَعْتُمْ -(اخرجاه فى الصحيحين)

"আমি যখন তোমাদের কোন কাজের নির্দেশ দেই, তখন তোমরা তা নিজেদের সাধ্যানুযায়ী করো।" (বুখারী-মুসলিম)

তবে কোন ব্যক্তি যদি শরীয়তের অসমর্থিত অক্ষমতার অজুহাত দেখিয়ে উক্ত কাজে ত্রুটি করে, তাহলে সেটা খেয়ানত হবে। তাকে সেই কর্তব্য অবহেলাজনিত খেয়ানতের শাস্তি প্রদান করা হবে। কাজেই তার কর্তব্য হলো, যোগ্যতর দক্ষ ও কল্যাণকর কোনটি, তা ভালোভাবে জেনে নেয়া এবং প্রত্যেক পদের জন্য যোগ্য ও দক্ষ ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করা। কারণ, কোন কিছুর কর্তৃত্ব-ক্ষমতার দুটি স্তম্ভ রয়েছে, একটি শক্তি, অপরটি আমানত বা বিশ্বস্ততা। যেমন কুরআন মজীদে ইরশাদ হচ্ছে–

اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِيُّ الاَمِيْنُ -

তোমার ভৃত্য হিসাবে সেই-ই অতি উত্তম ব্যক্তি হবে, যে সবল ও বিশ্বস্ত। (সূরা কিসাস : ২৬)

মিসর সম্রাট হযরত ইউসুফ (আ)-কে বলেছিলেন :

اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ اَمِيْنٌ -

"আজ থেকে তুমি আমাদের মধ্যে অতি সম্মানিত ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিত্ব।"

হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মর্যাদা ও গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন :

اِنَّه لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ - ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ - مُطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ -

"নিশ্চয় কুরআন মজীদ এক অতি সম্মানিত ফেরেশতা কর্তৃক পৌঁছানো বাণী, যিনি ওহীর গুরুভার বহনে সক্ষম এবং আরশের অধিকারী সত্তার কাছে রয়েছে তাঁর উচ্চ মর্যাদা। তিনি সেখানে গণ্যমান্য সত্তা এবং বিশ্বস্ত। (সূরা তাকভীর : ১৯-২১)

প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এবং শাসন কর্তৃত্বের মূল শক্তি হচ্ছে দেশের ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা। রণাঙ্গনে যুদ্ধ-নেতৃত্বের শক্তি হলো সেনাপতির বীরত্ব ও সাহস। তাকে সকল প্রকার রণকৌশল সম্পর্কে অবগত ও দক্ষ হতে হবে। দুশমনের ধোকাবাজি ও চাল সম্পর্কে তাকে থাকতে হবে সচেতন। কেননা اَلْحَرْبُ خُدْعَةٌ "লড়াইর অপর নাম হচ্ছে প্রতারণা।" যুদ্ধ পরিচালককে রণকৌশল জানতে হবে। সে অনুযায়ী কাজ করার জন্যে তাকে হতে হবে পূর্ণ দক্ষতার অধিকারী। (তৎকালীন সময়) যুদ্ধ পরিচালককে তীর নিক্ষেপ করা ও মারার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হতো, যেন শত্রু বাহিনীকে উপযুক্ত আঘাত হানতে পারে। তাকে হতে হবে দক্ষ ঘোড়সওয়ার।

যেমন আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করছেন :

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّااسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ -

"মুসলমানগণ! সামরিক শক্তি-উপকরণ সঞ্চয় এবং অধিক পরিমাণে যুদ্ধের ঘোড়া সংগ্রহের মধ্যদিয়ে তোমরা কাফেরদের মোকাবেলায় যথাসাধ্য রণ প্রস্তুতি নিয়ে থাকো। (সূরা আনফাল : ৬০)

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন :

ارْمُوْا وَارْكَبُوْا وَاِنْ تَرْمُوْا اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ تَرْكَبُوْا وَمَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْىَ ثُمَّ نَسِيَهُ فَلَيْسَ مِنَّا ـ

"তোমরা তীর চালানো শেখো এবং সওয়ারীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করো। আমার কাছে সওয়ারীর চাইতে তীর চালানো অতি প্রিয়। যে ব্যক্তি তীর চালানো শিক্ষা করে অবহেলা করে তা পরে ভুলে যায়, সে আমার দলভুক্ত নয়।" অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, فَهِىَ نِعْمَةٌ مَنْ نَسِيَهَا جَهَدَهَا ـ

"তীর চালানো (তথা সামরিক যোগ্যতা অর্জন) একটি নেয়ামত। যে তা ভুলে গেল সে এই নেয়ামতকে অস্বীকার করলো।" (মুসলিম)

এসব বক্তব্যের মধ্যদিয়ে সমাজে জ্ঞান প্রজ্ঞা, ন্যায়বিচার ও খোদায়ী বিধান প্রতিষ্ঠার অন্তরায়সমূহ দূরীকরণে মুসলমানদের সামরিক যোগ্যতাসহ যাবতীয় শক্তিমত্তার অধিকারী হবার উপরই জোর দেয়া হয়েছে। যার তাগিদ রয়েছে খোদ কুরআন ও সুন্নায়।

১. আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা হচ্ছে খোদাভীতি নির্ভর একটি গুণ।

২. পার্থিব সামান্য সম্পদের বিনিময়ে হক্কুল্লাহকে বিসর্জন দেয়া সঙ্গত নয়।

৩. অন্তর থেকে মানুষের ভয় সম্পূর্ণ বের করে দেবে।

প্রত্যেক শাসনকর্তা, নেতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ তায়ালা এই তিনটি মহৎ গুণ অত্যাবশ্যকীয় করে দিয়েছেন।

কুরআন মজীদে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন :

فَلاَ تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَتَشْتَرُوْا بِاٰيَاتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلاً ـ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ ـ

"তোমরা মানুষকে ভয় করো না, আমাকে ভয় করো। আমার আয়াতসমূহকে হীন স্বার্থে ব্যবহার করো না। আল্লাহর বিধান মুতাবেক যারা জনগণকে শাসন করে না তারাই কাফের (অবাধ্য)।[১] (সূরা মায়েদা : ৪৪)

১. তার পূর্বে বলেছেন, ফাসিক ও জালিম।

এর ভিত্তিতে মহানবী (সা) শাসক ও বিচারকদের তিন ভাগে ভাগ করেছেন। তন্মধ্যে দু'ভাগকেই জাহান্নামী বলেছেন। এক শ্রেণীর বিচারককেই শুধু জান্নাতী বলেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন :

اَلْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ قَاضِيَانِ فِى النَّارِ وَقَاضِىٌ فِى الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ وَقَضٰى بِهٖ فَهُوَ فِى الْجَنَّةِ - (روراه اهل السنه)

"কাযী শাসক ও বিচারক তিন শ্রেণীর। দু'শ্রেণীর বিচারক জাহান্নামী এবং এক শ্রেণীর বিচারক জান্নাতী। অতএব যেই ব্যক্তি সত্যকে অনুধাবন করে ন্যায় বিচার করবে, সে জান্নাতী হবে।" (আহলুল সুন্নাহ)

বিবদমান দু'দলের মধ্যে যারা ফয়সালা করে দেয়, তাদেরই কাযী বা বিচারক বলা হয়। বিচারক এ দু'পক্ষকে নির্দেশ দিবেন। তাই এদের মধ্যে কেউ খলীফা হোক কি বাদশাহ, কিংবা ওয়ালী ও হাকিম কিংবা এমন কেউ যিনি রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন, এমনকি যিনি শিশুদের লেখাপড়ার তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত, সকলেই একই হুকুমের শামিল। মহানবীর সম্মানিত সঙ্গী-সাথীগণ বিষয়টি এভাবেই উল্লেখ করেছেন। তাঁরাও তাই করতেন আর এটাই স্বাভাবিক।

[তিন]

জনদরদি সাহসী নিষ্ঠাবান নেতৃত্ব

যার চরিত্রে ক্ষমতা ও বিশ্বস্ততা– এ দুটি মহৎ গুণের সমন্বয় ঘটেছে, এমন লোকের সংখ্যা আজকের দুনিয়ায় খুব কমই দেখা যায়। এমন দু'জন ব্যক্তি যাদের একজন বিশ্বস্ত অপরজন শক্তিমান– এ দু'জনের মধ্যে তাকেই কর্তৃত্ব নেতৃত্ব দেয়া উচিত যার দ্বারা দেশ ও জাতি ক্ষতির সম্মুখীন হয় না। ইমাম আহমদ (রহ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এমন দু'জন লোক যাদের একজন সাহসী ও রণনিপুণ কিন্তু কাজে পাপাচারী, অপরজন সৎ ও সাধু কিন্তু ভীরু এবং সাহসহীন, কার সাথে থেকে জেহাদ করা বাঞ্ছনীয়? তিনি জবাবে বলেছিলেন, রণনিপুণ সবল ব্যক্তি 'ফাজের' হলেও তার সাথে থেকেই জেহাদ করবে। কেননা, তার শক্তি এখানে মুসলমানের স্বার্থে ব্যবহৃত হবে আর তার পাপ তার নিজের জীবনের জন্যে। সৎ সাধু ব্যক্তির ব্যাপারটি সম্পূর্ণ তার বিপরীত।

শক্তি সাহস ও বিশ্বস্ততা এ দু'টি মহৎ গুণের অধিকারী ব্যক্তির সংখ্যা আজকাল নেহায়েত কম। এ কারণেই হযরত উমর (রা) দু'আ করতেন :

اَللّٰهُمَّ اَشْكُوْ اِلَيْكَ جَلْدَ الْفَاجِرِ وَعَجْزَ الْبَقَةِ -

"হে আল্লাহ! তোমার কাছে পাপাচারীর নিষ্ঠুরতা এবং ভীরুর অক্ষমতার অভিযোগ জানাচ্ছি। (এ দুয়ের হাত থেকেই রক্ষা করুন।)"

অতএব যে কোন দেশ ও ভূখণ্ডের জন্যে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা হিসাবে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব অনুসন্ধান করা উচিত। কোন দেশের নেতা যদি শাসনকর্তা বা প্রশাসক নিয়োগের ইচ্ছা করেন, তখন তার কর্তব্য হবে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল বা দেশের সব চাইতে উত্তম ব্যক্তিকে এ দায়িত্ব প্রদান করা আর যদি এমন দু'জন থাকে যাদের একজন বিশ্বস্ত অপরজন শক্তিধর সাহসী, তখন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়োগের ব্যাপারে তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, কোন অঞ্চল বা রাজ্যের শাসন

প্রশাসনে এ গুণদ্বয়ের ভারসাম্যপূর্ণ কর্তৃত্বের দ্বারা দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধিত এবং ক্ষতির মাত্রা হ্রাস পাবে।

সুতরাং সমর নেতৃত্বের ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকেই মনোনীত করা উচিত যিনি বা যারা শক্তি সাহস ও বীরত্বের অধিকারী। তুলনামূলকভাবে তার আমল কিছুটা কম হলেও দুর্বল সমরনেতৃত্বের চাইতে সাহসী ব্যক্তিকেই যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেবে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, এমন দু'জন ব্যক্তি আছে উভয়ই লড়াইয়ের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। কিন্তু তাদের একজন 'ফাজের' তথা পাপাচারী তবে সে অধিক শক্তি সাহসের অধিকারী আর অপরজন সৎ সাধু বটে কিন্তু দুর্বলমনা। এমতাবস্থায় উভয়ের মধ্যে কার নেতৃত্বে লড়াই করা উচিত। তিনি জবাবে বললেন, ফাজেরের বলিষ্ঠতা ও শক্তিমত্তা মুসলমানদের কল্যাণার্থে আর তার 'ফুজুর' বা পাপাচার নিজ জীবনের জন্যে। সৎ সাধু ব্যক্তি দুর্বল হলে তার সেই সততা ও সাধুতা তার জন্য নিজের কিন্তু দুর্বল হওয়ার কারণে সে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় দুর্বলতার নিমিত্ত হবে।

অতএব শক্তিধর সমরানায়ক 'ফাজের' হলেও তার সাথে থেকেই জিহাদ করা উচিত।

রাসূলুল্লাহ (সা) এর ইরশাদ :

إِنَّ اللّٰهَ يُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ -

"আল্লাহ তায়ালা 'ফাজের' লোক দ্বারাও তাঁর দীনের সাহায্য নেন।" (অপর এক রেওয়ায়েতে بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ এর স্থলে بِاَقْوَامٍ لاَخَلاَقَ لَهُمْ আছে, অর্থাৎ "এমন সব ব্যক্তি ও সম্প্রদায়কে দিয়েও তাঁর দীনের সাহায্য করান, যাদের নেক কাজে অংশ নেই।)

সুতরাং যখন নির্ভীক কোন সমরনায়ক না পাওয়া যায় এবং তার স্থলাভিষিক্ত করার মতো এমন কোন সেনাপতি না মিলে, তখন দীনী দিক থেকে অধিক যোগ্য ও সৎ ব্যক্তিকেই উক্ত পদে নিয়োজিত করবে। মহানবী (সা) খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে (রা) ইসলামের সেনাধ্যক্ষ করেছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণের পর থেকেই এ দায়িত্ব পালন করছিলেন। তাঁর সম্পর্কে মহানবী (সা) বলতেন–

سَيْفٌ سَلَّهُ اللّٰهُ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ -

"খালিদ এমন এক তরবারী যা আল্লাহ মুশরিকদের নিপাত করার জন্যে

উন্মুক্ত করেছেন।”

তা সত্ত্বেও হযরত খালিদ (রা) কর্তৃক এমন দু'একটি ঘটনা ঘটেছে যা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অপছন্দনীয় ছিল। যেমন একবার আল্লাহর রাসূল (সা) আসমানের দিকে হাত উত্তোলন করে বলেছিলেন :

اَللّٰهُمَّ اَبْرَأُ اِلَيْكَ مِمَّا فَعَلَ خَالِدُ ـ

“হে আল্লাহ! খালিদ (যুদ্ধ ক্ষেত্রে) যা কিছু (বাড়াবাড়ি) করে ফেলেছে, আমি এ ব্যাপারে অব্যাহতি চাই।”

মহানবী (সা) এ দোয়াটি তখন উচ্চারণ করেছিলেন, যখন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) জুযায়মা গোত্রের লোকদের ঈমান সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে সেখানকার কিছু লোককে হত্যা করে ফেলেছিলেন আর তাদের অর্থ-সম্পদ ছিনিয়ে এনেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অবৈধ। তাঁর সাথে অপরাপর যেসব সম্মানিত সাহাবী ছিলেন– তাঁরা হযরত খালিদকে তা করতে বারণ করেছিলেন। মহানবী (সা) খোদ গিয়ে জুযায়মা গোত্রের লোকদের কাছে সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রকাশ করেছেন। রণাঙ্গনে তাদের পরিত্যাক্ত অর্থ-সম্পদ ফেরত দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অথচ এহেন ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা) সকল সময় হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদকেই ইসলামী ফৌজের সেনাধ্যক্ষের পদে বহাল রেখেছেন। তা করার একমাত্র কারণ ছিল এই যে, তিনি রণনিপুণতা ও সমর কুশলতায় অন্যান্যের তুলনায় অধিক যোগ্য ছিলেন। ঘটনার সাধারণ মূল্যায়ন তিনি ভুল করে ফেলতেন। পক্ষান্তরে সত্যের সৈনিক আবু যর (রা) ছিলেন সততা ও সাধুতার অধিক যোগ্য। কিন্তু এ সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বলেছেন :

يَآ اَبَا ذَرٍّ اِنِّىْ اَرَاكَ ضَعِيْفًا وَاِنِّىْ اُحِبُّ مَا اُحِبُّ لِنَفْسِىْ ـ
لَاتَأَمَّرَنَّ عَلٰى اِثْنَيْنِ وَلَاتَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيْمٍ ـ (رواه مسلم)

“হে আবু যর! আমি তোমাকে দুর্বল দেখতে পাচ্ছি। তোমার ব্যাপারে আমি তাই পছন্দ করি, যা আমার নিজের ব্যাপারে পছন্দ করি। তুমি কোন সময় দু'জন ব্যক্তিরও নেতা হয়ো না। ইয়াতীমের মালের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব নিও না।” (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবু যরকে নেতৃত্ব এবং অভিভাবকত্ব গ্রহণে নিষেধ

করেছেন। অথচ তাঁরই সততা ও সুমহান চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসায় মহানবী (সা) বলেছেন :

مَا اَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ وَلاَاَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ اَصْدَقُ لَهْجَةً مِنْ اَبِىْ ذَرٍّ.

"আবু যর সত্যবাদিতার উত্তুঙ্গচূড়ায় সমাসীন ছিলেন। [এখানে 'খাযরা' এবং 'গাবরার' উপমাসূচক প্রবাদের ব্যবহার এ বিশেষণে নেই।]

হযরত আমর ইবনুল আস (রা)-কে রাসূল (সা) 'যাতেসালাসিল'-এর যুদ্ধে এজন্যে প্রেরণ করেছিলেন যে, সেখানে তাঁর নিকটাত্মীয়রা বসবাস করতো। তাঁর প্রতি রাসূল (সা) অনুগ্রহসূচক আচরণ করতে চেয়েছেন। তাঁর চাইতে উত্তম লোক থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁকেই সেখানে পাঠিয়েছেন অপর কাউকে পাঠাননি।

উসামা ইবনে যায়দকে একবার রাসূলুল্লাহ (সা) সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব প্রধান করেছিলেন।

মোটকথা, বিশেষ জাতীয় স্বার্থরক্ষার প্রেক্ষিতে কোন কোন ব্যক্তিকে তার বিশেষ বৈশিষ্ট্যে তাকে গভর্নর, প্রশাসক বা সেনাধ্যক্ষ নিয়োগ করা হতো। অথচ ধার্মিকতা, জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও ঈমানের দিক থেকে হয়তো তাদের চাইতেও যোগ্য লোক বিদ্যমান থাকতো।

এমনিভাবে প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর শাসনামলে যখন 'মুরতাদ" ফিৎনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, তা দমানোর জন্যে তিনি খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে (রা) সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে প্রেরণ করেন। ইরাক এবং সিরিয়ার জিহাদেও তাঁকেই সেনানায়ক করে পাঠানো হয়। অথচ হযরত খালিদ (রা) কর্তৃক অনেক সময় অবাঞ্ছিত কাণ্ড-কারখানা ঘটতো। কথিত আছে যে, তাঁর এসব কার্যকলাপে অনেক সময় ব্যক্তিগত ঝোঁক প্রবণতা কাজ করতো। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁকে সেনাধ্যক্ষের পদ থেকে অপসারণ করা হতো না বরং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে হঠাৎ ইষৎ ভর্ৎসনা করে ছেড়ে দেয়া হতো এবং 'ক্ষতিকর দিকে'র চাইতে তাঁর 'কল্যাণকর দিক'কেই প্রাধান্য দেয়া হতো।[১] তাঁর স্থলে অপর কাউকে স্থলাভিষিক্ত করার চিন্তা করা হতো না।

এছাড়া রাষ্ট্রের প্রধান কর্মকর্তা অর্থাৎ খলীফার মধ্যে যদি কঠোরতা কম থাকে,

১. সাহাবীগণ সকলেই ছিলেন عدول ন্যায়পরায়ণ। তাঁদের সিদ্ধান্তে কোনো ভুল হয়ত হয়ে যেতো, কিন্তু তাতে ব্যক্তিগত স্বার্থের ছোঁয়া ছিল না। খালিদকে হযরত উমর পদচ্যুত করেছিলেন, তা সত্ত্বেও খালিদ সাধারণ সৈনিক হিসেবে জিহাদ করে আনুগত্যের চরম ইসলামী দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। তাঁরা ছিলেন আদর্শ চরিত্রের অধিকারী। (সম্পাদক)

তাঁর স্থলাভিষিক্তের মধ্যে কঠোরতা থাকার দরকার হয় বৈ কি। তেমনি রাষ্ট্রের প্রধান কর্মকর্তা যদি বেশী কঠোর স্বভাবের হন, তাঁর অধীনস্থ প্রতিনিধির নমনীয় স্বভাবের প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। খলীফা হবার পূর্বে হযরত ওমর (রা) সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা)-কে তাঁর পদ থেকে অপসারণ করার পক্ষপতি ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-কে সেনাপতি পদে নিয়োগ করতে। কারণ হযরত খালিদের স্বভাবেও ছিল কঠোরতা। অপরদিকে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর চরিত্রেতো কঠোরতা ছিলই। আবু উবায়দা ছিলেন নরম স্বভাবের মানুষ। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ছিলেন নম্রতার জ্বলন্ত প্রতীক। ঐ সময় আবু বকর যা করেছিলেন তাই সঠিক ছিল। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ হযরত আবু বকরের যুগে ইসলামী ফৌজের প্রধান ছিলেন। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবের শাসনামলে ইসলামী সেনাবাহিনীর নেতৃত্বের দায়িত্বে ছিলেন আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ। এভাবেই প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত থাকে। মহানবী (সা) নিজ ব্যক্তি সত্তার ব্যাপারে বলে গেছেন :

اَنَا نَبِىُّ الرَّحْمَةِ اَنَا نَبِىُّ الْمَلْحَمَةِ ـ

"আমি রহমতের নবী, আমি যুদ্ধবিগ্রহের নবী।" অর্থাৎ প্রয়োজনে আত্মরক্ষার্থে শক্তি প্রয়োগও আমার কর্ম। মহানবী (সা) আরও ইরশাদ করেছেন :

اَنَا الضَّحُوْكُ الْقَتَّالُ وَاُمَّتِىْ وَسَطٌ ـ

"(ন্যায় সত্য প্রতিষ্ঠায়) আমি সহাস্যবদনে যুদ্ধকারী আর আমার উম্মত হচ্ছে মধ্যমপন্থী।" সাহাবায়ে কেরামের শানে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন :

اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ـ (فتح : ٢٨)

"কাফেরদের মুকাবেলায় তারা বড় কঠোর; কিন্তু পরস্পর সহানুভূতিশীল। তুমি তাদের দেখতে পাবে কখনও রুকূ করছে এবং কখনও সিজদা করছে– আল্লাহর দান এবং সন্তুষ্টি কামনায় তারা রত আছে।" (সূরা ফাতাহ : ২৮)

اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ـ

"মুসমলনাদের সাথে নরম এবং কাফের তথা আল্লাহর অবাধ্যদের প্রতি কড়া।"

(সূরা মায়েদা : ৫৪)

এ কারণেই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত উমর ফারুক (রা)-এর কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব ছিল পরিপূর্ণ। তাঁদের কর্তৃত্ব সুষ্ঠু পন্থায় পরিচালিত হতো এবং তাতে ছিল ভারসাম্য। মহানবী (সা)-এর যুগে এ দুই মহান ব্যক্তিত্ব হযরতের দুই বাহুরূপে বিবেচিত ছিল। একজন ছিলেন নরম দিল নরম স্বভাবের, অপরজন ছিলেন কঠোর হৃদয় এবং কঠোর স্বভাবের। খোদ মহানবী (সা)-এ দু'জন সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন : اِقْتَدُوْا بِالَّذَيْنَ مِنْ بَعْدِىْ -

"আমার পরে তোমরা আবু বকর এবং উমরের আনুগত্য করো।"

তাই দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) 'মুরতাদ'দের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এমন বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন যে, হযরত উমর (রা) পর্যন্ত বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। হযরত আবু বকর (রা) থেকে এরূপ সাহসিকতাপূর্ণ ভূমিকা তিনি কখনও প্রত্যাশা করেননি। অন্যান্য সকল সাহাবীও এ ব্যাপারে অনবহিত ছিলেন। তাঁরা বলতেন, শুধু যাকাত অস্বীকারে আপনি কিভাবে তাদের সাথে জিহাদ করবেন?

অতএব ব্যাপার যদি এমন হয় যে, সেখানে সততা সাধুতা, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি গুণের সাথে সাথে কঠোরতা ও বলিষ্ঠতারও প্রয়োজন, তাহলে সেক্ষেত্রে কঠোর নেতৃত্বকেই এগিয়ে দেবে। যেমন, অর্থ-সম্পদের হেফাযতের প্রশ্নে কঠোর স্বভাব বিশিষ্ট লোকের প্রয়োজন। কেননা, অর্থ-সম্পদ উসূল ও তার সংরক্ষণের জন্যে শক্তি ও বিশ্বস্ততা উভয়েরই প্রয়োজন হয় বৈ কি। এজন্যে সেখানে স্থানীয় প্রশাসক ও কর্মকর্তাকে কঠোর ও শক্তিমান হতে হবে, যেন তার কড়াকড়ির ফলে অর্থ আদায়ে গড়িমসি প্রশয় না পায়। সচিব, কেরানী ও কোষাধ্যক্ষকে যোগ্য ও বিশ্বস্ত হতে হবে। তাদের যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার দ্বারাই অর্থ-সম্পদের যথাযথ হেফাযত হওয়া সম্ভব। যুদ্ধ ক্ষেত্রের নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের প্রশ্নেও একই অবস্থা এবং একই বিধান। প্রাজ্ঞ ও ধার্মিক ব্যক্তিদের পরামর্শের ভিত্তিতে যুদ্ধ পরিচালক নিযুক্ত করবে। তাতে উভয় প্রকার যোগ্যতা ও গুণ বৈশিষ্ট্যের প্রতিই লক্ষ্য রাখা হবে। বস্তুতঃ প্রশাসনিক সকল কর্তৃত্ব ও সকল প্রকার নেতৃত্বের ক্ষেত্রে একই দৃষ্টিভঙ্গি ও বিধানই অনুসরণ যোগ্য।

কোন একক ব্যক্তিত্বের দ্বারা যদি কর্তৃত্ব-নেতৃত্বের মূল লক্ষ্য ও কল্যাণকারিতা পূর্ণ

না হয়, তাহলে দুই, তিন অথবা তারও অধিক ব্যক্তি একই কাজে নিয়োজিত করা যেতে পারে। তবে সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তিকেই প্রাধান্য দেবে। একের দ্বারা কাজ না চললে প্রয়োজনে একাধিক গভর্নর ও কর্মকর্তা নিযুক্ত করবে এবং সর্বাবস্থায়ই যোগ্যতর ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেবে।

বিচার কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে অধিক জ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ খোদাভীরু, যোগ্য লোককে প্রাধান্য দেবে। যদি একজন অধিক জ্ঞানী এবং অপরজন অধিক মুত্তাকী ও খোদাভীরু হয় তাহলে লক্ষ্য করতে হবে যে, দ্বিধাদ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে অধিক জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞান-প্রজ্ঞা এবং অধিক মুত্তাকী ব্যক্তির আগ্রহ-আখাঙ্ক্ষা সংশ্লিষ্ট বিধান প্রযোগে বাধা সৃষ্টি করছে না তো?

কেননা হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে,

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْبَصِيْرَ النَّاقِدَ عِنْدَ وُرُوْدِ الشُّبُهَاتِ وَيُحِبُّ الْعَقْلَ عِنْدَ حُلُوْلِ الشَّهَوَاتِ -

"(সিদ্ধান্ত গ্রহণে) দ্বিধা-সন্দেহের মুহূর্তে দূরদর্শী ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাকারীকে আল্লাহ তায়ালা ভালবাসেন, আর ভালবাসেন ঐ বুদ্ধিমত্তাকে যা কোন ব্যাপারে আগ্রহ-আকাঙ্ক্ষার প্রাবল্যের মুহূর্তে ভারসাম্য বজায় রাখতে সমর্থ।"

কাযী (বিচারক)কে যুদ্ধবিষয়ক প্রধান কর্মকর্তা, সেনাধ্যক্ষ কিংবা সাধারণ প্রশাসনিক প্রধানের সমর্থনপুষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়, তবে তা জরুরী নয়। বিচারকের নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ শিক্ষা ও জ্ঞান বিষয়ক বৈশিষ্ট্য থাকা এবং ধার্মিকতার গুণকে প্রাধান্য দিতে হবে, যদি জ্ঞান ও ধার্মিকতার মুকাবেলায় শক্তি সামর্থ্যের প্রয়োজন অধিক দেখা দেয়, সে ক্ষেত্রে মিতব্যয়ী ও স্বাবলম্বী ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেবে।

কোন কোন 'আলিম তথা ইসলামী জ্ঞান বিশেষজ্ঞদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, বিচারের ফয়সালার জন্যে কোন যোগ্য লোক পাওয়া যাচ্ছে না, গেলেও সে ফাসিক আলিম কিংবা জাহিল দ্বীনদার। এ দু'য়ের মধ্যে কাকে প্রাধান্য দিতে হবে? তারা জবাব দিয়েছিলেন, ঐ ব্যক্তির মধ্যে সত্য এবং কল্যাণের পথ থেকে দূরে থাকার ভাব-প্রবণতা অধিক হলে দ্বীনের কাজে ত্রুটি দেখা দেয়া স্বাভাবিক বিধায় দ্বীনদার ব্যক্তিটিকেই প্রাধান্য দেয়া উচিত। শাসকদের অবহেলার দরুন দ্বীনের কাজের ত্রুটি হতে থাকলে আলিমকেই সে ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেবে। অধিকাংশ আলিম ব্যক্তি দ্বীনদারকেই এ ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেবার পক্ষে মত দিয়েছেন। কারণ, এ ব্যাপারে সকল ইমাম মুজতাহিদ একমত যে, কর্মকর্তা, আমীর এমন ব্যক্তিকে হতে হবে

যিনি ন্যায় বিচারক এবং সাক্ষ্যদানের যোগ্য।

'ইলমের শর্তের বেলায় মত পার্থক্য রয়েছে যে, কি ধরনের আলিমকে কোন ব্যাপারে কর্মকর্তা করা হবে? সে আলিমকে মুজতাহিদ হতে হবে, না মুকাল্লিদ, অথবা যে ধরনের পাওয়া যায় তাকেই নিয়োগ করা। এ ব্যাপারে অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তার অবকাশ খুব কম। তবুও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হলো পরিস্থিতির প্রেক্ষাপট বিচারপূর্বক আপেক্ষিক কর্মযোগ্য ব্যক্তিকে প্রয়োজনে শাসক-কর্মকর্তা বানানো বৈধ। কারণ, পরিস্থিতি ও পরিবেশের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখাও কর্তব্য যাতে মন্দকে যথাসম্ভব নির্মূল করা যায়। কোনো ব্যক্তি হয়তো জ্ঞান প্রজ্ঞার দিক থেকে অধিকতর যোগ্য কিন্তু কোনো বিশেষ এলাকার আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যাপারে হয়তো দুর্বল। সে ক্ষেত্রে কম প্রজ্ঞাশীল হলেও শক্ত লোক দরকার।

সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব হচ্ছে জনগণের প্রয়োজনে। সে প্রয়োজন কিভাবে পূরণ হবে তা দেখতে হবে। যেমন, সমাজের অস্বচ্ছল নাগরিকদের গৃহীত নিজ নিজ ঋণের টাকা পরিশোধ করা কর্তব্য। কিন্তু বর্তমানে তার থেকে এ পরিমাণেরই তাগাদা দেয়া উচিত, সে যে পরিমাণ আদায় করতে সক্ষম। যেমন, জিহাদের তৈরির জন্যে শক্তি সঞ্চয় এবং এ জন্যে অধিক ঘোড়ার ব্যবস্থা (তথা সমরোপকরণ জোগাড়) রাখার নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু অক্ষমতা ও অসমর্থতার সময় কোনো নাগিরকের উপর থেকে এ হুকুম রহিত হয়ে যায়। তখন তার যদ্দুর সাধ্যে কুলায়, তাই তার জন্য ফরয হয়ে দাঁড়ায়। ফরয আদায় করাটাই তখন তার কর্তব্য। অবশ্য হজ্জ এবং অন্যান্য ইবাদতের কথা ভিন্ন। সেক্ষেত্রে এই কথা প্রযোজ্য নয়। বরং হজ্জ ইত্যাদি পালন তার ওপর ফরয।

مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً -

"যার হজ্জে যাবার ক্ষমতা ও সামর্থ্য রয়েছে।" (সূর আলে ইমরান : ৯৭)

এটা ফরয নয় যে, সে বিশেষভাবে ক্ষমতা ও সামর্থ্য সৃষ্টিতে লেগে যাবে। কেননা, হজ্জ তখনই ফরয হয় যখন তার মধ্যে স্বাভাবিক উপায়ে সামর্থ্য আসে, এ জন্যে বিশেষ কায়দায় সামর্থ্য সৃষ্টি করা ফরয নয়।

[চার]

ইসলামে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের লক্ষ্য : কুরআন সুন্নাহ্‌র শিক্ষা, আইন-কানুন বাস্তবায়ন

যোগ্যতর ব্যক্তির পরিচয়, শাসন-কর্তৃত্বের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য, উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিচিতি, কর্তৃত্বের লক্ষ্য দীনের প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োজনীয় সংস্কার, জুমুআ ও জামাআতের সুষ্ঠু প্রতিষ্ঠা, জনগণের দীনী সংশোধন– এই পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়।

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলতেন, আমি এজন্য তোমাদের নিকট কোনো শাসক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রেরণ করি, তারা যেন তোমাদেরকে মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র কিতাব এবং নবীর আদর্শ শিক্ষা দেয় আর দীন তথা ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে সক্রিয় ও স্থায়ী রাখে।

সর্বাধিক যোগ্যতর ব্যক্তির পরিচয় তখন জানা যাবে, যখন শাসন কর্তৃত্বের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যে পৌছার পদ্ধতি জানা যাবে। তোমার কাছে যখন লক্ষ্য স্পষ্ট হবে এবং সেই লক্ষ্যে পৌছার পদ্ধতি জানা হয়ে যাবে, তখন মনে করবে যে, তোমার করণীয় বিষয়টি তুমি পূর্ণভাবে অনুধাবন করতে পেরেছো।

রাজা-বাদশাহ তথা শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে যদি বৈষয়িক স্বার্থ প্রাধান্য পায় আর তারা ধর্ম, ধর্মীয় শিক্ষা ও মূল্যবোধ ত্যাগ করে বসে, তখন শাসক কর্তৃপক্ষ শাসন যন্ত্রে এমন সব লোককেই পদোন্নতি দেন, যাদের দ্বারা তাদের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য-লক্ষ্যই অধিক হাসিল হয়। যে শাসক নিজ ব্যক্তি স্বার্থের জন্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রত্যাশী, সে নিয়োগ-বদলিতে ঐ ব্যক্তিকেই প্রাধান্য দেবে, যে তার রাষ্ট্র, কর্তৃত্ব পদ বহাল রাখতে সহায়ক। মহানবী (সা)-এর রাজনৈতিক আদর্শে আমরা দেখতে পাই, শাসন ক্ষমতা ও যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও সেনাপতিগণ যারা রাষ্ট্র প্রধানের প্রতিনিধি এবং ফৌজী সিপাহ্‌সালার, তারা মুসলমানদের জুমআর নামায এবং জামাআতের ইমামত করতেন। জনগণের সামনে মূল্যবান বক্তৃতা দান করতেন। এ জন্যেই রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর তিরোধানের প্রাক্কালে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-কে নামাযের ইমামতের দায়িত্বে পদোন্নতি দিয়েছিলেন। মুসলিম মিল্লাতে সমর নেতৃত্বের মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বেও তাঁকেই অগ্রগামী রাখতেন।

মহানবী (সা) যখন কাউকে সেনাপতি নিয়োগ করে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করতেন, সর্বপ্রথম তাঁকে প্রদত্ত সরকারী অর্ডারে নামায কায়েমের হুকুম করতেন। এমনিভাবে যখন কাউকে কোনো শহর জনপদের শাসনকর্তা করে পাঠাতেন, প্রথমে তাকে জামাআতের সাথে নামায পড়াবার নির্দেশ দিতেন। যেমন, রাসূলুল্লাহ (সা) আত্তাব ইবন উসায়দ (রা)-কে মক্কার শাসনকর্তা করে পাঠিয়েছিলেন। তেমনি উসমান ইবনে আবিল আস (র)-কে পাঠিয়েছিলেন তায়েফের শাসনকর্তা করে। হযরত আলী (রা) হযরত মুয়ায (রা) এবং হযরত আবু মূসা (রা)-কে ইয়ামেনের শাসনকর্তারূপে পাঠিয়েছিলেন। আমর ইবনে হাযম (রা)-কে পাঠিয়েছিলেন নাজরানের শাসনকর্তা করে। তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নায়েব বা প্রতিনিধি হিসাবে জামাআতের নামাযে ইমামত করতেন এবং শরী'য়াতী শাসন তথা হুদূদ ইত্যাদি কায়েম করতেন। যুদ্ধের সেনাপতিও ঠিক একই কাজ করাতো। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইনতিকালের পর ইসলামী রাষ্ট্রে তাঁর স্থলাভিষিক্ত খলীফাগণও একই নিয়মে এসব রাষ্ট্রীয়-ধর্মীয় দায়িত্ব সম্পাদন করতেন। বনী উমাইয়া-র বাদশাহগণ এবং দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া আব্বাসী শাসকগণও তাই করেছেন। এটা এজন্যে করা হতো যেহেতু দীন ইসলামে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নামায এবং জিহাদ।

এ কারণেই বহু হাদীসে নামায এবং জিহাদকে একই সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি কোনো রুগীর শুশ্রুসায় গেলে বলতেন–

اَللّٰهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ لِيَشْهِدَ لَكَ صَلٰوةً وَيَنْكَأَ عَدُوًّا..

"হে আল্লাহ তোমার এ বান্দাকে আরোগ্য দান করো, যেন সে নামাযে হাজির হতে পারে এবং তোমার দুশমনদের মোকাবেলা করতে পারে।"

يَا مُعَاذُ اِنَّ اَهَمَّ اَمْرٍ عِنْدِى الصَّلٰوةُ.

"হে মুআয! আমার কাছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নামায।"

আঞ্চলিক শাসক ও কর্মচারীদের কাছে হযরত উমরের নির্দেশনামা :

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকায় নিয়োজিত কর্মচারী ও গভর্ণরদের উদ্দেশ্যে যে সরকারী ফরমান লিখে পাঠাতেন। ঐগুলোতে লিখা থাকতো–

اِنَّ اَهَمَّ اُمُوْرِكُمْ عِنْدِى الصَّلٰوةُ فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا وَحَفِظَهَا حَفِظَ دِيْنَهٗ وَمَنْ ضَيَّعَهَا كَانَ سِوَاهَا مِنْ عَمَلِهٖ اَشَدُّ اِضَاعَةً.

"আমার কাছে তোমাদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নামায। যে ব্যক্তি নামাযের হেফাজত করলো, সে দীনের হেফাজত করলো। যে নামায নষ্ট করলো সে অন্যান্য কাজও বেশী নষ্ট করবে।"

হযরত উমরের এ কথার তাৎপর্য হলো, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

اَلصَّلٰوةُ عِمَادُ الدِّيْنِ.

"নামায হচ্ছে দীনের স্তম্ভ।" প্রশাসনিক কর্মকর্তারা যখন এই স্তম্ভটির হেফাজত করবে, তখন নামায তাকে অশ্লীলতা এবং সকল গর্হিত কাজ ও দুর্নীতি থেকে রক্ষা করবে এবং অন্যান্য ইবাদতের কাজে নামায তার সাহায্যকারী হবে। ("কারণ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ নামায গর্হিত-অবাঞ্ছিত কাজ থেকে বিরত রাখে।")

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন :

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِيْنَ.

"(দীনের উপর) অটল-অবস্থান এবং নামাযের দ্বারা (আল্লাহ্‌র) সাহায্য কামনা কর আর (মনে রেখো) নামায অত্যন্ত ভারি জিনিস। তবে যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্যে এটি ভারি নয়।" (সূরা বাকারা : ৪৫)

يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ.

"হে মুসলমানগণ, (সকল সময় তোমরা দীনের উপর অটল অবস্থান নিয়ে) ধৈর্য ও নামাযের দ্বারা (আল্লাহ্‌র) সাহায্য কামনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যধারণকারীদের সাথে থাকেন।" (সূরা বাকারা : ১৫৩)

আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সা)-কে সম্বোধন করে বলেছেন :

وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لاَنَسْئَلُكَ رِزْقًا ـ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ـ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى.

"(হে নবী!) নিজের পরিবারস্থ লোকদের নামাযের তাগিদ করো। নিজেও পাবন্দির সাথে নামাযে রত থাকবে। আমি তো তোমাদের নিকট কোনো রিযিক চাই না– বরং আমি নিজেই তোমাদের রিযিক দেই। উত্তম পরিণতি তো তাকওয়া তথা আল্লাহ্‌ভীতি পূর্ণ সাবধানী জীবন অবলম্বনেই রয়েছে।" (সূরা ত্ব-হা : ১৩২)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ - مَا اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَّمَا اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنَ - اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنِ.

"জিন এবং ইনসানকে আমি একমাত্র আমার ইবাদত তথা নিরঙ্কুশ আনুগত্য ও দাসত্ব করার জন্যেই সৃষ্টি করেছি। তাদের থেকে আমি কোনো রিযিকের প্রত্যাশী নই। আর তাদের কাছে এটাও চাইনা যে তারা আমাকে খাবার দিক। আল্লাহ নিজেই তো অধিক রিযিকদাতা, প্রচণ্ড শক্তিধর এক মহাসত্তা।" (সূরা যারিয়াত : ৫৬-৫৮)

অতএব এটা বুঝা গেল যে, কর্তৃত্ব নেতৃত্বের মূল লক্ষ্য হলো মানুষের সেবা করা এবং তাদের সংশোধন করা। মানুষ যদি দীনকে পরিত্যাগ করে তাহলে তারা কঠিন দুর্গতির সম্মুখীন হয়ে পড়বে, আর তাদেরকে যেসব পার্থিব নেয়ামত সুযোগ-সুবিধা ও উপভোগ্য জিনিস দান করা হয়েছে, সেগুলো তাদের জন্যে কখনও কল্যাণকর হবে না। বৈষয়িক সেই কাজের দ্বারা তাদের যেই দীনী কল্যাণ সাধিত হতো, তা হবে না।

বৈষয়িক যেই জিনিসের দ্বারা মানুষ দীনী কল্যাণ লাভ করতে পারে, তা দু'প্রকার। এক. সম্পদকে তার হকদারের কাছে পৌছানো। দুই. বাড়াবাড়ি এবং অন্যায়ভাবে সম্পদ হস্তগতকারীকে শাস্তি প্রদান। সুতরাং যে ব্যক্তি সীমা অতিক্রম ও বাড়াবাড়ি করে না, জেনে রেখো, সে তার দীনের কাজে অভ্যস্ত হয়েছে। এজন্যে দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা) বলতেন :

اِنَّمَا بَعَثْتُ عُمَّالِىْ اِلَيْكُمْ لِيُعَلِّمُوْاكُمْ كِتَابَ رَبِّكُمْ وَسُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَيُقِيْمُوْا بَيْنَكُمْ دِيْنَكُمْ.

"হে জনগণ, আমি আমার কর্মচারী ও গভর্ণরদেরকে এজন্যে তোমাদের কাছে পাঠাই, যেন তারা তোমাদেরকে তোমাদের প্রভুর কিতাব এবং নবীর আদর্শ শিক্ষা দেয় আর তোমাদের মধ্যে দীন কায়েম রাখে।"

বর্তমানে যেহেতু শাসক-শাসিত উভয়ের মধ্যে বিকৃতি ঘটেছে, যদ্দরুন সকল

ক্ষেত্রের কার্যকলাপেই বিকৃতি দেখা দিয়েছে, এজন্যে সংশোধনও একটি কষ্ট সাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে বৈ কি। তাই যেসব শাসক সম্ভাব্য সকল উপায়ে জনগণের দীন-দুনিয়া উভয়টির কল্যাণার্থেই কাজ করবে, সেসব ব্যক্তি যুগশ্রেষ্ঠ এবং উত্তম মুজাহিদ হিসাবে গণ্য হবে। যেমন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন–

يَوْمٌ مِنْ اِمَامٍ عَادِلٍ اَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً.

"ন্যায়পরায়ণ ইমাম বা নেতার একটি দিন ৬০ বছরের ইবাদতের চাইতে উত্তম।"

মুসনাদে ইমাম আহমদ গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, তিনি ইরশাদ করেছেন–

اَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللّٰهِ عَادِلٌ وَابْغَضُهُمْ اِلَيْهِ اِمَامٌ جَائِرٌ.

"মানুষের মধ্যে আল্লাহর অতি প্রিয় ব্যক্তি হচ্ছে ন্যায়পরায়ণ নেতা। আর আল্লাহর রোষে অধিক নিপতিত ব্যক্তি হচ্ছে জালিম নেতা।"

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন–

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلاَّ ظِلُّهُ - اِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللّٰهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ اِذْ خَرَجَ مِنْهُ حَتّٰى يَعُوْدَ اِلَيْهِ وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِيْ اللّٰهِ اِجْتَمَعَا عَلٰى ذَالِكَ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَاَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ اِلٰى نَفْسِهَا قَالَ اِنِّيْ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتّٰى لَاتَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ. (متفق عليه)

"আল্লাহর ছায়া ছাড়া যেদিন আর কোনো ছায়া থাকবে না, তখন সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তায়ালা নিজের রহমতের ছায়াতলে স্থান দেবেন। (১) ন্যায়পরায়ণ নেতা, (২) ইবাদতগুযার যুবক, (৩) ঐ ব্যক্তি যিনি নামায শেষে মসজিদ থেকে বের হবার পরও পুনরায় কখন মসজিদে যাবেন তার অন্তর সে ভাবনায় মগ্ন থাকে, (৪) সেই দুই ব্যক্তি যাদের বন্ধুত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্যে–

ঐ বন্ধুত্বের ভিত্তিতেই তারা মিলিত হয় এবং বিচ্ছিন্ন হলেও ঐ কারণেই বিচ্ছিন্ন হয়, (৫) যে ব্যক্তি একান্তে মানুষের অগোচরে আল্লাহর যিকির করে এবং চোখের পানি ছেড়ে দেয়, (৬) যে ব্যক্তিকে কোনো অভিজাত সুন্দরী রমণী কামাচারের আহ্বান জানালে সে এই বলে জবাব দেয় যে, বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে আমি ভয় করি, (৭) যে ব্যক্তি এমন গোপনে দান খয়রাত করে যে, ডান হাতে খরচ করলে তার বাম হাত জানে না।" (বুখারী ও মুসলিম)

সহীহ মুসলিম শরীফে হৈয়াদ ইবনে হাম্মাদ (রহ) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন–

اَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلاَثَةٌ سُلْطَانٌ مُقْسِطٌ وَرَجُلٌ رَحِيْمٌ رَقِيْقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِىْ قُرْبٰى وَمُسْلِمٍ وَرَجُلٌ غَنِىٌّ عَفِيْفٌ مُتَصَدِّقٌ.

"তিন প্রকারের লোক বেহেশতী। (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক, রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান (২) দয়ালু ব্যক্তি, নিকটাত্মীয় এবং মুসলমানদের সহমর্মিতায় যার হৃদয় বিগলিত, (৩) সেই ধনী ব্যক্তি, যিনি চরিত্রবান এবং দানশীল।"

সুনানে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একটি হাদীস উল্লেখিত আছে যে–

اَلسَّاعِىْ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

"দান খয়রাতের কাজে নিষ্ঠাবান সচেষ্ট ব্যক্তি হচ্ছে আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদের মতো। তবে দান হতে হবে লোক দেখাবার জন্যে নয়।"

আল্লাহ তায়ালা জুলুম-অন্যায়ের ধ্বজাধারী সন্ত্রাসী, আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন–

وَقَاتِلُوْا هُمْ حَتّٰى لاَتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ.

"যতদিন (সমাজের শান্তিপ্রিয় মানুষদের বিরুদ্ধে) ফিৎনা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার অবসান না ঘটবে এবং (সমাজে) একমাত্র আল্লাহর দ্বীনেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত না হবে, তোমরা (মানবতা বিরোধী ঐ প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সম্ভাব্য সকল উপায়ে) লড়ে যেতে থাকো।" (সূরা বাকারা : ১৯৩)

একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে আরয করা হলো যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মানুষ কোন সময় আপন বীরত্ব দেখাবার জন্যে লড়াই করে, কখনও আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রেরণা তাদের লড়াইর পেছনে অনুপ্রেরণা যোগায়, আবার কখনো

লড়াইর পেছনে লোক দেখানো ভাবও সক্রিয় থাকে। এহেন অবস্থায় কোনটিকে "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ" বলা যাবে? হযরত রাসূল (সা) ইরশাদ করলেন–

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي الْجِهَادِ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত রাখার জন্যে যে ব্যক্তি লড়াই করবে, সেটিই হবে "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্ বা আল্লাহ্র পথে জিহাদ।" (হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত।)

অতএব বুঝা গেল, জিহাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, সর্বত্র আল্লাহ্র শ্রেণী বৈষম্যমুক্ত ন্যায় বিধান তাঁর দীনেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা এবং তাঁর বাণীকে সমুন্নত করা। كَلِمَةُ اللّٰهِ তথা "আল্লাহর বাণী" কথাটি ব্যাপক অর্থবোধক। এর দ্বারা আল্লাহ্র বিধান গ্রন্থ কালামুল্লাহ্কেও বুঝানো হয়ে থাকে।

এভাবে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন–

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ.

"আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট দলীল দিয়ে প্রেরণ করেছি। তাদের মাধ্যমে প্রেরণ করেছি 'কিতাব' ও 'মীযান' (ন্যায়দণ্ড), যেন তাঁরা (ইসলামের) ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে।" (সূরা হাদীদ : ২৫)

বিভিন্ন পয়গম্বর এবং কিতাব প্রেরণের উদ্দেশ্য হলো মানুষ যেন আল্লাহর হক এবং বান্দার হকসমূহ ইনসাফ ও ন্যায়নীতি সহকারে প্রতিষ্ঠিত করে।

অতঃপর আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ.

"আমি লোহা সৃষ্টি করেছি। তাতে রয়েছে বিরাট ভীতিপূর্ণ উপাদান। মানুষের কল্যাণও তাতে নিহিত আছে। আর তাতে অন্য এক উদ্দেশ্য এটাও নিহিত যে, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যক্ষভাবে জানতে চান যে, এর মাধ্যমে কারা তাঁকে ও তাঁর রাসূলদের সাহায্যে এগিয়ে আসে।" (সূরা হাদীদ : ২৫)

অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের বিধানসমূহ ও এর নীতি-আদর্শ বাদ দিয়ে ভিন্ন মতাদর্শ ও নীতির অনুসরণ করে চলে, আল্লাহ্র অভিপ্রায় হলো, সে

প্রতিরোধে এগিয়ে এলে তাকে লোহা উপকরণ দ্বারা গঠিত হাতিয়ার দ্বারা হলেও অন্যায় পথ থেকে ফেরানো উচিত। কারণ, দীনের প্রতিষ্ঠা, দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব আল্লাহর কিতাব এবং (শক্তির প্রতীক) তরবারীর উপরও ক্ষেত্র বিশেষে নির্ভরশীল।

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন اَنْ نَضْرِبَ بِهٰذَا। অর্থাৎ "আমরা যেন সেই অগ্রগামী ব্যক্তির প্রতি তরবারী তথা উপযুক্ত অস্ত্রের আঘাত হানি যে ব্যক্তি কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে এর অনুসারীদের নিশ্চিহ্ন করতে এগিয়ে আসে।

সুতরাং উদ্দেশ্য যখন এই, তখন 'আকরাব ফাল আকরাব' (নিকটতর অতঃপর নিকটস্থ) এ পন্থায় লক্ষ্য হাসিল করা বাঞ্ছনীয়। কর্তৃত্ব-নেতৃত্বের প্রশ্নে এমন দুই ব্যক্তিকে বেছে নেবে এবং লক্ষ্য করবে যে, উভয়ের মধ্যে কে লক্ষ্যের অতি নিকটতর? উভয়ের মধ্যে লক্ষ্য অর্জনের যোগ্যতার দিক থেকে যে শ্রেষ্ঠ, তাকেই কর্মকর্তা বা শাসনকর্তা নিযুক্ত করবে।

নেতৃত্বের প্রশ্নে কাকে অগ্রাধিকার দেয়া বাঞ্ছনীয়? এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বক্তব্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন–

يَؤُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَءُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ - فَاِنْ كَانُوْا فِى الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَاَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ كَانُوْا فِى السُّنَّةِ فَاِنْ كَانُوْا فِى السُّنَّةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَاِنْ كَانُوْا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ سِنًّا وَلَا يُؤُمُّ الرَّجُلُ فِىْ سُلْطَانِهٖ - وَلَايَجْلِسُ عَلٰى تَكْرِمَتِهٖ اِلاَّ بِاِذْنِهٖ -

"(ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজে) জাতির ইমামত বা নেতৃত্ব সে ব্যক্তিই করবে, যে আল্লাহ্র আইনের কিতাব অধিক পাঠ ও মর্মার্থ অনুধাবনকারী। তাতে যদি একাধিক ব্যক্তির যোগ্যতা সমপর্যায়ের হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে হযরতের সুন্নাত–নীতি আদর্শ সম্পর্কে যে ব্যক্তি বিশেষভাবে অবগত, তাকেই প্রাধান্য দেবে। তাতেও সকলে সমপর্যায়ের হলে ঐ ব্যক্তিই নেতৃত্বের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবেন, যিনি হিজরত গমনে অগ্রবর্তী ছিলেন। যদি হিজরত গমনের যোগ্যতাও সকলের সমান সমান হয়, তাহলে যে বয়সে অপেক্ষাকৃত বড়, তাকে নেতা নির্ধারণ করবে। তাঁর প্রভাব বলয়ের মধ্যে অপর কোনো ব্যক্তি নেতৃত্ব করবে না এবং তাঁর মর্যাদার আসনে অনুমতি ছাড়া বসবে না।" (মুসলিম)

একাধিক ব্যক্তির মধ্যে যদি সমযোগ্যতা থাকে এবং তাদের মধ্যে কে যে অধিক যোগ্য তা জানা না যায়, তখন 'কোরা' বা লটারীর মাধ্যমে নেতা নির্বাচন করবে। যেমন সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা) কাদেসিয়ার যুদ্ধে করেছিলেন। কে আযান দেবে, তা নিয়ে সেনাবাহিনীতে বিরাট বাক-বিতণ্ডার সূত্রপাত ঘটে। এমনকি পরস্পর সংঘর্ষের উপক্রম দেখা দেয়। সকলেই বলছে 'আমি আযান দেবো।' অনেকেই অগ্রাধিকার প্রাপ্তির যৌক্তিকতা তুলে ধরে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিম্নোক্ত নির্দেশের অনুসরণ করা হয়।

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا اِلاَّ اَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لاَسْتَهِمُوْا ـ

"মানুষ আযান এবং নামাযের সামনের সারির সওয়াবের গুরুত্ব বুঝার ফলে যদি লটারীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তাহলে তাই করবে।"

[পাঁচ]

মাল-সম্পদ, ঋণ, যৌথ ব্যবস্থা, মুজারাবাত আল্লাহ্র নির্দেশিত পন্থায় মোকদ্দমার ফয়সালা ইত্যাদি

সরকারী আমানতের অপর ধরন হলো মাল-সম্পদ এবং বিশেষ ও সাধারণ ঋণ, আমানতদারী, যৌথ ব্যবস্থা, তাওয়াক্কুল, মুজারাবাত, এতীমের সম্পদ, ওয়াকফ ইত্যাদি। ফকীর-মিসকীন সর্বস্বহীনকে দান-খয়রাত প্রদান, উসুলকারী, কর্মচারী, 'মোয়াল্লাফাতুল কুলূব', দাস মুক্তি, ঋণগ্রস্তকে অর্থ সাহায্য দান এবং আল্লাহর পথে দান-সাদকা প্রদান প্রভৃতি এ পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়।

আমানতের দ্বিতীয় প্রকারটি মাল-সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট। কর্জ বা ঋণ সম্পর্কে আল্লাহ্ ইরশাদ করেন-

فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ -

"তোমাদের মধ্যে যদি একে অপরকে আমানতদার বানায়, তার উচিত উক্ত দাতাকে তার আমানত আদায় করে দেয়া এবং নিজ প্রভু আল্লাহকে ভয় করা।" (সূরা বাকারা : ২৮৩)

এ প্রকার আমানতের মধ্যে যেসব বিষয় শামিল তা হলো মূলধন, বিশেষ ও সাধারণ ঋণ, যেমন গচ্ছিত সম্পদ। যৌথ শরীকদার, মুয়াক্কিল, মুজারিব ও এতীমের মাল, ওয়াকফ সম্পত্তি, খরিদকৃত সম্পদের মূল্য আদায় করা, ঋণ, নারীদের মোহর, লভ্যাংশের মজুরী ইত্যাদি।

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا - اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا - وَّاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا اِلاَّ الْمُصَلِّيْنَ - الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلاَتِهِمْ دَائِمُوْنَ - وَالَّذِيْنَ فِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُوْمٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ. (الى قوله) وَالَّذِيْنَ هُمْ لاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ.

"জন্মগতভাবে মানুষ অসহিষ্ণু। যখন তাকে ক্ষতি স্পর্শ করে, সে বিচলিত হয়ে ওঠে আর যখন তাকে প্রাচুর্য স্পর্শ করে, সে কৃপণ হয়ে যায়। তবে নামাযী ব্যক্তিরা নয়, যারা নিজেদের নামাযে সদা নিষ্ঠাবান, যাদের সম্পদে ভিক্ষুক এবং বঞ্চিত উভয় শ্রেণীর মানুষের হক নির্ধারিত রয়েছে।... আর যারা আমানত ও নিজেদের কৃত চুক্তি ওয়াদা রক্ষা করে।" (মায়ারিজ : ১৯-৩২)

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন–

اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهُ وَلَاتَكُنْ لِّلْخَائِنِيْنَ خَصِيْمًا.

"হে নবী! আমি তোমার কাছে সঠিকরূপে কিতাব নাযিল করেছি। তোমাকে আল্লাহ্ তায়ালা যেরূপ বাৎলিয়ে দিয়েছেন, তুমি ঠিক সেভাবে মানুষের পারস্পরিক বিরোধ, মামলা-মোকাদ্দমার ফয়সালা করবে। খেয়ানতকারী প্রতারকদের পক্ষাবলম্বন করবে না।" (সূরা নিসা : ১০৫)

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন–

اَدِّ الْاَمَانَةَ اِلٰى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ ـ

"তোমার কাছে যে ব্যক্তি আমানত রেখেছে, তুমি তাকে তা হুবহু বুঝিয়ে দাও। তোমার সাথে খেয়ানত-প্রবঞ্চনা ও বিশ্বাসঘাতকতা করলে, তুমি তার সাথে প্রবঞ্চনা করো না।"

মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন–

اَلْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ الْمُسْلِمُوْنَ عَلٰى دِمَائِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ عَمَّا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِىْ ذَاتِ اللّٰهِ ـ

"মুসলমানরা যাকে জানমালের নিরাপত্তার প্রশ্নে বিশ্বস্ত মনে করে সে-ই 'মুমিন'। আর ঐ ব্যক্তি হচ্ছে খাঁটি 'মুসলিম', যার হাত ও রসনা থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে। আর প্রকৃত 'মুহাজির' হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে। তেমনি সেই হচ্ছে খাটি মুজাহিদ, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্যে আপন সত্তার বিরুদ্ধে লড়াই করে।"

এটি একটি সহীহ হাদীস। এর অংশ বিশেষ বুখারী এবং মুসলিমে উল্লেখিত আছে। কিছু অংশ তিরমিযী শরীফেও উল্লেখ আছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) আরও ইরশাদ করেছেন–

مَنْ اَخَذَ اَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ اَدَائَهَا اَدَاهَا اللّٰهُ عَنْهُ ـ وَمَنْ اَخَذَهَا يُرِيْدُ اِتْلاَفَهَا اَتْلَفَهُ اللّٰهُ ـ

"ফেরত দেয়ার অভিপ্রায়ে যে মানুষের সম্পদ গ্রহণ করে, আল্লাহ তা পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেন। আর কেউ সম্পূর্ণ আত্মসাতের নিয়তে কারও কাছ থেকে কোনো অর্থ-সম্পদ নিলে, আল্লাহ তায়ালা তা ধ্বংস করে দেন।" (বুখারী)

সকল আমানত পরিশোধকে আল্লাহ ফরজ করেছেন। আমানতে খেয়ানত, লুট, ছিনতাই, চুরি, প্রতারণা যাই হোক, তা আদায়ের জন্য সতর্ক করা হয়েছে। এমনিভাবে হাওলাত বা ধার হিসাবে গৃহীত অর্থ সম্পদ ও জিনিসপত্র ফেরত দেয়া ফরজ।

রাসূলুল্লাহ (সা) এ সম্পর্কে বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন–

اَلْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمَنْحَةُ مَرْدُوْدَةٌ وَالدَّيْنُ مُقْضٰى وَالزَّعِيْمُ غَارِمٌ ـ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَعْطٰى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ـ

"ধারে গৃহীত জিনিস ফেরত দিতে হবে, উটের শাবক যার জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তাকেই দিয়ে দেবে। ঋণ অবশ্য পরিশোধ্য। নেতার উপর যে কর্তব্য নির্ধারিত, তাকে তা আদায় করতেই হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক হকদারকে তার হক (অধিকার) প্রদান করে দিয়েছেন। সুতরাং উত্তরাধিকারীর জন্যে অসিয়ত নেই।"

দেশের প্রধান শাসক, আঞ্চলিক শাসকবর্গ ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ এবং জনগণের সকলেই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। শাসক ও শাসিত উভয় শ্রেণীর উপরই এটা ফরজ বা কর্তব্য যে, তারা পরস্পরের উপর বর্তিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে। রাষ্ট্র নায়ক এবং তার স্থলাভিষিক্ত কিংবা নিয়োজিত ব্যক্তি ও জনগণের ন্যায্য অধিকার দানে অবহেলা করা চলবে না। হকদারকে তার হক আদায় করে দিতেই হবে। তাদের ন্যায্য অধিকার আংশিকভাবে নয় পুরোপুরিই আদায় করে দেয়া তাদের উপর ফরজ করা হয়েছে। এমনিভাবে জনগণ ও রাষ্ট্রের যেসব হক

তাদের কাছে দেয়া হয়েছে, তা পরিশোধ করে দেয়া ফরজ। রাষ্ট্রের অনধিকার ও অন্যায়ভাবে কিছু দাবী করাও বৈধ নয়। কেউ কোনো অন্যায় দাবী তুলে রাষ্ট্রীয় শান্তি শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিপন্ন করে তুললে নিম্নলিখিত আয়াতের মর্মবাণী তাদের উপর প্রযোজ্য হবে। যেমন–

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِى الصَّدَقَاتِ - فَاِنْ اُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَاِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا اِذَاهُمْ يَسْخَطُوْنَ - وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَااٰتَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَرَسُوْلُهٗ اِنَّا اِلَى اللّٰهِ رَاغِبُوْنَ - اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَاتِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ - فَرِيْضَةً مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

"হে নবী! তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকও রয়েছে, সাদকা-খয়রাতের প্রশ্নে তারা তোমার ব্যাপারে অভিযোগের সুরে কথা বলে। অতঃপর যখন এ থেকে তাদের কিছু দেয়া হয় তারা খুশি হয় আর যদি না দেয়া হয় তাহলে– সাথে সাথে বিগড়ে বসে। আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূল তাদের যা প্রদান করেছিলেন, তারা যদি এটা আনন্দে গ্রহণ করতো এবং বলতো যে, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, এখন দেননি তো কি হয়েছে, ভবিষ্যতে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ প্রদান করবেন, আমরা তো আল্লাহর সাথেই যোগসূত্র স্থাপন করে আছি, (তাহলে এটাই তাদের উপযুক্ত উক্তি হতো।) দান-খয়রাত তো শুধু ফকীর-মিসকীনদের হক আর ঐ সকল ব্যক্তির হক, যারা (রাষ্ট্রের) কর্মচারী হিসাবে দান-সাদকার অর্থ উসুল করার জন্যে নিযুক্ত। তেমনি যাদের অন্তরকে (দীনের সাথে) সংযোগ করা কাম্য, এগুলো তাদেরও হক। দাসমুক্তির ক্ষেত্রে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঋণমুক্ত করণে, আল্লাহর পথে এবং দুস্থ প্রবাসী মুসাফিরের পাথেয় হিসাবে দান-সাদকার অর্থ ব্যয়িত হবে। সাদকা বিলি-বণ্টনে এসব হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত খাত। আল্লাহই সবজান্তা এবং অতি প্রজ্ঞাময়।" (সূরা তাওবা : ৫৮-৬০)

জনগণের উপর রাষ্ট্রের যেসব অধিকার রয়েছে, সেগুলো দানে বিরত থাকার

অধিকার তাদের নেই। এমনকি শাসক অত্যাচারী হলেও রাষ্ট্রের স্বার্থে যেসব বিষয় তাদের দেয়, তা দিতেই হবে। এ মর্মে মহানবী (সা) ঠিক তখনই নিম্নোক্ত ইরশাদ করেছিলেন, যখন রাষ্ট্রের বিভিন্ন আঞ্চলিক শাসকের বিরুদ্ধে জুলুম নিপীড়নের অভিযোগ উঠেছিল। যথা–

اَدُّوْا اِلَيْهِمُ الَّذِىْ لَهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرَعَاهُمْ -

"তোমাদের উপর তাদের যেই হক বা অধিকার রয়েছে, তা আদায় করে দাও, কারণ, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জনগণের অধিকারের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন।"

হযরত আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক মহানবী (সা)-এর একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে–

كَانَتْ بَنُو اِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الاَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِىٌّ خَلَفَهٗ نَبِىٌّ وَاِنَّهٗ لاَ نَبِىَّ بَعْدِىْ وَيَسكُوْنُوْا خُلَفَاءَ وَيُكْثِرُوْنَ قَالُوْا فَمَا تَاْمُرُنَا - قَالَ اَوْفُوْا بَيْعَةَ الاَوَّلِ فَالاَوَّلَ - ثُمَّ اعْطُوْهُمْ حَقُّهُمْ - فَاِنَّ اللّٰهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اَسْتَرَعَاهُمْ - (صحيح بخارى ومسلم)

"বনী ইসরাঈলকে নবীগণ শাসন করতেন। তাদের কোনো একজন পয়গম্বরের ইনতেকাল হলে তারা অপর এক পয়গম্বরকে তাঁর খলীফা তথা স্থলাভিষিক্ত করতেন। তবে আমার পর এভাবে আর কোনো নবী-রাসূল নেই এবং আসবেও না। তবে বহু খলীফা হবে। সাহাবীগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ সময়ের জন্যে আমাদের করণীয় সম্পর্কে আপনার কি নির্দেশ।' রাসূল (সা) বললেন, তোমরা পূর্ণ বিশ্বস্ততা সহকারে তাদের আনুগত্য করে যাবে। প্রথম যিনি নির্বাচিত হবেন, তার প্রতি তোমাদের আনুগত্যের দায়িত্ব কর্তব্য যথাযথ পালন করবে। তারপর যিনি তার প্রতি। অতঃপর তোমাদের উপর যেসব হক পালনীয় হয়ে আছে, তা দিয়ে দেবে। জনগণের যেসব অধিকার রয়েছে, আল্লাহ সে ব্যাপারে শাসকদের নিকট কৈফিয়ত তলব করবেন। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) কর্তৃক সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন–

اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِىْ اُثْرَةً تُنْكِرُوْنَهَا - قَالُوْا فَمَا تَاْمُرُنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ -

"আমার পরে তোমরা বহু ধন-ঐশ্বর্য দেখতে পাবে, আর এমন বিষয়ও দেখবে এবং এমন কথাও শুনবে, যেগুলো তোমরা পছন্দ করবে না। সাহাবা-এ কেরাম আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, এরূপ মুহূর্তে আমাদের করণীয় সম্পর্কে বলুন।" রাসূল (সা) ইরশাদ করেন–

قَالَ اَدُّوْا اِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَاسْئَلُوْا اللّٰهَ حَقَّكُمْ -

"তোমাদের কাছে (সরকারী-বেসরকারী) যাদের হক বা অধিকার থাকে, তোমরা তা পরিশোধ করে দেবে আর নিজেদের অধিকারের জন্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাবে।"

জনসাধারণের তহবিলের দায়িত্বে যারা নিয়োজিত থাকবে, (ক্ষমতার অপব্যবহার দ্বারা) অর্থ বন্টনে স্বেচ্ছাচারিতা চালাবার কোনো অধিকার তাদের নেই। রাষ্ট্রীয় অর্থ-সম্পদকে ব্যক্তিগত অর্থ-সম্পদ মনে করবে না। যেভাবে খুশি সেভাবে সরকারী অর্থ ব্যয় করবে না। কারণ সরকারী অর্থ তহবিলের দায়িত্বে যিনি নিয়োজিত থাকবেন, তিনি এর মালিক নন, বরং আমানতদার মাত্র; (ক্ষমতার অপব্যবহার দ্বারা তা নিয়ে স্বেচ্ছাচারিতা চলবে না)। মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন–

اِنِّیْ وَاللّٰهِ لاَ اُعْطِیْ اَحَدًا وَلاَ اَمْنَعُ اَحَدًا اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ - اَضَعُ حَيْثُ اُمِرْتُ - (بخاری)

"আল্লাহ্র কসম, না আমি কাউকে (অন্যায়ভাবে রাষ্ট্রীয় সম্পদ) প্রদান করি, না কারুর সম্পদ (অন্যায়ভাবে) গ্রহণ করি বা আটক রাখি। আমি যেভাবে আদিষ্ট ঠিক সেভাবেই জনগণের মাঝে সম্পদ বন্টন করে থাকি।" (বুখারী)

লক্ষ্য করার বিষয় যে, মহানবী (সা) রাব্বুল আলামীন বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের রাসূল (বার্তাবাহক)। তিনি বলছেন, কাউকে দেয়া না দেয়ার প্রশ্নে তাঁর ইচ্ছারও কোনো মূল্য নেই। বিলি-বন্টনে মালিকদের মতো নিজ ইচ্ছামাফিক সরকারী মাল সম্পদ ব্যয়ে তাঁর কোনো ইখতিয়ার নেই। দুনিয়াদার শাসক ও উচ্চ কর্মকর্তারা সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে স্বজনপ্রীতি অবলম্বন করে এবং তাদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যয় করে। অনেক হকদার লোককেও তারা শুধু এজন্যে বঞ্চিত করে যে, যেহেতু ঐ সকল লোক তাদের প্রিয়জনদের তালিকাভুক্ত নয়। রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর প্রিয় বান্দা। আল্লাহ যেখানে ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি সেখানেই তা ব্যয় করতেন।

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবও (রা) (রাষ্ট্রীয় সম্পদের ব্যাপারে) একই নীতির অনুসরণ করেছেন। একদা অনেক ব্যক্তি এসে তাঁকে বলল : আপনার আরও কিছুটা আর্থিক স্বচ্ছলতা প্রয়োজন। আপনি বায়তুল মাল থেকে আরও কিছু বেশি অর্থ গ্রহণ করলে ভাল হবে। হযরত উমর (রা) বললেন : আমার এবং জনগণের মধ্যকার সম্পর্ক তোমাদের জানা নেই। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে এরূপ যেমন, কিছু লোক সফর করছে। সকলে নিজ নিজ মাল-সামান ও অর্থ-সম্পদ তাদের একজনের কাছে গচ্ছিত রেখে বললো : আপনি আমাদের এই অর্থ ও মালামাল আমাদের প্রয়োজনে ব্যয় করবেন। এমতাবস্থায় আমানতদারের জন্যে সেই অর্থ-সম্পদ থেকে কিছুটা ব্যয় করা এবং যেমন খুশি তেমনি খরচ করা বৈধ্য হবে কি?

একবার হযরত উমর (রা)-এর নিকট "খুমুসের" (গণীমতের পঞ্চাংশ) অনেক মাল এসেছিল। ঐগুলো দেখে তিনি বললেন : জনগণ তাদের আমানত দিয়ে দিয়ে বেশ কাজ করেছে। উপস্থিত দু'একজন বললেন, আপনি আমানতের মালসমূহ আল্লাহ্‌র হুকুমে যথাযথ ব্যয় করে থাকেন। এজন্যে জনগণও আমানতসমূহ (যাকাত, ওশর, কর ইত্যাদি সকরারী পাওনা) নিয়মিতভাবে এনে আপনার হাতে জমা দিয়ে দেয়। আপনি যদি এতে হেরফের করতেন তারাও করতো।

"উলিল আমর" বা নেতা বলতে কি বুঝায়, জনগণের তা জানা উচিত। তাঁর অধিকার এবং মর্যাদা কি, সে সম্পর্কেও অবহিত থাকা আবশ্যক। নেতার তুলনা অনেকটা বাজারের মতো। বাজারে তোমরা যে পরিমাণ মূল্য দাও, সে পরিমাণ পণ্য পাও, তাই হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ) বলতেন : তুমি যদি সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ হও এবং বিশ্বস্ততার পরিচয় দাও, তাহলে এর বিনিময়ে তুমিও একই প্রতিদান পাবে। পক্ষান্তরে যদি মিথ্যাচার, অন্যায়, অবিচার ও বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দাও, তাহলে তুমিও প্রতিদানে একই আচরণ পাবে।

অতএব দেশের প্রধান শাসক ও তাঁর অধীনস্থ অন্যান্য কর্মকর্তার উপর ফরজ হলো, ন্যায়নীতির মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার অর্থ সংগ্রহ করা এবং সেগুলো যেখানে ব্যয় করা সঙ্গত ওখানে সেভাবে ব্যয় করা। হকদারকে বঞ্চিত না করা।

হযরত আলী (রা)-এর নিকট একবার অভিযোগ আসলো যে, তাঁর কোনো কোন 'নায়েব' (প্রতিনিধি) জনগণের উপর জুলুম করে। তিনি তখন আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে উঠলেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ لَمْ اٰمُرْهُمْ اِذْ يَظْلِمُوْا خَلْقَكَ وَلَا يَتْرُكُوْا حَقَّكَ ـ

"হে আল্লাহ! আমি তাদের জুলুম-অত্যাচার এবং আপনার হক ত্যাগ করার নির্দেশ দেইনি।"

[ছয়]

রাষ্ট্রীয় সম্পদ তিন প্রকার

এই পরিচ্ছেদের বিষয় বস্তুসমূহ : (১) গণীমতের মাল (তথা রণাঙ্গনে শত্রু পরিত্যক্ত সম্পদ), (২) সাদকা-খয়রাত, (৩) মাল-এ-ফাঈ। সকল পয়গম্বরের তুলনায় মহানবী (সা)-কে ৫টি অতিরিক্ত জিনিস দেয়া হয়েছে।

শ্রমজীবী দুর্বলদের কারণেই তোমরা যারা সবল তাদের খাদ্য জুটে এবং অন্যান্য সহায়তা মিলে। 'গানেম'দের (গনিমত লাভকারী) মধ্যেই মালে গণীমত বণ্টন করবে। বনী উমাইয়া, বনী আব্বাসও তাই করেছে।

কুরআন ও হাদীছে উল্লেখিত রাষ্ট্রীয় সম্পদ তিন প্রকার। (১) গণীমতের মাল, (২) সাদকা-যাকাত, (৩) মাল-এ-ফাঈ। কাফেরদের সাথে লড়াইয়ের পর যেই সম্পদ হস্তগত হয়, তাকে মালে গণীমত বলা হয়। কুরআন মজীদের সূরা আনফালে মালে গণীমতের কথা আল্লাহ্ তায়ালা উল্লেখ করেছেন। বদর যুদ্ধের সময় এ সূরা নাযিল হয়েছিল। 'আনফাল' শব্দটি 'নফল' শব্দের বহুবচন। নফল অর্থ অতিরিক্ত, সূরার নাম 'আনফাল' রাখার কারণ ছিল, মুসলমানদের সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। যেমন : আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন—

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ - قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ.

"হে নবী! মুসলমান সৈনিকরা তোমার নিকট গণীমতের মাল (বণ্টনের) নিয়ম-বিধি সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে। তুমি তাদের বলে দাও যে, মালে গণীমত তো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্য। (সূরা আনফাল : ১)

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ.

আর জেনে রেখো, যে সম্পদ তোমাদের হস্তগত হয়, তার এক পঞ্চমাংশ হচ্ছে আল্লাহ্‌র এবং তাঁর রাসূলের জন্য, রাসূলের নিকটাত্মীয় এবং ইয়াতীমদের জন্যে আর পরমুখাপেক্ষী ভিক্ষুক ও দুস্থ প্রবাসী মুসাফিরের জন্য।" (সূরা আনফাল : ৪১)

তিনি আরও ইরশাদ করেন–

فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللّٰهَ. اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

"গণীমতের যেসব মাল তোমাদের হস্তগত হয়, সেগুলো হালাল এবং পবিত্র জ্ঞানে ভক্ষণ করো আর আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। (সূরা আনফাল : ৬৯)

সহীহ বুখারী এবং মুসলিম শরীফে হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) কর্তৃক বর্ণিত আছে, মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন যে,

أُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطِهِمْ نَبِىٌّ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِىَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا فَاَيُّمَا رَجُلٌ مِنْ اُمَّتِىْ اَدْرَكَتْهُ الصَّلٰوةُ فَلْيُصَلِّ وَاُحِلَّتْ لِىَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لاَحَدٍ قَبْلِىْ اُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِىُّ يُبْعَثُ اِلٰى قَوْمِهٖ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ اِلَى النَّاسِ عَامَّةً.

"এমন পাঁচটি জিনিস আমাকে দেয়া হয়েছে, যা ইতিপূর্বে আর কোনো নবীকে দেয়া করা হয়নি। (১) এক মাসের দূরত্বে (অবস্থান রত শত্রুর মনে) আমার ব্যক্তিত্বের ভীতি সৃষ্টির (মাধ্যমে) আমাকে বিজয় প্রদান করা হয়েছে। (২) গোটা ভূপৃষ্ঠকে আমার জন্যে মসজিদ এবং এর মাটিকে পবিত্রতা দানকারী বানানো হয়েছে। সুতরাং আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তির জীবদ্দশায় নামাযের সময় উপস্থিত হবে, সে যেন নামায আদায় করে নেয়। (৩) আমার জন্যে মালে গণীমত তথা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিত্যক্ত সম্পদ হালাল করা হয়েছে। আমার পূর্বে কারোর জন্যে তা হালাল ছিল না। (৪) আমাকে সুপারিশের অধিকার দেয়া হয়েছে। (৫) আমার পূর্বে নবী রাসূলদেরকে নিজ নিজ কওমের জন্যে প্রেরণ করা হতো আর আমি প্রেরিত হয়েছি গোটা বিশ্বমানবের জন্যে।"

মহানবী (সা) আরও ইরশাদ করেছেন যে,

بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ حَتّٰى يَعْبُدُوا اللّٰهَ وَحْدَهٗ لاَشَرِيْكَ لَهٗ وَجُعِلَ رِزْقِىْ تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِىْ وَجُعِلَ الذُّلُّ

وَالصَّغَارُ عَلٰى مَنْ خَالَفَ اَمْرِيْ - وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

'কিয়ামতকে সামনে রেখে আমি তরবারিসহ প্রেরিত হয়েছি, যেন মানুষ এক আল্লাহর ইবাদত করে যার কোনো শরীক নেই। আমার রিযিক আমার বল্লমের ছায়াতলে রাখা হয়েছে। আমার বিরুদ্ধাচরণকারীর জন্যে রয়েছে অপমান ও লাঞ্ছনা। যে অপর জাতির (ধর্মীয়) সাদৃশ্য অবলম্বন করবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত রূপে গণ্য হবে। (মুসনাদে আহমদ)

অতএব, মালে গণীমতের বেলায় এক পঞ্চমাংশ হচ্ছে ফরয। তার থেকে এ অংশ আলাদা করে আল্লাহর নির্দেশ মাফিক তা খরচ করবে। অবশিষ্ট মাল গণীমত আহরণকারীদের মধ্যে বিতরণ করবে। হযরত উমর ফারুক (রা)-এর উক্তি হলো, "তারাই মালে গণীমতের অধিকারী যারা জিহাদে অংশ গ্রহণ করে। চাই যুদ্ধ করুক বা না করুক। মালে গণীমত বন্টনকালে কারোর পদমর্যাদা, কর্তৃত্ব-নেতৃত্বের পরোয়া করবে না। বংশ মর্যাদা বা আভিজাত্যের সামনেও ভীরুতা দেখাবে না। সম্পূর্ণ ন্যায় নীতি ও ইনসাফের সাথে এ মাল বন্টন করবে। মহানবী (সা) ও তাঁর খলীফাগণ কি করতেন? সহীহ বুখারী শরীফে আছে যে, হযরত সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রা) অন্যদের তুলনায় নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। যেমন, আল্লাহর রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন,

هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ اِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ.

"তোমাদের বিজয় এবং রিযিক প্রদান করা হয় তোমাদের দুর্বলদের অসিলায়।

মুসনাদে আহমদ হাদীস গ্রন্থে সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) সমীপে এ মর্মে আরয করলাম যে, হে আল্লাহর রাসূল! জনৈক ব্যক্তি আপন কওমের মর্যাদা ও নেতৃত্ব বজায় রাখার লড়াই করছে। তাঁর অংশও কি অন্যদের মতোই সমান হওয়া উচিত? হুযূর (সা) বললেন–

ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ ابْنَ اُمِّ سَعْدٍ وَهَلْ تُرْزَقُوْنَ وَتُنْصَرُوْنَ اِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ.

"হে ইবনে উম্মে সা'দ! তোমার মরে যাওয়াই শ্রেয়। তোমাদেরকে কি তোমাদের দুর্বলদের অসিলায় রিযিক ও বিজয় প্রদান করা হয় না?"

বনী উমাইয়া এবং বনী আব্বাসের শাসনামলে গণীমতের মাল আহরণকারীদের মধ্যেই বিলি-বন্টন করা হতো। তখন মুসলমানরা রোম, তুরস্ক এবং বারবারদের বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত থাকত। জিহাদে কেউ যদি দুঃসাহসিক কোনো কাজ করে, গুরুত্বপূর্ণ কোনো অভিযান চালায় যেমন দুর্গ দখল করা, যদ্দরুন যুদ্ধ জয়ের পথ উন্মুক্ত হয় কিংবা শত্রুবাহিনীর নেতার উপর হামলা চালিয়ে দুশমনকে পরাস্ত করে অথবা অনুরূপ অন্য কোনো কাজ করে, তাহলে এহেন ব্যক্তিকে 'নুফল' বা অতিরিক্ত দেয়া যাবে। কেননা খোদ রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর খলীফাগণ 'নুফল' দিতেন। যেমন, 'বেদায়া' যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) 'খুমুস' (এক পঞ্চমাংশ) ছাড়াও এক চতুর্থাংশ আরও দিয়েছিলেন। তেমনি গাযওয়া-এ-রাজফায় 'খুমুস' এর অতিরিক্ত এক তৃতীয়াংশ দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে উলামা-এ-কিরামের মতভেদ আছে, কারও মতে 'নুফল' ও অতিরিক্ত দান 'খুমুস' তহবিল হতে দেয়া হবে। কারও মতে 'খুমুস-এর এক পঞ্চমাংশ থেকে দেয়া হবে, যেন যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী কারও উপর কারোর প্রাধান্য প্রকাশ না পায়।

সঠিক কথা হলো এই যে, খুমুস-এর এক চতুর্থাংশ থেকে নুফল ও অতিরিক্ত মালে গণীমত প্রদান করবে, তাতে কারোর উপর কারোর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলেও হতে পারে। তবে এই 'নুফল' প্রদান কোনো দ্বীনী স্বার্থেই হতে হবে– ব্যক্তির খেয়াল-খুশি বা স্বার্থপরতার তাতে কোনো স্থান নেই। মহানবী (সা) একই লক্ষ্যে কয়েকবার 'নুফল' প্রদান করেছেন। সিরীয় ফকীহগণ এবং ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আহমদ প্রমুখের মত হচ্ছে এটিই। এ মতের ভিত্তিতেই বলা হয়েছে যে, এক চতুর্থাংশ এবং এক তৃতীয়াংশ শর্তহীনভাবেই দিয়ে দেবে। এর অধিক পরিমাণ দিতে হলে তাতে শর্ত আরোপ করতে হবে। যেমন, নেতা কিংবা সেনাবাহিনীর সিপাহ্সালার বলবেন, "যে ব্যক্তি অমুক কিল্লাটি ধ্বংস করবে" অথবা "শত্রু দলের অমুককে হত্যা করবে, তাকে এটা দেয়া হবে। কারও কারও অভিমত হলো, নুফল এক তৃতীয়াংশের অধিক না দেয়া। তবে হাঁ শর্ত আরোপ করে দেয়া যাবে। এ দুটি অভিমত হচ্ছে ইমাম আহমদ ও অন্যদের।

সঠিক বর্ণনা মতে, নেতার জন্যে এটা বলা জায়েয আছে যে, "যে ব্যক্তি যে জিনিস নিয়েছে সেটি তারই"। বদর যুদ্ধে মহানবী (সা) এরূপ বলেছিলেন। তবে এটা তখনই বলা যায়, যদি কল্যাণের মাত্রা অধিক হয় এবং অসন্তোষের মাত্রা কম হয়।

ইমাম বা নেতা কারও পক্ষে কোনো প্রকার জুলুম, প্রতারণা, বাড়াবাড়ি কিংবা মালের ক্ষতি করার অধিকার নেই। কেউ এরূপ করলে কিয়ামতের দিন এজন্যে তাকে আল্লাহর কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে। কারণ, এ ধরনের কাজও খিয়ানত। মাল-এ-গণীমতের মধ্যে লুটতরাজ করাও নাজায়েয। যার যার খেয়াল খুশি মত লুটপাট করে গণীমতের মাল নিয়ে যাওয়া থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলিমগণকে বিরত রেখেছেন।

গণীমতের মাল বণ্টন হবার পূর্বে যদি নেতা এই সাধারণ অনুমতি প্রদান করেন যে, "যে যেইটা হস্তগত করে নিয়েছো সেটা তারই" এটা তখনই জায়েয এবং হালাল হবে যদি তা 'খুমুস আদায় করার পর হয়ে থাকে। অনুমতির জন্যে বিশেষ কোনো শব্দ বা বাক্য নেই। যেভাবেই হোক নেতা বা ইমামের পক্ষ থেকে অনুমতি হলেই হবে। তবে যে ক্ষেত্রে সাধারণ অনুমতি দেয়া না হয়, তখন যদি কেউ কোনো জিনিস নেয়, ঐ অবস্থায় এতদূর ন্যায়নীতিবোধ নিয়ে কাজ করবে যে, অনুমতি পেলে তার ভাগে যে পরিমাণ মাল আসতো, ঠিক ঐ পরিমাণই সে গ্রহণ করতে পারে।

ইমাম যদি গণীমতের মাল সংগ্রহ করা বন্ধ করে দেন এবং অবস্থা কিছুটা এরূপই হয় যে, তিনি যেটা ইচ্ছা সিদ্ধান্ত নিবেন, তাহলে পরস্পর বিরোধী দুটি মত দেখা দিলে উভয়টিই বাদ দিবে এবং মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে। কারণ আল্লাহর দ্বীনের পথ হচ্ছে মধ্যপন্থা।

মাল বণ্টনকালে ন্যায়-নীতি হচ্ছে এই যে, এক অংশ পাবে 'পেয়াদা' অর্থাৎ পদাতিক আর তিন অংশ পাবে ঘোড় সওয়ার বাহিনী যারা আরবী ঘোড়া রাখে। এক অংশ তার আর দুই অংশ ঘোড়ার। খায়বর যুদ্ধে মহানবী (সা) এরূপই করেছিলেন।

কোনো কোনো ফকীহ-এর মতে সওয়ার (আরোহী) পাবে দুই অংশ। এক অংশ থাকবে তার আর এক অংশ তার ঘোড়ার। তবে প্রথমোক্ত মতটিই সঠিক। সহীহ হাদীসও এ ব্যাপারে পোষকতা করে। কারণ ঘোড়ার সাথে তার সহিস ইত্যাদিও থাকে। তাই ঘোড়া অধিক সাহায্যের মুখাপেক্ষী। "পেয়াদা'র তুলনায় সহিস বা সওয়ারের দ্বারাই অধিক কল্যাণ সাধিত হয়।

কোনো কোনো ফকীহর অভিমত হলো, আরবী ঘোড়া এবং 'হাজীন' ঘোড়াকে সমান অংশ দিতে হবে। কারও মতে আরবী ঘোড়াকে দুই অংশ এবং হাজীন ঘোড়াকে এক অংশ দেবে। রাসূলুল্লাহ (সা) এবং সাহাবা-এ-কিরাম থেকে এরূপ

বর্ণিত আছে, 'হাজীন' ঐ ঘোড়াকে বলা হয় যার মা হচ্ছে 'নাবতিয়া'– (১) তাকে 'বিরযাওন' এবং 'বাস্তরী'ও বলা হয়। ছিন্নমুষ্ক ও অছিন্নমুষ্ক উভয় ঘোড়ার একই হুকুম। যেই পুরুষ ঘোড়া মাদী ঘোড়ার উপর প্রজননে ব্যবহৃত হয়নি, অতীত যুগের লোকেরা তাকে অপেক্ষাকৃত অধিক গুরুত্ব দিত। কারণ এরূপ ঘোড়া অধিক শক্তিশালী এবং দ্রুতগতিসম্পন্ন হয়ে থাকে।

গণীমতের মালের মধ্যে যদি মুসলমানের মাল থাকে– চাই সেটা জমিন হোক কিংবা অস্থাবর সম্পত্তি– যা বণ্টনের পূর্বে অন্য মানুষও জানতো, তাহলে সে মাল তাকে ফেরত দিয়ে দেবে। এটা মুসলিম উম্মাহ্‌র সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত।

গণীমতের মাল এবং এর বণ্টন সম্পর্কিত অনেক বিধি বিধান রয়েছে। এ ব্যাপারে পূর্বসূরীদের পক্ষ থেকে রয়েছে অনেক বক্তব্য ও দৃষ্টান্ত। কোনটি সর্বসম্মত এবং কোনটিতে মত পার্থক্য রয়েছে, যেগুলোর আলোচনার অবকাশ এখানে কম। এখানে মোটামুটি মৌলিক ক'টি কথাই শুধু পেশ করা হয়েছে।

[সাত]

যাকাতের খাতসমূহ

যাকাত ৮ শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বণ্টন করবে

সাদকা এবং যাকাত ঐ সকল লোকের জন্যে, যাদের আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদে সূরা আত-তাওবার ৬০নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে যাকাত চাইলে তিনি ইরশাদ করেন :

اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَرْضَ فِى الصَّدَقَةِ تَقْسِيْمَ نَبِىٍّ وَلاَ غَيْرِهِ وَلٰكِنْ جَزَّاهُ ثَمَانِيَةَ اَجْزَاءٍ فَاِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الاَجْزَاءِ اَعْطَيْتُكَ.

"সাদকা এবং যাকাত বণ্টনে আল্লাহ তায়ালা কোনো নবী বা অপর কারো ইচ্ছাতে সম্মত না হয়ে নিজেই আট শ্রেণীর মানুষের মধ্যে তা বণ্টন করেছেন। তুমি ঐ আট শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হলে তোমাকেও দেবো।"

(১-২) اَلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنَ - ফকীর মিসকীন : তাদেরকে তাদের প্রয়োজন মতো দেবো। ধনী মালদারের জন্যে সাদকা ও যাকাত জায়েয নেই। সুস্থ সবল ব্যক্তি, যে কাজকর্ম করে খেতে পারে, তার জন্যেও সাদকা ও যাকাত জায়েয নেই। (এটি ইমাম ইবনে তাইমিয়ার নিজস্ব মত)

(৩) وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا - সাদকা যাকাত উসূলকারী : এগুলো সংগ্রহ ও সংরক্ষণকারী এবং এ সম্পর্কিত বিষয়ের লেখক প্রমুখ সকলে এর মধ্যে শামিল।

(৪) وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ : যাদের হৃদয়কে দ্বীনের স্বার্থে আকৃষ্ট করা প্রয়োজন তাদের জন্যে। ফাইলব্ধ সম্পদের আলোচনায় আমি এর উল্লেখ করেছি।

(৫) وَفِى الرِّقَابِ : গোলাম আযাদ, কয়েদী মুক্তির ক্ষেত্রে সাদকা যাকাতের অর্থ ব্যয় করা। এটিই বলিষ্ঠ রায়।

(৬) وَالْغَارِمِيْنَ : করযদার ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের "গারেমীন" বলা হয়, যারা ঋণ এনে তা সময় মতো আদায় করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। তাদেরকে এ পরিমাণ

দেবে, যদ্দারা তারা ঋণ পরিশোধে সক্ষম হয়। কোনো ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা জনিত কারণে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লে, যে পর্যন্ত না সে তওবা করে ঐ কাজ থেকে বিরত হবে, তাকে গনীমতের মাল দেবে না।

(৭) وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰه : আল্লাহর রাস্তায় নিবেদিত ব্যক্তি। এতে ঐ সকল লোক অন্তর্ভুক্ত যারা যোদ্ধা, যারা আল্লাহর মাল থেকে এ পরিমাণ পায়নি, যা তাদের প্রয়োজনে যথেষ্ট। আর যারা যুদ্ধে যেতে সক্ষম তাদেরকে এ পরিমাণ দেবে, যাতে তারা যুদ্ধে অংশ নিতে পারে কিংবা পুরোপুরি যুদ্ধ-সামগ্রীতে ব্যয় করতে এবং মজুরী আদায় করে দিতে পারে। হজ্জও ফী সাবীলিল্লাহ-এর অন্তর্ভুক্ত। রাসূল (সা)-এর উক্তিও এর প্রতি সমর্থন জানায়।

(৮) وَابْنِ السَّبِيْلِ : ইবনুস সাবীল। দুস্থ প্রবাসী যে সফরে রত।

গণীমতের মালের আলোচনা এবং
কর্মকর্তাদের অবৈধ কমিশন প্রসঙ্গ

“মাল-এ-ফাঈ” কাকে বলে? তার ব্যয়ের খাত কি কি? মহানবীর যুগে আনুষ্ঠানিক অর্থ দফতর বা অর্থ বিভাগ ছিল না। তেমনি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর যুগেও না। হযরত ওমরের যুগে যখন বিভিন্ন দেশ জয় হয় এবং মালে গণীমত হিসাবে অসংখ্য ধন-সম্পদ আসতে থাকে, তখন তিনি এজন্যে দিওয়ান (দফতর) খোলার নির্দেশ দেন। ঘুষ-রিশওয়াত সম্পূর্ণ হারাম। কর্মকর্তাদের কার্যসিদ্ধির মতলবে হাদিয়ার নামে যা দেয়া হবে, তাও রিশওয়াত বা ঘুষের অন্তর্ভুক্ত।

“ফাঈ” সম্পর্কে সূরা হাশরের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো হচ্ছে মূল। বদর যুদ্ধের পর অনুষ্ঠিত বনী নযীরের যুদ্ধের সময় এসব আয়াত নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ
وَّلَارِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيْرٌ. مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ
وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لا
كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ط وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ
فَخُذُوْهُ ق وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ
شَدِيْدُ الْعِقَابِ. لِلْفُقَرَاءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ
وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ
وَرَسُوْلَهٗ ط اُولٰئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ج وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ
وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَايَجِدُوْنَ فِىْ
صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ

خَصَاصَةٌ ط وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ. وَالَّذِيْنَ جَاءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ. (سورة الحشر : ٦-١٠)

"আল্লাহ তায়ালা তাদের নিকট হতে তাঁর রাসূলকে বিনা যুদ্ধে যা প্রদান করেছেন, তার জন্য তোমরা ঘোড়া বা উটে আরোহণ করে যুদ্ধ করোনি, কিন্তু আল্লাহ তাঁর রাসূলকে যাদের উপর ইচ্ছা তাদের ওপর কর্তৃত্ব দান করেছেন। আল্লাহ সব কিছুর উপর অত্যাধিক ক্ষমতাশালী। আল্লাহ তায়ালা ঐ সকল জনপদবাসী থেকে যেসব সম্পদ তাঁর রাসূলকে দিয়ে দিয়েছেন, তা আল্লাহর এবং রাসূলের, রাসূলের নিকটাত্মীয়দের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্ত ও রিক্তহস্ত দুস্থ প্রবাসীদের হক। [এই হুকুম এজন্যেই প্রদান করা হয়েছে,] যেন তোমাদের মধ্যকার সম্পদশালীদের মধ্যে অর্থ সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে ঘুরপাক না খায়। (হে ঈমানদারগণ!) রাসূল তোমাদেরকে যা প্রদান করেন, তা তোমরা নিয়ে নাও আর যা গ্রহণে নিষেধ করেন, তা থেকে তোমরা বিরত থাকো। আল্লাহকে ভয় করো। কারণ– আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর। [বিনা যুদ্ধে যেসব মাল হস্তগত হয়েছে, তাতে অন্যান্য হকদারের মধ্যে] মুহতাজ মুহাজিরদেরও হক রয়েছে, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায় কাফিরদের জুলুম নিপীড়নের কারণে (হিজরত করে), নিজ বাসগৃহ ও সম্পদ-সম্পত্তি থেকে বেদখল হয়েছে, তারা এখন আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলের সাহায্যে দৃঢ়প্রদে দণ্ডায়মান। এরাই সত্যিকারের মুসলমান, আর হাঁ, তারাও বিনাযুদ্ধে হস্তগত সম্পদের হকদার যারা ইতিপূর্বে মদীনায় বসবাস করতো এবং ইসলামে প্রবেশ করেছে। তাদের নিকট যারা হিজরত করে এসেছে, তাদেরকে তারা ভালবাসে। গণীমতের মাল থেকে মুহাজিরদেরকে যা কিছু প্রদান করা হয়, এজন্যে তারা মনে কোনো প্রকার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না। আপন অস্বচ্ছলতা সত্ত্বেও তারা মুহাজিরদেরকে (সুযোগ-সুবিধা প্রদানে) নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়। নিজ প্রকৃতিকে যারা কার্পণ্য থেকে রক্ষা করে, তারাই সফলকাম আর ঐ সকল মানুষেরও এতে অধিকার রয়েছে, যারা প্রথম পর্যায়ের মুহাজিরদের পরে হিজরত করে এসেছে এবং এই বলে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে যে–

"হে পরোয়াদেগার! আমাদিগকে এবং আমাদের ঐ সকল ভাইকে আপনি মাফ করে দিন, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছেন। যারা পূর্বে ঈমান এনেছেন,

আমাদের অন্তরে যাতে ঐ সকল ব্যক্তির ব্যাপারে হিংসাবিদ্বেষ আমরা পোষণ না করি, (আমাদেরকে সেই তওফীক দান করুন।) হে আমাদের প্রভু! আপনি অতি দয়ালু, মেহেরবান।" (সূরা হাশর : ৬-১০)

আল্লাহ তায়ালা এসব আয়াতে মুহাজির, আনসার এবং ঐ সকল লোকের কথাও উল্লেখ করেছেন, যারা পরে এসব গুণ-বৈশিষ্টের অধিকারী হবে। সুতরাং তৃতীয় প্রকারে এমন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই এতে শামিল, আর কিয়ামত পর্যন্তই এ হুকুম বিদ্যমান থাকবে।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰئِكَ مِنْكُمْ.

"যেসব লোক পরে ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে ও তোমাদের সাথে জিহাদেও শরীক হয়েছে, তারা তো তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা আনফাল : ৭৫)

আল্লাহর এই বক্তব্যেও তাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ.

"আর যারা নিষ্ঠা সহকারে তাদের অনুসরণ করে। (সূরা তাওবা : ১০০)

এই আয়াতটিতেও অনুরূপভাবেই তাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ হয়েছে–

وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

"আর ঐ সকল লোক যারা এখনও তাদের সাথে শামিল হয়নি (তবে শেষ পর্যন্ত তাদের সাথে এসে মিলিত হবে)। আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।" (সূরা জুমুআ : ৩)

فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ অর্থাৎ তোমরা জিহাদের জন্যে উট নিয়ে কোনো ছুটাছুটি ও তৎপরতা চালাওনি– জিহাদের উদ্দেশ্যে তোমাদের এসব পরিচালনা করতে হয়নি। ইসলামী আইনবিদগণ এ অর্থের প্রেক্ষিতেই বলেছেন যে, "কাফিরদের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়া যে সম্পদ হাতে আসে তাকেই 'মাল-এ-ফাঈ' বলা হয়। اَوْجَفْتُمْ শব্দটি ايجاف। হতে সংগঠিত। 'ইজাফ' অর্থ যুদ্ধ সংঘর্ষ। اَلْخَيْلُ وَالرِّكَابُ। অর্থ হলো, ঘোড়া এবং উটসমূহ অর্থাৎ এগুলো চালনা করে তোমাদের যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়নি।

এ জাতীয় মালকে "ফাঈ" এজন্যে বলা হয় যে, আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে কাফিরদের কাছ থেকে বিনা যুদ্ধে এ মাল এনে দিয়েছেন।

মূল কথা হলো, আল্লাহ্ তায়ালা মাল দৌলত এজন্যে দিয়েছেন, যেন এসব ইবাদতের ক্ষেত্রে মানুষের সহায়ক হয়। বলাবাহুল্য, মানব সৃষ্টির মূল লক্ষ্যই হলো, আল্লাহর ইবাদত বা পূর্ণ দাসত্ব-আনুগত্য করা। সুতরাং কাফিররা যেহেতু আল্লাহর ইবাদত করে না এবং নিজেদের মাল সম্পদও আল্লাহর ইবাদতে ব্যয় করে না, এজন্যে (সত্যের পথে বাধা দানকারীদের) এ সম্পদকে মুসলমানদের জন্যে হালাল ও জায়েয করা হয়েছে, যেন এ সম্পদের দ্বারা তাদের শক্তি সঞ্চয় হয় এবং তারা ইবাদত করতে পারে। কারণ মুসলমানরা একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী করে থাকে।

সুতরাং 'মাল-এ-ফাঈ' তাদেরকে দেয়া হয়েছে, যারা এর হকদার ছিল। এটা এরূপ যেমন কারোর মীরাস বা উত্তরাধিকার ছিনিয়ে নেয়া হলে তার হক তাকে ফিরিয়ে দেয়া হয়, যদিও সেটা ইতিপূর্বে অপরের করায়ত্তে থাকে। অথবা এটা সেরূপ যেমন ইহুদী ও নাসারাদের নিকট থেকে জিযিয়া নেয়া হয় কিংবা ঐ মালের মতো, যদ্দারা দুশমনের সাথে সন্ধি করা হয় অথবা এটা ঐ সম্পদের ন্যায় যা অমুসলিমদের পক্ষ থেকে উপঢৌকন হিসাবে রাষ্ট্রপ্রধান পেয়ে থাকে। এটাকে সেই সম্পদের সাথেও তুলনা করা যায়, কোনো খৃষ্টান জনপদ বা অপর জনপদের উপর দিয়ে যাবার সময় সওয়ারীর ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্যভাবে যা ব্যয়িত হয়। মোটকথা, মাল-এ-ফাঈ মুসলমানদের জন্য হালাল ও জায়েয করা হয়েছে যেন মুসলমান এই সম্পদের দ্বারা শক্তি অর্জন করতে পারে এবং আল্লাহর ইবাদতে সমর্থ হয়।

শত্রু পক্ষের সওদাগর এবং ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে যা কিছু নেয়া হয়, সেটা হচ্ছে তাদের মোট সম্পদের এক দশমাংশ তথা উশর। এ সকল বণিক-সওদাগর যদি যিম্মী হয় এবং নিজ জনপদ থেকে বের হয়ে অপরের জনপদে গিয়ে ব্যবসায় বাণিজ্য করে, তাহলে তাদের নিকট থেকে উশরের অর্ধেক তথা বিংশতম অংশ গ্রহণ করবে। দ্বিতীয় খলীফা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তাই করতেন।

সন্ধি ভঙ্গকারীদের পক্ষ হতে দণ্ডস্বরূপ যে অর্থ গ্রহণ করা হয়, সেই অর্থও এরি মধ্যে শামিল। খারাজের মালও এরি অন্তর্ভুক্ত হবে, যা কাফিরদের উপর আরোপিত ছিল। যদিও এর মধ্য থেকে কিছু অংশ কোনো মুসলমানের উপরও আরোপিত হবে।[১]

---

১. এর ধরন হচ্ছে এরূপ যেমন, প্রথম কাফিরের হাতে কোনো যমীন ছিল, এখন সেটা মুসলমানদের হাতে এসে গেছে। এর মূল যেহেতু খারাজী যমীন, মুসলমানের উপরও একই খারাজ আসবে যা মূল যমীনের উপর নির্ধারণ করা হয়েছিল।

অতঃপর "মাল-এ-ফাঈ"-এর সাথে সকল প্রকার মাল জমা করা হবে। যে পরিমাণ সরকারী মাল থাকে, তার সবই মুসলমানদের বায়তুল মালে জমা করা হবে। যেমন লা-ওয়ারিশ মাল। হয়তো কোনো মুসলমান মারা গেছে এবং তার কোনো ওয়ারিশ নেই অথবা ছিনতাইকৃত মাল কিংবা হাওলাতী বা আমানতী মাল যেগুলোর মালিকরা নিরুদ্দেশ। এ মাল জমিন হতে পারে কিংবা স্থাবর কোনো সম্পত্তি। এ ধরনের অন্যান্য মালসহ সবগুলোই মুসলমানদের সম্পদ এবং এগুলো রাষ্ট্রীয় অর্থভাণ্ডার বায়তুল মালেই জমা করা হবে।

কুরআন মজীদে শুধু "মাল-এ-ফাঈ"-এর কথাই উল্লেখিত– অন্য মালের কথা উল্লেখ নেই। কারণ মহানবী (সা)-এর যুগে যেসব লোক মারা গেছে, তাদের উত্তরাধিকারী ছিল। সাহাবা-এ-কিরামের বংশ পরিচয় জানা ছিল।[১] একবার কোনো এক গোত্রের জনৈক ব্যক্তি মারা গেলে মহানবী (সা) তার পরিত্যক্ত সম্পদ সংশ্লিষ্ট গোত্র প্রধানের হাওলা করেন। সে সরদার বংশ পরিচয়ের দিক থেকে তার দাদার নিকটাত্মীয় ছিল। ইমাম আহমদ প্রমুখ উলামা-এ-কিরামের এক অংশের এটিই অভিমত। ইমাম আহমদ (রহ) এর ব্যাখ্যা করেছেন। কোনো ব্যক্তি মারা গেলে যদি তার উত্তরাধিকারী না থাকে, তাহলে তার উত্তরাধিকার তার আযাদকৃত গোলামকে দিয়ে দিবে। ইমাম আহমদের শিষ্যদের একটি বড় জামায়াত এ মতেরই অনুসারী।

কোনো ব্যক্তি মারা গেলে যদি তার উত্তরাধিকারী না থাকে, তাহলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের মধ্যে বণ্টন করে দেবে। মহানবী (সা) এবং খুলাফা-এ-রাশেদীনের অনুসৃত নীতি এটিই ছিল যে, মৃত বক্তি এবং তার উত্তরাধিকার দাবিদারদের মধ্যে আত্মীয়তার সামান্যতম সম্পর্কের প্রমাণই যথেষ্ট।

মুসলমানদের নিকট থেকে নিয়মিতভাবে যে মাল সংগ্রহ করা হতো, তা ছিল যাকাত। যাকাত ব্যতীত তাদের নিকট থেকে আর কিছু গ্রহণ করা হতো না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলতেন, মুসলমানকে জানমাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে শরীক হতে হবে এবং আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে হবে।

মহানবী (সা) এবং হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগে অধিকৃত মাল যা বণ্টন করা হতো এজন্যে কোনো পূর্ণাঙ্গ দেওয়ান বা দফতর ছিল না। বরং ন্যায়সঙ্গত পন্থায়

---

১. এছাড়া ইসলামের প্রভাব বলয় শুধু আরবেই সীমাবদ্ধ ছিল আর আরবদের বংশ পরিচয় সকলের জানা ছিল। এজন্যে এক শ্রেণীর মালের কথাই উল্লেখিত হয়েছে। কুরআন মজীদে শুধু ফাঈ-এর কথা বলা হয়েছে।

মুসলমানদের মধ্যে তা বন্টন করে দেয়া হতো। হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর যুগে সম্পদ ও শাসন পরিধি উভয়েরই ব্যাপ্তি ঘটে। তখন যোদ্ধা, মুজাহিদীন এবং ভাতা প্রাপ্তদের জন্যে দেওয়ান এবং দফতর খোলা হয়। উমর (রা) খোদ্ এ দেওয়ান ও দফতর তৈরী করেন। তাতে মুজাহিদীন এবং নিয়মিত সেনাবাহিনীর নাম ঠিকানা লেখা থাকতো। এই দেওয়ান এবং দফতরই মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবময় বিষয়। বিভিন্ন শহর এবং জনপদ থেকে যে সকল খারাজ এবং 'ফাঈ' পাওয়া যেতো, তার দফতর আলাদা ছিল।

ফারুকী যুগে এবং তার পূর্বে সরকারী পর্যায়ে আগত সম্পদ তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। এক শ্রেণীর মালের উপর ইমাম ও আমীরের অধিকার ছিল। তিনিই এর অধিকারী বলে বিবেচিত হতেন। এর উপর আল্লাহর কিতাব, সুন্নাহ্ এবং মুসলিম উম্মাহ্র ইজমা (ঐক্যমত্য) রয়েছে। আর এক প্রকার মাল রয়েছে, যা গ্রহণ করা ইমাম এবং আমীরের জন্যে হারাম। যেমন, অপরাধে জড়িত থাকার কারণে যদি কাউকে হত্যা করা হয়, তাহলে তার সম্পদ অপর কোনো জনপদ থেকে বায়তুল মালের জন্যে উসূল করতে হবে, যদিও তার উত্তরাধিকারী থাকুক কিংবা সে কোনো 'হদ' বা শরয়ী দণ্ডপ্রাপ্ত হোক।

আর এক শ্রেণীর মাল আছে, যে ব্যাপারে ইজতিহাদ (বা প্রয়োগ বুদ্ধির) অবকাশ থাকে। এ ব্যাপারে উলামা-এ-কিরামের মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন, কোনো ব্যক্তি সম্পদ রেখে মারা গেছে। তার নিকটাত্মীয় রয়েছে। কিন্তু তার ذوالفروض যুল ফুরূয বা আসাবা অথবা তৎসম পর্যায়ের কোনো ওয়ারিশ নেই। তাতে কি পন্থা অনুসৃত হবে, এ ব্যাপারে উলামা-এ-কিরামের মত ও পথের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

অধিকাংশ জনগণ জুলুম-নিপীড়নে জর্জরিত হয়। শাসনকর্তা ও উচ্চ সরকারী কর্মকর্তারা হালাল হারামের কোনো পরোয়া করে না। জনগণ থেকে কর উসূল করে থাকে। আবার জনগণও কোনো সময় নিজের কর্তব্য পালন থেকে বিরত থাকে। বায়তুল মালে সম্পদ সঞ্চয়ের পথ বন্ধ করে দেয়। ফলে ফৌজ (সামরিক খাত) এবং কৃষি পেশায় নিয়োজিতদের উপর জুলুম হয়ে থাকে। অথবা জনগণ জিহাদ রূপ ফরয ছেড়ে দেয়। অপরদিকে রাষ্ট্রনায়করা বায়তুল মালে অর্থ জমা করেন। কিন্তু তাতে হালাল হারামের আদৌ লেহাজ করেন না। সরকারী অর্থ-সম্পদ অনাদায়ে জনগণকে শাস্তি দেন। মুবাহ এবং ওয়াজিব কাজ ছেড়ে দিয়ে এমন সব কাজে লিপ্ত হন, যা রাষ্ট্র পরিচালকদের জন্যে কিছুতেই হালাল বা জায়েয নয়।

মূল কথা হলো, কারোর নিকট যদি এমন মাল থাকে, যা রাষ্ট্রীয় তহবিলে জমা দেয়া তার উপর ফরয, কিন্তু ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সে তা আদায় করছে না, এমন ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে হবে। ঐ সকল মালের দৃষ্টান্ত হলো, যেমন, গচ্ছিত মাল, মুজারাবাত বা সমঅংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসায় বা কৃষিজাত মাল, ইয়াতীমের মাল কিংবা ওয়াকফকৃত মাল, বায়তুল মালের সম্পদ। ঋণ গ্রহীতা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ঋণ আদায় না করলে, তাকে শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে তার মাল বাজেয়াপ্ত করতে হবে। অথবা সে মালের জায়গার সন্ধান দেবে যে, অমুক জায়গায় আছে। অতঃপর যখন এটা নিঃসন্দেহ হওয়া যাবে, তার কাছে মাল আছে, তখন তাকে গ্রেফতার করবে। মালের সন্ধান না দেয়া পর্যন্ত তাকে আটক রাখবে। অবশ্য প্রহার করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু মালের সন্ধান দান কিংবা ঋণ পরিশোধের জন্যে তাকে প্রহার করবে, যেন হকদারের হক আদায় করে দেয় কিংবা আদায় করা সম্ভব হয়। 'নাফকা-এ-ওয়াজিবা' তথা 'অবশ্য দেয়' খোরপোশের ক্ষেত্রেও একই হুকুম, যদি বিবাদী খোরপোশ দিতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তা আদায় না করে। মহানবী (সা) থেকে উরওয়া ইবনে শারীদ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলেছেন–

اَلْوَاجِدُ يَحِلُّ عَرْضُهُ وَعَقُوْبَتُهُ.

"সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি পাওনা দেয় না, তার মাল জব্দ এবং তাকে শাস্তি দান বৈধ।"

সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিমে আছে– مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ.

"প্রাপ্য অনাদায়কারী বিত্তশালী জালেম।"

হকদারের হক আদায়ে গড়িমসি করাটাও হক না দেয়ার নামান্তর এবং জুলুম। আর জালেম ব্যক্তি অবশ্যই শাস্তিযোগ্য অপরাধী। এটা সর্বস্বীকৃত কথা যে, হারামে লিপ্ত এবং ওয়াজিব তরককারী শাস্তিযোগ্য। অতএব শরীয়তে যদি তার শাস্তি নির্ধারিত না থাকে, তাহলে 'উলুল আমর' বা নেতা এ ব্যাপারে ইজতিহাদের আশ্রয় নিবেন। হক অনাদায়কারী বিত্তবানকে শাস্তি দেবেন। যে অনাদায়ে জেদ ধরে তাকে দৈহিক শাস্তি দেবে, যেন তা আদায়ে বাধ্য হয়। এ ব্যাপারে ফকীহদের স্পষ্ট অভিমত রয়েছে। ইমাম মালিকের শিষ্যবর্গ এবং ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ এর পূর্ণ ব্যবস্থা প্রদান করেছেন। এতে কারোর দ্বিমত নেই। এটি সর্বস্বীকৃত বিষয়।

ইমাম বুখারী সহীহ বুখারীতে ইবনে উমরের একটি রিওয়ায়েত উল্লেখ করেন। তাতে ইবনে উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন খায়বরের ইহুদীদের সোনা, রূপা এবং অস্ত্র-শস্ত্রের বদলে তাদের সাথে সন্ধি করেন, তখন কোনো কোনো ইহুদী রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হুই ইবনে আখতাবের ধনভাণ্ডার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, তখন হুযূর (সা) ইরশাদ করেন– اَذْهَبَتْهُ النَّفَقَاتُ وَالْحُرُوْبُ ـ

"ঐ সকল সম্পদ খরচ হয়ে গেছে আর যুদ্ধে সব নিয়ে গেছে।"

ইহুদী নেতা সাঈদ (হুই ইবনে আখতাবের চাচা) রাসূল (সা)-কে বলল, আপনার সাথে তো এখন চুক্তি হলো আর চুক্তির ভিত্তিতে এ মালের পরিমাণ অনেক বেশী। রাসূলুল্লাহ (সা) সাঈদকে হযরত যুবায়েরের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি সাঈদকে শাস্তি দেন। বর্ণনাকারী বলেছেন, আমি হুই ইবনে আখতাবকে বিরান ভূমিতে ঘুরাফেরা করতে দেখেছি। তখন লোকজন সেখানে গিয়ে সবকিছু ভালভাবে দেখলো। তারা ঐ বিরান ভূমি থেকে অনেকগুলো মশক বের করে আনলো। উল্লেখ্য যে, ঐ ব্যক্তি ছিল যিম্মী আর কোনো অপরাধ ব্যতীত যিম্মীকে শাস্তি দেয়া যায় না। শাস্তির এ নির্দেশ হচ্ছে এমন সব ব্যক্তির জন্যে, যারা অত্যাবশ্যকীয় জিনিস গোপন করার অপরাধে অপরাধী। সুতরাং ওয়াজিব তরকের ভিত্তিতে সে শাস্তিযোগ্য।

অর্থ বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অন্যায়ভাবে মুসলিম জনগণের যেই অর্থ-সম্পদ উসূল করে, ন্যায়পরায়ণ নেতৃত্বের জন্য ফরয হলো, ঐ সকল অফিসার হতে অন্যায়ভাবে আদায়কৃত মালসমূহ বাজেয়াপ্ত করা। হাদিয়া, তোহ্ফা, সালামী, উপঢৌকনের নামে ঐ সকল কর্মকর্তা (অফিসার) নিজ নিজ শাসনামলে ক্ষমতার অপব্যবহার দ্বারা জনগণের ঐ অর্থ-সম্পদ কুক্ষিগত করেছিল। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন– هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُوْلٌ.

এ ক্ষেত্রে হাদিয়া, উপঢৌকন হচ্ছে, অন্যায়ভাবে জোরপূর্বক আদায় কৃত জনসম্পদ, যা এক শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তারা করে থাকেন।

ইবরাহীম হারাবী (রহ) তার كتاب الهدايا "কিতাবুল হিদায়া" গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে রিওয়ায়েত করেন–

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَدَايَةِ الْاُمَرَاءِ غُلُوْلٌ.

"রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন যে, শাসকদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হাদিয়া, তোহফা হচ্ছে আমানতে খেয়ানত এবং জোরপূর্বক জনসম্পদ আদায় করার নাম।"

সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিমে আবূ হামীদ সাঈদী (রহ) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) 'আযদ' গোত্রের ইবনুল্লা তবিয়া নামক এক ব্যক্তিকে যাকাত উসূলকারী কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন। সে এসে হযরতের সামনে যাকাতের মাল রেখে বললো, এ মাল হচ্ছে আপনার, আর ঐগুলো হচ্ছে আমার, যা হাদিয়াস্বরূপ মানুষ আমাকে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন–

مَا بَالُ الرَّجُلِ نَسْتَعْمِلُهُ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلاَّنَا اللّٰهُ فَيَقُوْلُ هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا اُهْدِىَ اِلَىَّ فَهَلاَّ جَلَسَ فِىْ بَيْتِ اَبِيْهِ اَوْبَيْتِ اُمِّهِ فَيَنْظُرَ اَيُهْدٰى اِلَيْهِ اَمْ لاَ - وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لاَيَاْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا اِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلٰى رَقْبَتِهٖ اِنْ كَانَ بَعِيْرًا لَهُ رُغَاءٌ اَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ اَوْ شَاةٌ تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى رَأَيْنَا عَفْرَ اِبْطَيْهِ - اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاَثًا. (بخارى ومسلم)

"এ ব্যক্তি কেমন লোক! তাকে আমরা কাজের দায়িত্ব দিয়েছি, যে কাজের দায়িত্ব আল্লাহ আমাদের উপর ন্যস্ত করেছেন। সে এখন বলছে, এটা আপনার মাল আর ওটা আমাকে 'হাদিয়া'স্বরূপ প্রদান করা হয়েছে। সে তার পিতা-মাতার বাড়ী গিয়ে বসে থেকে দেখুক না, তার কাছে হাদিয়া-উপঢৌকন পৌছে কিনা? সেই মহান সত্তার কসম, যার কুদরতী হাতে আমার জান, ঐ ব্যক্তি যে জিনিসই গ্রহণ করুক না কেন, কিয়ামতের দিন তা তার ঘাড়ে সওয়ার হবে। উট হলে সেটা চীৎকার দিতে থাকবে, মুখে ফেনা বের হবে আর গাভী হলে সেটা হাম্বা করবে এবং বকরী হলে করবে ভ্যাঁ, ভ্যাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের বাহুযুগল উপরে এতদূর উত্তোলন করেন যে, আমরা তাঁর বগলদ্বয় দেখতে পাই। তিনি তিনবার বললেন, হে আল্লাহ! আমি কি (আপনার বাণী) পৌছে দিয়েছি, আমি কি পৌছে দিয়েছি?" (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসটির উল্লেখিত মর্ম সমাজের বিভিন্ন স্তরের ঐ সকল "উলূল আমর" (আঞ্চলিক শাসক-প্রশাসনিক কর্মকর্তা)-এর বেলায়ও প্রযোজ্য, যারা ঘুষ, হাদিয়া-তোহফা ইত্যাদি নিয়ে কারোর কাজে সাহায্য করে। যেমন, (অফিসে) ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, চাকুরী ও বেতনের প্রশ্নে, মুজারাবাত, মুসাকাত,

মুযারায়াত ইত্যাদিতে এ ধরনের কাজে-কারবারে উপকার করা হলে, এখানেও একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। এ কারণেই হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) কোনো কোনো কর্মচারীর বেতন অর্ধেকে হ্রাস করে দিয়েছিলেন। তাদের মাল-সম্পদ থাকলেও তারা ঋণীও ছিল। আবার খেয়ানতকারী হিসাবেও তারা অভিযুক্ত ছিল না। তাঁর কর্মচারীদের সাথে এই আচরণ করার কারণ ছিল এই যে, তারা কর্মকর্তা হিসাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে হাদিয়া-তোহফা নিয়েছিল। হযরত উমর (রা) তাদেরকে গভর্ণর ও কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন। তাই তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ নেতা ও শাসক হিসাবে সম্পদের সঠিক বণ্টন নিশ্চিত করণার্থে (প্রশাসনে স্বচ্ছতা বিধান এবং আর্থ-সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখার স্বার্থে) এ ধরনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

শাসক ও জনগণের মধ্যে বিকৃতি দেখা দিলে প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হলো, আপন আপন কর্তব্যসমূহ যথাযথ পালনে সচেষ্ট হওয়া। হারাম বর্জন করা এবং আল্লাহ যে কাজ করার অনুমতি দিয়েছেন, তা হারাম মনে না করা।

সরকারী কর্মকর্তাদের উপঢৌকন না দিলে অনেক সময় জনগণকে বিপদের কঠিন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়। উপঢৌকন না দেয়া হলে ঐ সকল কর্মকর্তার জুলুম-নিপীড়ন থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। তারপরও তারা এভাবে মানুষের উপর জুলুম-অত্যাচার চালিয়েই নিজেদের দায়িত্ব পালন করে। জোর করে তাদের থেকে অধিক (কর) যাকাতের মাল আদায় করে। বৈষয়িক স্বার্থে নিজের আখিরাতকে সর্বনাশ করে। যে ব্যক্তি এভাবে অপরকে বৈষয়িক শান্তি ও আনন্দ দানের জন্যে এরূপ করে, সে তার আখিরাতকে বিনষ্ট করে। তার কর্তব্য ছিল যথাসম্ভব জুলুমের প্রতিরোধ করা। জনগণের সুযোগ সুবিধার প্রতি লক্ষ্য দেওয়া। মানুষের অভাব অভিযোগ দূর করা। রাষ্ট্রপ্রধানকে জনগণের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা। জনগণের কোনো অংশ অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইলে, তা থেকে সমাজকে রক্ষা করা।

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন–

اَبْلِغُوْنِىْ حَاجَةَ مَنْ لاَيَسْتَطِيْعُ اِبْلاَغَهَا فَاِنَّهُ مَنْ اَبْلَغَ ذَا السُّلْطَانِ حَاجَةَ مَنْ لاَيَسْتَطِيْعُ اِبْلاَغَهَا ثَبَّتَ اللّٰهُ قَدَمَيْهِ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ الاَقْدَامُ.

"যারা নিজেদের অভাব-অভিযোগের কথা আমার কাছে পৌঁছাতে পারে না, তোমরা তাদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে আমাকে অবহিত করবে। কারণ, যারা জনগণের অভাব-অভিযোগের প্রতি শাসন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, আল্লাহ তা'আলা পুলসিরাতে তাদের পদযুগলকে সুদৃঢ় রাখবেন– বড় বড় ব্যক্তির পাও সেদিন (পরিস্থিতির ভয়াবহতায়) কাঁপতে থাকবে।"

ইমাম আহমদ (রহ) এবং সুনানে আবূ দাউদের মধ্যে আবূ 'উমামা বাহেলী কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন–

مَنْ شَفَعَ لاَحَدٍ شَفَاعَةً فَاَهْدٰى لَهُ عَلَيْهَا هَدْيَةً فَيَقْبَلُهَا فَقَدْ اَتٰى بَابًا عَظِيْمًا مِنْ اَبْوَابِ الرِّبَا.

"কোনো ব্যক্তি যদি অপর কোনো ভাইয়ের জন্যে সুপারিশ করে আর তার বিনিময়ে সে কোনো উপঢৌকন পাঠায় এবং ব্যক্তিটি সেটা গ্রহণ করে, তাহলে সে সুদের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হলো।"

ইবরাহীম হারবী (রহ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে তার প্রয়োজন পূরণের অনুরোধ জানালো। সে তার প্রয়োজন মিটিয়ে দিলে অপরজন হাদিয়া পাঠালো আর সে তা কবুল করে নিল। তাহলে এটা হারাম হলো।

হযরত মাসরূক কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, তিনি ইবনে যিয়াদের সাথে কোনো একটি জুলুমের ব্যাপারে কথা বলেছিলেন। অতঃপর ইবনে যিয়াদ সেই জুলুম বন্ধ করেন। তাতে মাসরূক সন্তুষ্ট হয়ে একটি গোলাম হাদিয়াস্বরূপ তাঁর নিকট পাঠান। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, কোনো মুসলমানের উপর থেকে কোনো জুলুম বা অন্যায় দূরীভূত হলে, এর বিনিময়ে যদি সে কম হোক বা বেশি কোনো কিছু সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে প্রদান করে, তাহলে সেটা হারাম হবে। ইবনে যিয়াদ বলেন, আমি বললাম, হে আবদুর রহমান! আমরা তো এখন সুহ্ত (অবৈধ লেন-দেন) ছাড়া কিছুই বুঝি না। তিনি জবাব দিলেন, ঘুষ বা রিশওয়াত তো কুফরী।

অতএব কোনো শাসনকর্তা বা উচ্চ কর্মচারী যদি নিজের জন্যে কর্মচারীদের নিকট থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করে, যা ঐ ব্যক্তির নিজের ও পরিবারের জন্যে নির্দিষ্ট করা ছিল, এমতাবস্থায় দাতা গ্রহীতা উভয়ের কাউকেই সাহায্য করা উচিত নয়। উভয়ই জালেম। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, এক চোর কর্তৃক অপর চোরের মাল চুরি করার

মতো। অথবা এমন দু'টি দলের লড়াইর মতো, যারা নিজেদের বংশ গৌরব এবং নেতৃত্ব ও ক্ষমতার জন্যে লড়াই করছে। এমন সময় জুলুমের সহযোগিতাকরণ কিছুতেই জায়েয নহে। কারণ, সহযোগিতা দু'ধরনের হয়ে থাকে :

১. সৎ এবং তাকওয়া-পরহেযগারীর কাজে সাহায্য করা, যেমন জিহাদ করা, শরী'আতী দণ্ডবিধি সমাজে কায়েম করা। হকুকুল ইবাদ তথা মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা, হকদারকে হক প্রদানের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। এ ধরনের সহযোগিতা করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ পাক এবং তার রাসূল (সা) এ সহযোগিতাকে ফরয করে দিয়েছেন। কোনো প্রকার ভীতি সন্ত্রাসের কারণে কেউ সৎ ও নেকীর কাজ থেকে বিরত হলে এবং জালিমের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লে, তখন অন্য মুসলমানরা মজলুমের সাহায্যে এগিয়ে না আসলে এটা ফরযে আইন ও ফরযে কেফায়া ছেড়ে দেয়ার অপরাধ হবে। নিজ খোশ-খেয়ালে যদি কেউ এটা মনে করে যে, সে তাকওয়া পরহেযগারীর অধিকারী, এজন্যে ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকার দরকার, তাহলে এ পরিস্থিতিতে যদি সে মজলুমকে সাহায্য না করে, এতে সে ফরয তরকের অপরাধে অপরাধী বলে গণ্য হবে। ভীরুতা এবং পরহেযগারীর মধ্যে অনেক সময় বিভ্রান্তি ঘটে। ভীরুতা বশতঃ যেমন কেউ (ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায়) অপরের সাহায্য থেকে বিরত থাকে, তেমনি নির্লিপ্ত ভূমিকাকেও পরহেযগারী মনে করা হয়।

২. এ শ্রেণীর সহযোগিতা গুনাহ এবং আল্লাহর অবাধ্যতা। যেমন, মাসূম নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা কিংবা তার মাল লুট ও ছিনতাই করা। যে প্রহারের অপরাধ করেনি, তাকে প্রহার করা। এ ধরনের অপরাধমূলক কাজে সাহায্য সহযোগিতা করা আর গুনাহের কাজে সাহায্য সহযোগিতা একই কথা। এ জাতীয় সাহায্য সহযোগিতা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল হারাম করে দিয়েছেন।

অবশ্য অন্যায়ভাবে যদি কেনো জনসম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয় বা ছিনিয়ে আনা হয়, যা পরে নানা কারণে এর মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেয়া অসম্ভব হয়, তাহলে সে সম্পদ জনকল্যাণে ব্যয় করাটাও তাকওয়া এবং পুণ্য কর্মের শামিল। এ জাতীয় সরকারী সম্পদ মুসলমানদের কল্যাণে ব্যয় করা উচিত। যেমন জিহাদ, জিহাদের জন্যে বিভিন্ন মোর্চা তৈরির কাজ কিংবা মুজাহিদীন তথা সামরিক প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় ইত্যাদি তাকওয়া ও পুণ্য কর্মের অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রের ব্যয়ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতারই কাজ। কেননা, শাসক অন্যায়ভাবে যাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছে, তারা বা তাদের কোনো উত্তরাধিকারীর অনুপস্থিতিতে এ সম্পদ এখন

জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা শাসকের উপর ফরয। সাথে সাথে শাসককে আল্লাহর কাছে অনুতাপ অনুশোচনা করে তওবা করতে হবে। এটিই সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলামী আইনবিদদের অভিমত। ইমাম মালিক, ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আহমদ প্রমুখের একই মত। অনেক সাহাবা-এ-কিরাম থেকেও এটা বর্ণিত আছে। শারঈ দলীল প্রমাণাদিও এই অভিমতের সমর্থন করে।

(অবৈধভাবে আদায়কৃত) মাল অপর কেউ যদি নিয়ে নেয়, তাহলে শাসকের উপর ফরয হলো, তা (উদ্ধার করে) যার মাল তাকে বা তার উত্তরাধিকারীদেরকে ফেরত দেয়া কিংবা সেটা তাদের কল্যাণে ব্যয় করা। অথবা তাদের অনুপস্থিতিতে মুসলমানদের কল্যাণমূলক কোনো কাজে লাগানো। সম্পদ বিনষ্ট করার চাইতে মুসলমানদের কল্যাণে ব্যয় করা অতি শ্রেয়। কারণ, আল্লাহর একথার উপরই শরীআত নির্ভরশীল–

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَااسْتَطَعْتُمْ.

"যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করো।" (তাগাবুন : ১৬)

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ.

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর ব্যাপারে যতদূর সাবধান হওয়া আবশ্যক, সাবধান হও।"

এর ব্যাখ্যা নির্ভর করছে মহানবী (সা)-এর নিম্নোল্লেখিত হাদীসের উপর–

اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِاَمْرٍ فَاْتُوْا مِنْهُ مَااسْتَطَعْتُمْ.

"আমি যখন তোমাদের কোনো ব্যাপারে নির্দেশ দেই, তোমরা সেটা সম্পাদনে যথাসাধ্য চেষ্টা করো।"

সামাজিক কল্যাণ প্রচেষ্টার লক্ষ্যমাত্রায় উপনীত হওয়া এবং সমাজ থেকে পুরোপুরি অশান্তি দূরীভূত হওয়া কিংবা হ্রাস পাওয়া, সবকিছু নির্ভরশীল হচ্ছে যথাক্রমে উপরোল্লিখিত আয়াত এবং হাদীসের দাবী বাস্তবায়নের উপর।

সমাজে কল্যাণ এবং অকল্যাণের সংঘাত দেখা দিলে, কল্যাণকর দু'টি বিষয়ের মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত অধিক কল্যাণকর সেটিই গ্রহণ করবে। ক্ষতির মধ্যেও যেটি বেশি ক্ষতিকর, সেটিই পরিহার করবে।

যেই ব্যক্তি জালিমকে সাহায্য করে সে গুনাহ এবং আল্লাহর অবাধ্য কাজের সাহায্যকারী। 'পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মজলূমকে সাহায্য করে কিংবা কোনো জুলুম নির্যাতনের পরিমাণ হ্রাস করার ব্যাপারে সহায়তা করে অথবা জুলুম অত্যাচারের

প্রতিশোধ গ্রহণে সচেষ্ট থাকে, তাহলে সে মজলূমের উকিল ও প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করলো– জালিম বা অত্যাচারীর নয়। এটা সেই ব্যক্তিরই অনুরূপ যে ঋণ দিয়েছে কিংবা জালিমের জুলুম থেকে বাঁচানোর জন্যে কারোর সম্পদের প্রতিনিধি হয়েছে। যেমন ইয়াতীমের মাল, ওয়াকফ সম্পত্তির মাল। এসব মালে হয়তো অন্যায়ভাবে কোনো জালিম ভাগ বসাতে চায়, সে অবস্থায় এর মুতাওয়াল্লী অক্ষমতা হেতু কিছু না দিয়ে পারছে না, কিন্তু সে যথাসম্ভব কম দেয়ার চেষ্টা করেছে, এমতাবস্থায় মুতাওয়াল্লী পূর্ণ চেষ্টা চালিয়ে যদি কিছুটাও কম দিতে পারে, সেটা পুণ্যবানের কাজ হবে। (তবে ঐ জালিম সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে সরকারী প্রশাসনের আইনগত ব্যবস্থা ও জন-প্রতিরোধ আবশ্যক।)

এই নির্দেশের অধীন সেই উকিল বা প্রতিনিধিও অন্তর্ভুক্ত যে মাল আদায় করার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করে থাকে, তা লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করে। যে ব্যক্তি মাল বাজেয়াপ্তকরণে এবং তা দেয়ার কাজে অংশ নেয় তারও একই হুকুম।

কোনো জনপদ, গ্রাম, অথবা রাস্তাঘাট, বাজার কিংবা শহরে যদি কোনো অন্যায় বা জুলুম হতে থাকে আর কোনো পরোপকারী ব্যক্তি সেই জুলুম প্রতিরোধে মধ্যস্থতার উদ্যোগ নেয় এবং সম্ভাব্য সকল চেষ্টা করে, কোনো ঘুষ গ্রহণ ব্যতিরেকে ইনসাফ ন্যায়-নীতির সাথে হকদারকে হক দিতে চেষ্টা করে আর ভর্ৎসনাকারীদের ভর্ৎসনা উপেক্ষা করে নির্ভীকভাবে একাজ করে, তাহলে সেও পরোপকারী এবং পুণ্যকর্মশীল।

কিন্তু আজকাল যে কেউ এ জাতীয় মহৎ কাজে অন্যায় হস্তক্ষেপ করে, সে ঐ জালিমেরই প্রতিনিধি হয়ে সহায়তা করে। জালিমকে ভয় করে, বিচারপ্রার্থী থেকে ঘুষ গ্রহণ করে, এজন্যে গর্ববোধও করে, যার থেকে যা পায় অর্থ গ্রহণ করে। এরা জালিম– এদের স্থান জাহান্নাম ছাড়া আর কোথায় হতে পারে? তাদের সহযোগীরাও জাহান্নামী। তাদেরকে অবশ্যই জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

সরকারী আয়ের খাতসমূহ

গুরুত্বানুসারে অর্থের পর্যায়ক্রমিক বন্টন হওয়া উচিত। জিহাদে লিপ্ত এবং মুজাহিদীনের সহায়তাকারীরা সকলের চাইতে রাষ্ট্রীয় অর্থের (মাল-এ-ফাঈ) অধিক হকদার। 'মাল-এ-ফাঈ'-র ব্যাপারে উলামা মুজতাহিদদের মধ্যে ইখতিলাফ (মতবিরোধ) রয়েছে যে, মাল-এ-ফাঈ পুরোপুরি কি মুসলিম জনকল্যাণে ব্যয়িত হবে, না শুধু মুজাহিদীনের মধ্যেই এর বন্টন সীমিত থাকবে? মহানবী (সা) 'মুয়াল্লাফাতুল কুলূব"-কেও মাল-এ-ফাঈ থেকে প্রদান করতেন।

اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا.

"আমানত (অধিকারসমূহ) তার যথার্থ হকদারকে বুঝিয়ে দাও।" বলতে যা বুঝায়-

অর্থ-সম্পদের ব্যয় এবং এর বন্টন মুসলিম কল্যাণেই হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে গুরুত্ব পর্যায়ক্রমিক নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা ওয়াজিব। যেমন, সাধারণ মুসলমানদেরকে সাধারণ কল্যাণ পৌছানো। এদের মধ্যেই জিহাদকারী ও জিহাদে সহায়তাকারীরাও রয়েছে। মাল-এ-ফাঈ-এর মধ্যে সকলের চাইতে হকদার হচ্ছে ইসলামের মুজাহিদগণ। কারণ মুজাহিদীন ব্যতীত 'মাল-এ-ফাঈ' অর্জন সম্ভব নয়। এই মুজাহিদীনের দ্বারাই এ অর্থ পাওয়া যায়, আর এজন্যেই ফকীহ তথা ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞগণ এ মর্মে দ্বিমত ব্যক্ত করেছেন যে, মাল-এ-ফাঈ মুজাহিদীনের মধ্যেই খরচ করা হবে, না জনকল্যাণকর সকল প্রকার কাজে তা ব্যয়িত হবে? মাল-এ-ফাঈ ছাড়া যে পরিমাণ অর্থই হোক তাতে সকল মুসলমান এবং তাদের কল্যাণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ ব্যাপারে সকল ইমামেরই ঐকমত্য রয়েছে যে, সাদকা, যাকাত এবং গণীমতের মালের খাত নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এর হকদার হচ্ছে নিম্নোক্ত শ্রেণীর লোকজন- যেমন, কর্মচারী, মূল কর্তৃত্বের অধিকারী, ব্যক্তি প্রমুখ। শাসন কর্মকর্তা, বিচারক, উলামা আর ঐ সকল লোক যারা ঐ অর্থ সংগ্রহ করার দায়িত্ব পালন করে, এর রক্ষণাবেক্ষণ যাদের হাতে ন্যস্ত। এমনকি নামাযের ইমাম ও মসজিদের মুয়াজ্জিন প্রমুখও এদের মধ্যে শামিল। এমনিভাবে সেই বেতনও এর অন্তর্ভুক্ত যে কাজের উপকারিতা জনগণের কাছে পৌছে। যেমন সীমান্তে ঘাঁটি নির্মাণ, সমরোপকরণ খাতে ব্যয় করা, অত্যাবশ্যকীয় গৃহ নির্মাণ, জনগণের সুবিধার্থে রাস্তা ঘাট নির্মাণ ও উঁচু নীচু জায়গা সমতল করা। প্রয়োজনে ছোট-বড় পুল নির্মাণ করা, পানি নিষ্কাশন প্রণালী

পরিষ্কার রাখা, খাল কাটা, পুরানো খালের সংস্কার করা– এই প্রত্যেকিট জিনিসই হচ্ছে অর্থ ব্যয়ের খাত। অভাবী লোকজনও এর মধ্যে রয়েছে।

ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে এ ব্যাপারে মত পার্থক্য রয়েছে যে, যাকাত ছাড়া মাল-এ-ফাঈ ইত্যাদিতে অভাবী লোকদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে কিনা? ইমাম আহমদ প্রমুখের মাযহাবে দুটি বক্তব্য রয়েছে। কেউ কেউ তাদের অগ্রাধিকার দিয়েছেন আবার কেউ কেউ বলেছেন, এতে প্রত্যক্ষ দ্বীনী কাজের অগ্রাধিকার থাকবে। এ শ্রেণীর সকলকেই সমঅংশিদার ও সমপর্যায়ের হকদার বলে মনে করে। যেমন পরিত্যাজ্য সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারীদের সমঅংশিদার থাকে।

তবে সঠিক কথা হলো, অভাবীকে অগ্রাধিকার দেবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) অভাবীদেরকে অগ্রাধিকার দিতেন। যেমন, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন–

لَيْسَ اَحَدٌ اَحَقُّ بِهَذَا الْمَالِ مِنْ اَحَدٍ اِنَّمَا هُوَ الرَّجُلُ وَسَابِقَةٌ وَالرَّجُلُ وَعِنَايَتُهُ وَالرَّجُلُ وَبَلاَئَهُ وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ.

“এই মালে সকলের অংশ রয়েছে। এই মাল সে ব্যক্তি পাবে, যে জিহাদে প্রথমে অংশ গ্রহণ করেছে। আর ঐ ব্যক্তি এ মাল পাবে, যে এ কাজে কষ্ট সহ্য করেছে। তাতে ঐ ব্যক্তির হক রয়েছে, যে ব্যক্তি জটিল প্রতিকূলতার পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। আর তাতে হকদার রয়েছে অভাবী লোকেরা।”

হযরত উমর (রা) চার শ্রেণীর লোকের মধ্যে রাষ্ট্রীয় সম্পদ বণ্টন করতেন–

১. যাদের যুদ্ধাভিযানে যাওয়ার ফলে মাল হস্তগত হয়েছে।

২. যারা মুসলমানদের স্বার্থে বিশেষ প্রকারের কষ্ট পরিশ্রম করে। যেমন, শাসনকর্তাবৃন্দ এবং ঐ সকল শিক্ষিত-উলামা যারা মানুষকে দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ প্রাপ্তির খোদায়ী পথ দেখান এবং যারা সমাজের ক্ষতি ও অকল্যাণ প্রতিরোধে অবাঞ্ছিত বিপদ আপদ ও দুঃখকষ্ট সহ্য করেন। যেমন, আল্লাহর পথের মুজাহিদীন যারা ইসলামী সেনাবাহিনীরূপে কর্মরত রয়েছেন।

৩. সেসব বিশেষ ব্যক্তি যারা যুদ্ধবিশেষজ্ঞ এবং সৈনিকদের উপদেশ দেন, ইসলামী শিক্ষা সংস্কৃতি-আদর্শ প্রচারে ওয়ায-নছীহত দ্বারা সমাজকে সৎপ্রবণ রাখার কাজে নিয়োজিত।

৪. যারা অভাবগ্রস্ত।

যখন এই চার শ্রেণীর মানুষের পক্ষ থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে, তখন মনে করবে

আল্লাহ তায়ালা এই মালের দ্বারা জনগণকে স্বচ্ছল করে দিয়েছেন। অতঃপর প্রয়োজন অনুপাতে বা কাজ অনুসারে দেবে।

এতে বুঝা গেল যে, নাগরিকদের কল্যাণ এবং তার প্রয়োজনানুসারে রাষ্ট্রীয় অর্থ-সম্পদ দিতে হবে আর সেই অর্থ-সম্পদ হতে হবে মুসলমানদের কল্যাণার্থে। যাকাতের বেলায়ও একই অবস্থা। যদি এ থেকে অতিরিক্ত অর্থ-সম্পদ হয়, তাতেও সেই পরিমাণই অধিকার থাকবে এ জাতীয় মালে যে পরিমাণ হকদারের হক থাকে। যেমন, মালে গণীমত ও উত্তরাধিকারের অর্থ-সম্পদ। এগুলোর হকদার বা অধিকারীরাও নির্দিষ্ট রয়েছে।

মুসলমানের রাষ্ট্রীয় নেতার পক্ষে যেখানে ব্যক্তি স্বার্থ, পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনপ্রীতিবশতঃ কাউকে কিছু প্রদান আদৌ বৈধ নহে, সেক্ষেত্রে হারাম কাজে রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যয়ের অনুমতির তো প্রশ্নই উঠে না। যেমন হিজড়া, ঘাটুর ছোর্কা, গায়িকা, পতিতা, কৌতুকাভিনেতা, (ইসলামী মূল্যবোধ বিরোধী) অভিনেত্রী, গণক, জ্যোতির্বিদ প্রমুখকে অর্থ দান করা। তবে হাঁ ইসলামের স্বার্থে যার অন্তকরণ জয় করা প্রয়োজন, এমন ক্ষেত্রে অর্থ দান আবশ্যক।

কুরআন মজীদে 'মুয়াল্লাফাতুল কুলূব'-এর জন্য যাকাত দানকে 'মুবাহ' করা হয়েছে। মহানবী (সা) খোদ 'মুয়াল্লাফাতুল কুলূব' খাতে 'ফাঈ-এর অর্থ প্রদান করতেন এবং ঐ সকল ব্যক্তিকেও এ থেকে প্রদান করতেন, যারা গোত্রের বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। যেমন, বনী তামীমের সর্দার আকরা ইবনে হাবিস, বনী ফাযারার সর্দার উয়ায়না ইবনে হাসন এবং বনী নাবহানের সর্দার যায়েদুল খায়ের আত্তায়ী, বনী কিলাবের সর্দার আলকাশ ইবনে আল্লামা। এমনিভাবে তিনি কুরাইশ নেতা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও উক্ত তহবিল থেকে অর্থ-সম্পদ দান করেছেন। যেমন, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া, ইকরামা ইবনে আবু জেহ্ল, আবু সুফিয়ান ইবনে হরব, মুহাইল ইবন আমর, হারিস ইবন হিশাম প্রমুখ। এ মর্মে বর্ণিত বুখারী, সহীহ মুসলিমে আবু সাঈদ খুদরী (রা) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে, হযরত আলী (রা) ইয়ামান থেকে একবার মহানবী (সা)-এর নিকট একটি সোনার হার পাঠিয়েছিলেন। মহানবী (সা) সেই সোনার হারটি চার ব্যক্তির মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। তাঁরা হলেন : আকরা ইবনে হাবিস আলহানজালী, উয়াইনা ইবনে হাসন ফাযারী, আলকামা ইবনে আলামিতা আলআমেরী এবং বনী কিলাবের যায়েদুল খায়ের আততায়ী। তিনি বনী নাবহানের সরদার ছিলেন।

আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, মহানবী এই বণ্টন ব্যবস্থায় কুরাইশ এবং আনসারদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। তারা বলতে শুরু করলেন যে, মুহম্মদ (সা) নজদী নেতাদের মধ্যে অর্থ সম্পদ ব্যয় করলেন আর আমাদেরকে বাদ দিয়েছেন। মহানবী (সা)-এর কানে একথা আসলে তিনি তাঁদের ডেকে বললেন : "তালীফ-এ কুলূব" তথা ইসলামের প্রতি তাদের অন্তরের গভীর আকর্ষণ সৃষ্টির লক্ষ্যে আমি তা করেছি। ঠিক ঐ সময় সেখানে অতি ঘন দাড়িবিশিষ্ট এক আগন্তুকের আগমন ঘটে। তাঁর গণ্ডদ্বয় ছিল উন্নত এবং চোখ-যুগল অতি উজ্জ্বল এবং সে ছিল প্রশস্ত ললাটের অধিকারী আর তার মস্তক ছিল মুণ্ডিত। সে বললো।

اِتَّقِ اللّٰهَ يَا مُحَمَّدُ فَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ اِنْ عَصَيْتُهُ اَيَامَنُنِى اَهْلُ الْاَرْضِ وَلَاتَاْمَنُوْنِى.

"(হে মুহাম্মদ!) আল্লাহকে ভয় করো।" নবীজি বলেন, আমিই যদি আল্লাহর নাফরমানী করি, তাহলে কে তাঁর আনুগত্য করবে? ভূপৃষ্ঠের সকলে আমাকে যেখানে বিশ্বস্ত মনে করে, সে ক্ষেত্রে তোমরা কি আমাকে বিশ্বস্ত মনে করবে না?"

হাদীসের বর্ণনাকরী বলেছেন, উক্ত ব্যক্তি একথা বলেই চলে যাচ্ছিল। তখন সমবেতদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো ঃ তাকে হত্যা করো। সাহাবা-এ-কিরাম বলেছেন, দাঁড়িয়ে উক্তিকারী ব্যক্তি হচ্ছেন খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা)। ইসলামী আত্মমর্যাদা এবং মহানবী (সা)-এর প্রতি মহব্বতে তিনি দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। হযরত খালিদ লোকটিকে হত্যা করার জন্যে মহানবী (সা)-এর অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন–

اَنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هٰذَا قَوْمًا يَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ لَايُجَاوِرُ حَنَاجِرَهُمْ فَيُقَاتِلُوْنَ اَهْلَ الْاِسْلَامِ وَيَدْعُوْنَ اَهْلَ الْاَوْثَانِ - يَمْرُوْنَ مِنَ الْاِسْلَامِ كَمَا يَمُرُّ السَّهْمُ مِنْ رَمْيِهِ لَئِنْ اَدْرَكْتُهُمْ لَاَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ.

"তাদের বংশধরদের মধ্য থেকে এমন একদল হবে, যারা কুরআন পড়বে কিন্তু তাদের খঞ্জর নামবে না। তারা মুসলমানদের সাথে লড়াই করবে এবং পৌত্তলিকদেরকে আমন্ত্রণ জানাবে। ইসলাম থেকে তারা এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন ধনুক থেকে তীর দ্রুত বের হয়ে যায়। আমার জীবদ্দশায় যদি আমি

(ইসলামের বিরুদ্ধাচরণে) তাদের পাই, তাহলে আ'দ সম্প্রদায়কে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, আমি তাদের অনুরূপভাবে কতল করবো।"

রাফি ইবনে খাদীজ (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ সুফিয়ান ইবনে হরব (রা) এবং সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া, উয়াইনা ইবনে হাসন, আকরা ইবনে হাবিসকে শত শত উট প্রদান করেছিলেন। আব্বাস ইবনে মারদাসকে কিছু কম দিয়েছিলেন। তখন আব্বাস ইবনে মারদাস নিম্নোক্ত কবিতাটি পড়েছিল।

اَتَجْعَلُ نَهْبِىْ وَنَهْبَ الْعُبَيْدِ بَيْنَ عُيَيْنَةَ وَالْاَقْرَعِ -

"আপনি কি আমার এবং আমার ঘোড়া– 'উবায়েদের সংগৃহীত (সম্পদ) উয়াইনা ও আকরাকে দিয়ে দিচ্ছেন?"

وَمَا كَانَ حَصْنٌ وَلاَ حَابِسٌ - يَفُوْقَانِ مَرْدَاسَ فِى الْمَجْمَعِ -

"হাসান এবং হাবিস সভা-বৈঠকে মারদাস থেকে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে না।"

وَمَا كُنْتُ دُوْنَ اَمْرَءٍ مِنْهُمَا - وَمَنْ يَخْفِضُ الْيَوْمَ لاَ يُرْفَعِ -

"এ দু'জন থেকে আমি কি কোনো অংশে কম? যে পাল্লাটি উঠানো যেতো না অর্থাৎ ভারি ছিল, তাঁকে ঝুকিয়ে দিল?"

একথা শুনে রাসূলুল্লাহ তাকেও একশ' উট দিয়ে দিলেন। মুসলিম শরীফে এ রিওয়ায়েতটি রয়েছে এবং উবায়েদ ছিল মারদাসের ঘোড়ার নাম।

"মুয়াল্লাফাতুল কুলূব" দু'প্রকার– কাফির ও মুসলমান। কাফিরদের হৃদয় জয়ের ব্যাপারটি হবে এমন, তাদের থেকে কল্যাণের প্রত্যাশা রাখবে যে, হয়তো তারা ইসলাম গ্রহণ করবে অথবা তাদের দ্বারা ইসলামের যে ক্ষতি সাধিত হচ্ছিল, সেটা হ্রাস পাবে। আর কিছু প্রদান ছাড়া সে ক্ষতি দূরীভূতও হবার নয়।

"মুসলিম মুয়াল্লাফাতুল কুলূব" হচ্ছে সে সব নওমুসলিম ব্যক্তি, যাদের অর্থ সাহায্য দানের সাথে ইসলামের কল্যাণ নিহিত থাকে। যেমন, তাদেরকে অর্থ সম্পদ দান করা হলে (আর্থিক পেরেশানী মুক্ত হয়ে) তাদের ঈমান সুদৃঢ় হবে এবং তারা খাঁটি মুসলমানে পরিণত হবে। অথবা এ ধরনের মুলসমান ইসলামে দৃঢ় ভিত্তির উপর অটল হলে ইসলাম বিরোধী শক্তির মুকাবিলায় সুবিধা হবে। দুশমনদের ভীত সন্ত্রস্ত রাখতে পারবে। কিংবা তার দুস্তি মুসলমানদের রক্ষায় অনুকূল ভূমিকা পালন করতে সহায়ক হবে। বলাবাহুল্য, দুর্বল ঈমানের মুসলমানদের দ্বারা এরূপ করতে হলে অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হয় বৈ কি।

এ শ্রেণীর অর্থ-সম্পদ সাধারণতঃ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও বিত্তশালীদেরকেই দেয়া হতো এবং দুর্বল অক্ষমদেরকে এ থেকে প্রায় দেয়াই হতো না। যেমন সাধারণতঃ রাজা বাদশারা করে থাকেন। কিন্তু এর মধ্যে নিয়তের পার্থক্য থাকে বিরাট। কাজের ফলাফল নির্ভর করে নিয়তের উপর। অর্থ-সম্পদ দানে যদি দ্বীনী কল্যাণ ও মুসলমানদের সেবা উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে এ দান মহানবী (সা) এবং সাহাবা-এ-কিরামের দানেরই মত আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় হবে। (তাঁরাতো নিজের জন্যে কিছুই করেননি।) অর্থ-সম্পদ দান করার সময় অহঙ্কার প্রদর্শন এবং অশান্তি সৃষ্টির কোনো দুরভিসন্ধি থাকলে, সেটা ফেরাউন কর্তৃক তার ধামাধরা লোকদের মধ্যে প্রদত্ত দানের অনুরূপই হয়ে যায়।

যারা দ্বীনের মধ্যে বিপর্যয় ও অশান্তি সৃষ্টি করতে চায় এবং সকল সময় ইসলামের বিরুদ্ধে দুরভিসন্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়, এরূপ দানকে তারা খারাপ দৃষ্টিতে দেখে। যেমন যুলখুওয়াইসরা, সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এসব দানকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখতো। তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যা বলার দরকার তা তিনি বলে দিয়েছেন। তার প্রতি তাঁর অসন্তুষ্টির বান নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

যুলখুওয়াইসরা-র গোত্র খারিজীরা আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। হযরত আলী (রা) আমীরে মুয়াবিয়া (রা)-এর সাথে বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে অনুষ্ঠিত মীমাংসা বৈঠকের পর যেই আপোষ করার নীতি অনুসরণ করেছিলেন, খারিজীরা তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে। খারিজীরা মুসলমানদের নারী শিশুদেরকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল। তারাই সেসব ব্যক্তি, যাদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) লড়াই করার জন্য নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। কারণ, তারাই ছিল বাতিল ও অশান্তি সৃষ্টিকারী নীতি-রীতির অনুসারী, যাতে তাদের না দুনিয়া ঠিক ছিল, না আখিরাত।

অনেক সময় বিভ্রান্ত পরহেযগারী, ভীরুতা, কাপুরুষতা ও কৃপণতার মধ্যে সাদৃশ্যজনিত সন্দেহের সৃষ্টি হয়ে থাকে। কারণ, উভয়ের মধ্যেই আমল ত্যাগজনিত ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। খোদাভীতির কারণে অশান্তি এড়িয়ে চলা এবং ভীরুতা ও কৃপণতার কারণে আদিষ্ট জিহাদে অর্থ ব্যয় না করার মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন–

شَرُّ مَا فِى الْمَرْءِ شُحٌّ هَالِعٌ -

"মানুষের মধ্যে সর্বাধিক মন্দ বিষয় হচ্ছে কৃপণতা, লোভ।" وَجُبْنٌ خَالِعٌ এবং ভীরুতা ও কাপুরুষতা। (ইমাম তিরমিযী এ হাদীসকে বিশুদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন।)

এমনিভাবে সময় সময় মানুষ আমল ছেড়ে দেয় আর মনে মনে ধারণা পোষণ করে, এমনকি প্রকাশও করে থাকে যে, এটাই তাকওয়া-পরহেযগারী। কিন্তু মূলত এটাই হল অহংকার এবং নিজেকে বড় মনে করার নামান্তর। এ সম্পর্কে মহানবী (সা) এমন এক পরিপূর্ণ ও ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য উচ্চারণ করেছেন, যাকে আমলের ফলপ্রসূ কিংবা নিষ্ফল হবার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি বলা যেতে পারে। যেমন মহানবী (সা) বলেছেন– اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

"নিয়্যাতানুযায়ী কাজের ফলাফল নির্ধারিত হয়ে থাকে।"

দেহের জন্যে আত্মা যেমন অপরিহার্য, আমলের জন্যে তেমনি নিয়্যাত অত্যাবশ্যক। অন্যাথায় কোন ব্যক্তির আল্লাহর সামনে সিজদা করা আর কারোর সূর্যের কাছে মস্তক অবনত করার তফাৎটি কোথায়? উভয়ই মাটিতে কপাল ঠুকে থাকে। উভয়ের উপাস্যের ভঙ্গি একই প্রকার। দু'জনের আকৃতি প্রকৃতিও অভিন্ন। আল্লাহর সামনে মস্তক অবনতকারী ব্যক্তিতো আল্লাহর প্রিয় ও নৈকট্য লাভকারী বান্দা, পক্ষান্তরে চন্দ্র-সূর্যের পূজারী আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন ও দূরে নিক্ষিপ্ত এক লাঞ্ছিত অপরাধী। একমাত্র নিয়্যাতের কারণেই এ ব্যবধান ও পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে থাকে। স্রষ্টার নৈকট্য প্রাপ্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন–

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ.

"তারা পরস্পর একে অপরকে দ্বীনের উপর অটল থাকার এবং পরস্পরকে সহানুভূতিশীল হবার উপদেশ দেয়।" (সূরা বালাদ : ১৭)

اَفْضَلُ الْاِيْمَانِ السَّمَاحَةُ وَالصَّبْرُ -

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "ঔদার্য ও সহনশীলতা হচ্ছে উত্তম ঈমানের পরিচায়ক।"

বস্তুতঃ জনগণের শান্তি নিরাপত্তা বিধান, তাদের লালন ও শাসন কার্যের জন্যে যুগপৎভাবে তাদের প্রতি আর্থিক ঔদার্য, সহানভূতি সম্পন্ন মনোভাব, সাহসিকতা ছাড়া কিছুতেই সম্ভব নয়। বরং বলতে হয়, দ্বীন ও দুনিয়ার সংশোধন ও কল্যাণ সাধনের জন্যে ঐ দু'টি গুণ অপরিহার্য। সুতরাং উক্ত গুণ দুটির অধিকারী নয় এমন ব্যক্তির কাছ থেকে শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে অনুরূপ গুণের অধিকারী ব্যক্তির হাতে তা ন্যস্ত করা আবশ্যক। যেমন কুরআন মজীদে ইরশাদ হচ্ছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلاَّ قَلِيْلٌ اِلاَّ تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلاَتَضُرُّوْهُ شَيْئًا وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ. (سورة توبة : ٣٩-٣٨)

"হে মুমিনগণ! তোমাদের কি হলো! যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে অভিযানে বের হবার আহ্বান জানানো হয়, তখন তোমরা মাটির সাথে খুঁটি ধরে বসে থাকো। তোমরা কি আখিরাতের বদলে পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তোষ থাকতে চাও? যদি তাই হয় তবে স্মরণ রেখো, আখিরাতের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগ বিলাস অতি সামান্য। তোমাদের আহ্বান করার পরও যদি তোমরা আল্লাহ্র পথে রওনা না হও, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভীষণ কষ্টদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন। আর তোমাদের স্থলে অপর সম্প্রদায়কে এ কাজের দায়িত্ব দেবেন এবং তোমরা তাদের সামান্যতম ক্ষতিও করতে পারবে না। কেননা আল্লাহ সর্বশক্তিমান। (সূরা তাওবা : ৩৮-৩৯)

মহান আল্লাহ আরো বলেন–

هَاَنْتُمْ هٰؤُلاَءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَّبْخَلُ وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهِ وَاللّٰهُ الْغَنِىُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَيَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ. (سورة محمد : ٣٨)

"লক্ষ্য করো, তোমাদেরকে আহ্বান জানানো হচ্ছে, আল্লাহর পথে ধন সম্পদ ব্যয় করো, আর এ ব্যাপারে তোমাদের কিছু লোক কার্পণ্য করে। তারা আসলে নিজের সাথেই নিজে কার্পণ্য করে। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী স্বয়ংসম্পূর্ণ এক সত্তা। তোমরাই বরং তাঁর মুখাপেক্ষী। তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তা হলে তিনি তোমাদের স্থলে অপর কাউকে একাজে নিয়ে আসবেন আর তারা নিশ্চয়ই তোমাদের মত হবে না।" (সূরা মুহাম্মদ : ৩৮)

একই মর্মে অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে–

لاَيَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ اُولٰئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَ قَاتَلُوْا وَكُلاًّ وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى. (حديد : ١٠)

"তোমাদের মধ্য হতে বিজয়ের পূর্বে যারা আল্লাহর পথে (জানমাল) ব্যয় করেছে এবং জিহাদ করেছে, উচ্চ মর্যাদায় তারা অন্যের সমতুল্য হতে পারে না। যারা বিজয়োত্তর যুগে জান-মাল ব্যয় করেছে এবং জিহাদ করেছে, তাদের চাইতে তারা উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। যদিও আল্লাহ্ তায়ালা উভয়ের সাথেই সদ্ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন।[১] (সূরা হাদীদ : ১০)

সুতরাং উচ্চ মর্যাদা প্রাপ্তির জন্যে দ্বীনের পথে জান-মাল উৎসর্গ করা, সাহসিকতার সাথে জিহাদ, সংগ্রাম ও আন্দোলন করাকে আল্লাহ্ পাক পূর্বশর্ত নির্ধারিত করেছেন।

---

১. মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় এবং জিহাদ করার মর্যাদা ও সওয়াব পরবর্তী যুগের লোকদের তুলনায় অধিক পাওয়ার কারণ হলো, ইসলাম তখন কেবল মদীনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল আর মদীনা তখন মুনাফিক এবং ইসলামের শত্রুদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। হিজরতের পূর্বে মহানবীর (সা) বিরুদ্ধে মক্কার কাফিরদের দুশমনী ও ষড়যন্ত্র কারো অজ্ঞাত নয়। বাধ্য হয়ে সাফল্যের আশায় তিনি তায়েফ গমন করেন। কিন্তু তাদের দুর্ব্যবহারে সেখান থেকে তাঁকে নিরাশ হয়েই ফিরে আসতে হয়। অধিকন্তু সাহাবীগণসহ নবী করীম (সা)কে 'শাবে আবু তালিবে' সুদীর্ঘ তিন বছরব্যাপী একটানা সমাজবর্জিত অবস্থায় ব্যয় করতে হয়। বাধ্য হয়ে কতিপয় সাহাবীকে আবিসিনিয়ায় হিজরতের অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু সেখানেও কাফিরদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করা হয়। মক্কার "দারুন্নাদওয়া" মিলনায়তনে কুরাইশী কাফির নেতার এক সভা হয়। তারা দীর্ঘ আলোচনার পর অবশেষে মহানবী (সা)কে হত্যা করার জন্য সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তখন অগত্যা তিনি হিজরত করতে বাধ্য হন। কিন্তু তাঁকে গ্রেফতার করার জন্য বিরাট পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। অপরদিকে তৎকালীন পরিস্থিতিতে মহানবী (সা) সাহাবীগণসহ প্রকাশ্য ইবাদত পর্যন্ত করতে সক্ষম ছিলেন না। এমনকি ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্য বাইরে গেলে সেখানেও তাঁর রেহাই ছিল না, কাফিররা পশ্চাতে লোক পাঠিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় তৎপর হয়ে উঠতো। অবশেষে হিজরত করে মদীনা গমন করলে স্থানীয় ইহুদী-খৃষ্টান ও মুনাফিকরা তাঁর বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগে যায়। দিবা রাত্রি তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে থাকে আর রীতিমত মক্কার কাফিরদের নিকট গোপন তথ্য ও সংবাদ আদান প্রদান করতে থাকে। এক পর্যায়ে কাফিরগণ মক্কার দারুন্নাদওয়ায় মিলিত হয়ে চক্রান্তমূলক বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ফলে বদর ও উহুদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

মোটকথা, ইসলাম এক নির্দিষ্ট স্থানে গণ্ডীভূত ছিল আর সর্বদিক থেকে মুসলমানগণ ছিলেন তখন অসহায় নিঃসম্বল। তাদের আর্থিক অবস্থা ছিল এই যে, দু'বেলা আহারের সংস্থান করা অতি কঠিন ছিল। পক্ষান্তরে কাফিররা অর্থনৈতিক সামাজিক সব দিক থেকেই ছিল স্বচ্ছল ও বিত্তশালী। গোটা আরব ভূখণ্ডে তখন তাদেরই একচ্ছত্র আধিপত্য ও প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। কাজেই, এসব অসহায় মুসলমানকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে তাদের বাধা দেয় কে? তাদের ধারণা, মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুসলমানকে শেষ করতে পারলেই ইসলাম নামক আপদ নির্মূল হয়ে যাবে। কারণ নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে ইসলাম তখনো বিস্তার লাভ করেনি। এখানকার মুসলমানদের উৎখাত

কুরআনের বিভিন্ন স্থানে মানবতার কল্যাণে অসৎ অযোগ্য শোষক নেতৃত্বের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে এনে (শোষিত বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষদের ন্যায় বিচারের সুফল দানের জন্যে) সৎ নেতৃত্বের হাতে তা তুলে দেয়ার সংগ্রামের কথাই উপরে উল্লেখিত হয়েছে। যারা এজন্যে অকাতরে প্রাণ-সম্পদ ব্যয় করেছে তাদের প্রসঙ্গে ইরশাদ হচ্ছে– وَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ.

"তারা (অর্থাৎ সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামী মুমিনরা) নিজেদের জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে।" (সূরা তাওবা : ২০)

অপরদিকে কৃপণতা ও ভীরুতাকে মহা অপরাধ আখ্যা দিয়ে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَايَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

করা হলে অপর জায়গায় মুসলমানরা তাদের জন্যে হুমকি হয়ে দেখা দিবে। আজকে যেখানে অবস্থা এই, কোনো একটি অমুসলিম দেশ থেকে মুসলমানদের উচ্ছেদ করা হলে তারা লাখে লাখে গিয়ে প্রতিবেশী একাধিক মুসলিম দেশে গিয়ে বসবাস করছে, তখন অর্থাৎ বিজয় পূর্ব যুগের অবস্থা তেমন ছিল না। কাজেই মুষ্টিমেয় ক'জন মুসলমানকে শেষ করে ইসলামকে নির্মূল করে ফেলাটা কি কঠিন কাজ? কাফিররা এ চিন্তায় তাড়িত হয়ে মুসলিম অস্তিত্ব বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। কিন্তু আল্লাহ ছিলেন মুসলমানদের সহায়ক। আল্লাহর ওয়াদায় পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে মহানবী (সা) ইসলামকে জয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যান। কাফিররা মুসলমানদের জাতি সত্তাকে বিলীন করাটা যতই সহজ মনে করুক না কেন, মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর সাহায্য যাদের পশ্চাতে রয়েছে তাদের নির্মূল করা ছিল সাধ্যের অতীত। কারণ আল্লাহ ঘোষণা করেছেন–

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ.

"তিনি সেই মহান সত্তা যিনি পথ নির্দেশক বিধি ব্যবস্থা ও সত্য জীবন বিধান দিয়ে তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন যেন তিনি অন্যান্য (মানব রচিত ও বাতিল বিধি) ব্যবস্থার উপর তাকে বিজয়ী করেন। যদিও তাতে মুশরিক কাফিররা অস্বস্তি বোধ করবে।" (সূরা তাওবা : ৩৩)

সুতরাং এহেন অবস্থায় সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও অসৎ নেতৃত্বের উৎখাতকল্পে জিহাদ করা, দ্বীনের পথে অর্থ সম্পদ ব্যয় করা, ধন প্রাণের বাজি লাগানো যে কত বড় কঠিন কাজ তা সহজেই অনুমেয়। এ কারণেই মক্কা বিজয়ের পূর্বে প্রাণ-সম্পদ ব্যয়কারীগণ সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। আমাদের উপর তাঁদের অবদান অসীম অতুলনীয়। কেননা তাঁদের মহান ত্যাগের মাধ্যমেই ইসলাম আমাদের ভাগ্যে জুটেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাঁদের এ মহান আদর্শের অনুসরণের তাওফীক দান করুন। আমীন!

"আল্লাহর সম্পদ প্রাপ্ত হয়েও যারা কৃপণতা করে, তারা যেন নিজেদের একাজকে নিজের জন্য উত্তম মনে না করে বরং তাদের এ কৃপণতা তাদের জন্য অতীব মন্দ ফলদায়ক। কেননা কৃপণতার দ্বারা সঞ্চিত সম্পদ কিয়ামতের দিন তাদের গলার শৃঙ্খল রশি হয়ে দাঁড়াবে। (সূরা আলে ইমরান : ১৮০)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে–

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَيُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ.

"যারা স্বর্ণ রৌপ্য জমা করে রাখে এবং আল্লাহর পথে সেগুলো ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।" (সূরা তাওবা : ৩৪)

এমনিভাবে আল্লাহর বিধানের প্রতিষ্ঠাকল্পে সমাজে সৎ নেতৃত্ব কায়েমে যারা বাতিল শক্তির সামনে ভীরুতা ও কাপুরুষতার পরিচয় দেয়, তাদের নিন্দায় কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ اِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ.

"বাতিল শক্তির সাথে দ্বন্দ্বমুখর সংকটময় পরিস্থিতি দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েছে বলে যারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, বুঝতে হবে, সে আল্লাহর গযবে পতিত হয়ে গেছে। তার ঠিকানা জাহান্নামে। আর সেটি হচ্ছে অতি নিকৃষ্টতম স্থান। তবে যুদ্ধের কৌশলগত কারণে কিংবা আপন দলে শামিল হওয়ার উদ্দেশ্যে যদি কেউ এরূপ আচরণ করে সেটা স্বতন্ত্র কথা।" (সূরা আনফাল : ১৬)

وَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَاهُمْ مِنْكُمْ وَلٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُوْنَ.

অর্থাৎ "আর তারা (তথা মুনাফিকরা) কসম করে বলে যে, তারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত, অথচ তারা আদৌ তোমাদের মধ্যে শামিল নয়। বরং ঐ সকল লোক হচ্ছে ভীরু কাপুরুষ– তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন।" (সূরা তাওবা : ৫৬)

কুরআন হাদীসে এ সম্পর্কে অসংখ্য উক্তি রয়েছে, বরং বিশ্বের সকল মানুষই এতে একমত। এমনকি এ ব্যাপারে প্রবাদও আছে যে–

"তারা বর্শাও চালাতে জানে না আর তারা দয়ালুও নয়।" আরো বলা হয়–

لاَفَارِسَ الْخَيْلِ وَلاَوَجْهَ الْعَرَبِ.

"তাঁরা যেমন ঘোড় সওয়ারীতে পটু নয়, তেমনি আরবের কোন সম্ভ্রান্ত লোকও নয়।"

রাজনীতি ও শাসন কর্তৃত্বের তিন শ্রেণীর লোক

রাজনীতি ও শাসন কর্তৃত্বের প্রশ্নে তিন শ্রেণীর লোকের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়–

(১) যাদের ধ্যান ধারণা পার্থিব মোহে আচ্ছন্ন। ভূপৃষ্ঠে আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা, দাম্ভিকতা প্রদর্শন এবং অশান্তি সৃষ্টিই হলো এই শ্রেণীর মানুষের একমাত্র লক্ষ্য। আখিরাতের জবাবদিহিতার ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ উদাসীন। এনাম প্রদান ও অর্থ ব্যয় ছাড়া (গদি রক্ষা করা যায় না,) শাসন কার্য চলতে পারে না বলেই তাদের বিশ্বাস। আর যেহেতু এজন্যে বিপুল অর্থ দরকার, যা তাদের নেই, তাই অর্থাগমের অবৈধ পন্থা তারা অবলম্বন করে থাকে। ফলে তারা শাসকরূপী লুটেরা ও ডাকাতে পরিণত হয়। তারা বলে, শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী তারাই হতে পারে, যারা খেতে পারে এবং খাওয়াতেও পারে। নির্মল লোকদের একাজ নয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে তারা বঞ্চিত থাকারই যোগ্য। এক শ্রেণীর শাসকের এ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে রাষ্ট্রের (নীতিবান) আমলা-উমারা পর্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে এবং এহেন রাষ্ট্র প্রধানকে ক্ষমতাচ্যুত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এ শ্রেণীর শাসকরা পার্থিব লাভ ক্ষতির আলোকেই সবকিছু মূল্যায়ন করে থাকে। পরকালীন জীবনের সুখ শান্তির কথা তারা বেমালুম ভুলে যায়। তওবা করে এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যদি তাদের ফিরে আসার ভাগ্য না হয়, তাহলে ইহ-পরকাল উভয় জগতে তারা চরম ক্ষতির সম্মুখীন হবে। সুতরাং তারাই হবে– خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ - "দুনিয়া আখিরাত সর্বনাশকারী লোকদের অন্তর্ভুক্ত।"

(২) দ্বিতীয় শ্রেণী : যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং জনগণের উপর জুলুম অত্যাচার করাকেও অবৈধ মনে করে বটে, এমনকি হারাম উপার্জন থেকে বেঁচে থাকার অনিবার্যতায়ও বিশ্বাসী। কিন্তু এ সত্ত্বেও (ঈমানী দুর্বলতা হেতু) তারা মনে করে যে, অন্যায় হারাম পন্থায় অর্থ সংগ্রহ ছাড়া রাজনীতি ও শাসন কার্য পরিচালনা সম্ভব নয়, তাই তারা অবৈধ পন্থায় ক্ষমতার অপব্যবহার দ্বারা অর্থলুটের পথ বেছে নেয় এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপে জনগণের কল্যাণ চিন্তায় নিরাসক্ত হয়ে পড়ে। ফলে নৈতিক দুর্বলতা ও ভীরুতার শিকার হয়ে জনসেবামূলক ক্রিয়াকলাপকে বিরক্তিকর মনে করে। তারা দ্বীনের এমন মনগড়া ব্যাখ্যা দাঁড় করায়, যাতে ওয়াজিব পর্যন্ত ছেড়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না, যা কোন কোন হারামের চেয়েও অধিক ক্ষতিকর। অথচ ফরয ছেড়ে দেয়া এবং জিহাদ থেকে বিরত থাকা কার্যত জিহাদ পরিত্যাগ করারই নামান্তর। তারা মনগড়া ব্যাখ্যার ছত্র ছায়ায় দ্বীনী ফরয থেকেই নির্লিপ্ত থেকে যাচ্ছে।

আবার কেউ কেউ এও বিশ্বাস করে যে, উল্লেখিত কার্যকলাপ অস্বীকার করা ওয়াজিব আর যুদ্ধ ব্যতীত এ ওয়াজিবের উপর আমল করা সম্ভব নয়। ফলে তাঁরা মুসলমানদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। যেমন খারিজী সম্প্রদায়ের লোকেরা করেছিল। এদের দ্বারা না পার্থিব কল্যাণ সাধিত হয়, না পারলৌকিক। অবশ্য সময় বিশেষে এদের কার্যকলাপেও দ্বীন-দুনিয়ার বিচ্ছিন্ন দু'একটি কল্যাণ সাধিত হয়ে যায়। এদের এই ইজতেহাদী অপরাধ ক্ষমাযোগ্য ও বিবেচিত হয়ে থাকে। আবার কখনো এরা অধিক ক্ষতিরও সম্মুখীন হয়। কিন্তু সার্বিক বিচারে এদের কর্ম প্রচেষ্টা ভ্রান্তিপূর্ণই হয়ে থাকে। অথচ তারা মনে করে, আমরা সৎকাজে লিপ্ত আছি। এ নীতিতে বিশ্বাসী লোকেরা নিজের জন্যও কিছু লাভ করতে পারে না অপরকেও কিছু দিতে পারে না। তারা কেবল অসাধু ব্যক্তিদেরই মনোরঞ্জন করে থাকে। আর এটা মনে করে যে, 'মুআল্লাফাতুল কুলূব' তথা দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করণার্থে কিছু ব্যয় করা অন্যায় ও হারাম।

(৩) তৃতীয় শ্রেণীটি হলো উম্মতের মধ্যপন্থী লোকদের। এ শ্রেণীটি হলো দ্বীনে মুহাম্মদী এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের অনুসারী। উম্মতে মুসলিমার মধ্যপন্থী বিশেষ ও সাধারণ সকল মানুষের কিয়ামত পর্যন্ত এটাই সঠিক পথ। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি থাকে, জনকল্যাণমূলক কাজে অর্থ ব্যয় করা, জনগণের প্রয়োজন মিটানো, চাই তা বিত্তশালী হোক কিংবা বিত্তহীন। জনগণের মান মর্যাদা, ইয্যত-সম্ভ্রম এবং পার্থিব প্রয়োজন পূরণ, ইকামতে দ্বীনের কাজ ও সমাজ সংশোধনে অর্থ ব্যয় করা জরুরী। সক্ষম ব্যক্তি ছাড়া কারো কাছ থেকে উন্নয়ন করের অর্থ গ্রহণ করা সমীচীন নয়। সর্বক্ষেত্রে খোদাভীতি এবং কল্যাণ বিবেচনাকেই প্রধান্য দিতে হবে। কেননা শরীয়তী শাসন ব্যবস্থা খোদাভীতিপূর্ণ জবাবদিহিতা ও জনকল্যাণের প্রাধান্য ছাড়া পূর্ণ হতে পারে না।

আল্লাহ ফরমান– اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ.

"মহান আল্লাহ খোদা ভীরু, মুত্তাকী এবং সৎকর্মশীলদের সঙ্গেই থাকেন।" (সূরা নাহল : ১২৮)

সর্বোপরি মূল কথা হলো, জনগণের অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করতে হবে এবং তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে, নিজেরা হালাল খেতে হবে। বৈধ উপায়ে অর্থোপার্জনে সচেষ্ট থাকতে হবে। অধিকন্তু বিত্তশালী ও ধনী লোকের মিতব্যয়ী হওয়া অপরিহার্য। কারণ, বিত্তশালীদের নিকটই অভাবী লোকরা কিছু

পাওয়ার ও প্রয়োজন মিটাবার অধিক আশা পোষণ করে থাকে, যা স্বল্প বিত্তশালী সাধুজনদের নিকট থেকে সাধারণত আশা করা হয় না।[১]

সাধুজনদের নিকট থেকে মানুষ সাধারণত চারিত্রিক সংশোধনই অধিক পরিমাণে প্রত্যাশা করে। বিত্তশালীদের নিকট থেকে এটা তেমন প্রত্যাশা করে না। সাধ্যানুযায়ী এবং সম্ভাব্য উপায়ে চরিত্র সংশোধন করে নেওয়াটাই হলো তাকওয়া ও দ্বীনের আসল মর্যাদা। আবু সুফিয়ান ইবনে হরবের বর্ণনা অনুযায়ী সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে উল্লেখ আছে যে, সম্রাট হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে প্রশ্ন করেছিলেন: "উক্ত নবী তোমাদের কি শিখান?" উত্তরে আবু সুফিয়ান বলেছিলেন : "তিনি আমাদেরকে নামায কায়েম, সততা অবলম্বন, চারিত্রিক সংশোধন এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখার নির্দেশ দান করেন।" অপর এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করেন– "হে ইবরাহীম,

---

১. যেমন, বাদশাহ্, মন্ত্রীবর্গ, গভর্ণর, বর্তমানের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রধান, উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা, নেতৃবৃন্দ অর্থাৎ সারাদেশে শাসক গোষ্ঠী এবং সমাজপতিদের প্রভাব থাকে। যদি তারা ন্যায়পরায়ণ চরিত্রবান হন তবে স্বাভাবিকভাবেই জনগণ তথা গোটা জাতি চরিত্রবান হয়। পক্ষান্তরে যদি তাদের চরিত্র কলুষিত ও ত্রুটিপূর্ণ হয়, তবে জাতীয় চরিত্রে এর প্রভাব প্রতিফলিত হওয়া অনিবার্য। বস্তুত জনসেবার দাবী হলো, সর্বক্ষেত্রে গণস্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সুতরাং এ সম্পর্কে শেখ সাদী বলেন–

گو سینداز برائے چوپان نیست بلکه چوپان برائے خدمت اوست -

অর্থাৎ "পাহারাদারী করা বকরীর কাজ নয়, বরং পাহারাদারই তার খিদমতে নিয়োজিত।" উচ্চ পদস্থ লোকেরাই যদি অবৈধ পন্থায় কালো টাকার পানে হাত বাড়ায় তার অধীনস্তদের থেকে সচ্চরিত্র ও লোভহীনতার আশা করা বৃথা। শেখ সাদী বলেন–

به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد - زنند لشکر یانش بزاز مرغ بسیخ -

(অর্থাৎ "বাদশাহ্ যদি অন্যায় পথে পাঁচটি ডিম গ্রহণ করে, তবে তার সৈন্যরা অবৈধ পন্থায় হাজার মোরগ শিকে চড়াবে।")

জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়াই জনসেবার মূল কথা। তাই শেখ সাদী বলেন–

بر رعیت ضعیف رحمت کن تا ازشمن قوی زحمت نه بینی -

অর্থাৎ "দুর্বলজনের প্রতি দয়া কর। তাহলে শক্তিধর দুশমনের কবলে পতিত হবে না।"

চরম সত্য কথা হল, এ বিশ্ব আল্লাহরই সার্বভৌমত্বাধীন রাজত্ব। কাজেই এখানে একমাত্র তাঁরই বিধান চালু হবে আর এ দ্বারাই কেবল ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধিত হতে পারে। এ পর্যায়ে আলিম ও শাসক ও দু'সম্প্রদায়ের উপরই গোটা জাতির মঙ্গলামঙ্গলের দায়দায়িত্ব নিহিত। তারা ভাল তো সবই ঠিক। অন্যথায় সব বরবাদ। তাই বলা হয়েছে–

وَهَلْ اَفْسَدَ الدُّنْيَا اِلاَّ الْمُلُوْكُ وَاَحْبَارُ سُوْءٍ رُهْبَانُهَا -

অর্থাৎ "একমাত্র শাসক চক্র এবং অসাধু ধর্মীয় নেতারাই দ্বীন ধর্মে বিপর্যয় এনেছে।"

তোমার কি জানা আছে, কেন তোমাকে আমি আমার "খলীল" (বন্ধু) বানিয়েছি? তা এ জন্যে যে, 'গ্রহণ করার চেয়ে দান করাটাই তোমার অধিক প্রিয়। তোমার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যে তুমি আমার খলীল।"

ইতিপূর্বে বদান্যতার উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ বদান্যতা সর্বাবস্থায় জাতীয় ও জনস্বার্থের নিরিখে হতে হবে। পক্ষান্তরে, ক্রোধ ও ধৈর্যের ক্ষেত্রে ক্ষতির মাত্রা এড়িয়ে যাওয়াটাই হলো প্রকৃত বীরত্ব– এদিকটার প্রতি সর্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। ক্রোধের দিক থেকে মানুষের তিনটি অবস্থার প্রকাশ ঘটে। (১) আল্লাহ ও ব্যক্তি স্বার্থে ক্রোধান্বিত হওয়া। (২) আল্লাহর উদ্দেশ্যে উভয়ের কোনটির জন্যেই ক্রোধান্বিত না হওয়া। (৩) যাদেরকে উম্মতে ওয়াসাত তথা মধ্যপন্থী বলা হয় তাদের ক্রোধ একমাত্র আল্লাহরই উদ্দেশ্যে হয়। কাজেই তারা স্বার্থ দুষ্ট ক্রোধের সাথে আদৌ পরিচিত নন। এ সম্পর্কে বুখারী ও মুসলিমে হযরত আয়েশা (রা) এর উক্তি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন–

مَا ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ خَادِمًا لَهُ وَلَاامْرَأَةً وَلَا دَابَّةً وَلَاشَيْئًا قَطُّ - اِلاَّ اَنْ يُجَاهِدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا نِيْلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَانْتَقَمَ لِنَفْسِهِ قَطُّ اِلاَّ اَنْ يُّنْتَهِكَ حُرْمَاتِ اللّٰهِ فَاِذَا انْتَهَكَ حُرْمَاتِ اللّٰهِ لَمْ يَقُمْ لِنَفْسِهِ شَيْءٌ حَتّٰى يَنْتَقِمَ لِلّٰهِ -

"মহানবী (সা) স্বহস্তে কোন খাদেমকে, কোন মহিলাকে, কোন পশুকে অথবা অন্য কাউকে কখনো প্রহার কিংবা আঘাত করেননি। অবশ্য যুদ্ধ ক্ষেত্রের কথা স্বতন্ত্র। আর তাকে নিজের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। তবে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ হতে দেখলে এবং তাঁর সীমা লংঘিত হলে তখন তাঁর ক্রোধ হতো অপ্রতিরুদ্ধ।"

যে শাসক আল্লাহর জন্যে নয় বরং নিজের জন্যে ক্রোধোন্মত্ত হয়ে, শুধু ব্যক্তিস্বার্থে নিজের পাওনাটুকু উসূল করে এবং অপরের অধিকার প্রদান করে না, তাহলে সে আল্লাহর সৃষ্টিজগতের নিকৃষ্টতর জীব। এহেন ব্যক্তির দ্বারা দুনিয়া আখিরাত কোনোটিরই কল্যাণ সম্ভব নয়।

সৎ কর্মশীলদের রাজনীতি ও শাসনকার্য ছিল সর্বাঙ্গীন সুন্দর। তাদের নীতি ছিল– তাঁরা রাষ্ট্রীয় অপরিহার্য দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে পালন করতেন। আল্লাহ্র নিষিদ্ধ কাজসমূহ থেকে অতীব সতর্কতার সাথে দূরে সরে থাকতেন। তারা এমন নির্মল চরিত্রের অধিকারী ছিলেন যে, তাঁদের দানে দ্বীনের অশেষ কল্যাণ সাধিত হতো। তারা রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে ঠিক ঐ পরিমাণই গ্রহণ করতেন, যদ্দুর তাদের জন্যে

বৈধ ছিল। তাদের ক্রোধ বা অসন্তুষ্টি ছিল সম্পূর্ণ আল্লাহর উদ্দেশ্যে। আর তাও আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ কারো দ্বারা সংঘটিত হলেই কেবল তা প্রকাশ পেত। নিজেদের পাওনা তাঁরা প্রায় ক্ষমাই করে দিতেন।

এটা ছিল নবী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তিনি আয় ব্যয়ের ক্ষেত্রে কামেল ও পরিপূর্ণ ছিলেন। সুতরাং চারিত্রিক ব্যাপারে তাঁদের নিকটবর্তী লোকেরাই হলেন উত্তম ও মর্যাদাশালী। কাজেই মুসলমানদের প্রথম ফরয হল, নবীর নীতি চরিত্র ও আদর্শের নৈকট্য লাভের আপ্রাণ চেষ্টা করা এবং সাধ্যমত চেষ্টার পর নিজের ভুল-ভ্রান্তির জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। তদুপরি এ বিশ্বাস বদ্ধমূল করতে হবে যে, আল্লাহ পাক সত্য ও সামগ্রিক জীবনের উত্তম আদর্শরূপেই নবী (সা)কে প্রেরণ করেছেন। বিষয়টি সম্পর্কে কুরআনের ভাষ্য হলো–

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا.

"আমানত তার হকদারকে প্রত্যার্পণ করতে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন।"[১]

---

১. এটাই হল ইসলামী বা খোদায়ী হুকুমতের সারকথা। সুতরাং سروری در دین ما خدمت گریست অর্থাৎ "আমাদের ধর্মে খিদমত তথা জনসেবাই হল নেতৃত্বের মূল দর্শন" প্রবাদটি এ অর্থেই প্রচলিত। আজকের বিশ্বে বৃহৎ শক্তি, বড় বড় রাষ্ট্রের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তালাশ করলে اَنْ تُؤَدُّوا الاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا এর নিদর্শন কোথাও কি দেখতে পাওয়া যায়? বর্তমানের মুসলিম দেশসমূহের প্রতি লক্ষ্য করলেও لاَ لِنَفْسِه وَلٰكِنْ لِرَبِّه (অর্থাৎ "নিজের জন্য নয় বরং একমাত্র আল্লাহর জন্য")-এর অর্থে কোন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া মুশকিল। গোটা বিশ্বে আজ একই রং অভিন্ন চরিত্রের অধিকারী লক্ষ্য করা যায় যেই দৃশ্য ইসলাম পূর্ব যুগে রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যে প্রতিভাত হতো।

ইমামুল হিন্দ হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ) তাঁর বিশ্ব বিখ্যাত "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ" গ্রন্থে "ইরতিফাকাত ওয়া ইসলাহুর রুসূম" অনুচ্ছেদে রোমান এবং অনারবীদের অবস্থা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। এর উপর চিন্তা করে اَنْ تُؤَدُّوا الاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا এর মর্ম সামনে রেখে বিবেচনা করা উচিত– আল্লাহ আমাদের নিকট কি চান আর আমরা চলছি কোন দিকে, আর বিশ্ব কোন ধরনের বিপ্লব ও পরিবর্তন কামনা করে। নিম্নে এর সারসংক্ষেপ পেশ করা হল। শাহ সাহেব লিখেন : "রোমানরা এবং অনারবগণ দীর্ঘদিন যাবত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার ফলে তারা পার্থিব ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে যায়। শয়তান তাদের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল যে, অধিক পরিমাণে ভোগের সামগ্রী, বিলাস দ্রব্য সংগ্রহ করা, প্রতিযোগিতামূলকভাবে বিলাস সামগ্রীর প্রদর্শনী করা তাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে পরিণত হয়। সূক্ষ্মতর বিলাস দ্রব্য লাভ করার পিছনেই তাদের বিবেক বুদ্ধি ব্যয় করা হতো। অতপর এসব দ্বারা আশ্চর্য ধরনের আমোদ প্রমোদ ও চিত্ত বিনোদনের পন্থা উদ্ভাবন করা হতো। তাদের শাসকবর্গ ক্ষমতার জৌলুস ও জাঁকজমক প্রদর্শন করতে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতো, এ দ্বারাই তার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাদের রঈস, বিত্তশালী গোত্রপতি ও শাসক

শ্রেণীর লোকদের জন্য দু'লাখ টাকার কম মূল্যের মুকুট পরিধান করাটা ছিল কলংকের বিষয়। তাদের জন্য ঝর্ণাধারা প্রবাহিত নহর ও মনোরম উদ্যানবিশিষ্ট প্রকাণ্ড রাজ প্রাসাদ থাকাটা ছিল অনিবার্য। খিদমতের জন্য সারিবদ্ধ গোলাম বাঁদীর দল আর আস্তাবলে ঘোড়ার পাল থাকা ছিল অতীব জরুরী। সুপ্রশস্ত দস্তরখান এবং বাবুর্চি খানায় সর্বদা উচ্চ মূল্যের খানা তৈরী থাকাকে আভিজাত্যের প্রতীক মনে করা হতো।

মোটকথা, এসব জীবনোপকরণের তুলাদণ্ডে জীবন যাত্রার মান নির্ণয় করা হতো। আভিজাত্যবোধ তাদের বিশ্বাসের অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হতো, যা স্থায়ী ব্যাধিরূপে তাদের কৃষ্টি-সভ্যতার শিরা উপশিরায় প্রবাহিত ছিল। কৃষক শ্রমিক পর্যন্ত এতে আক্রান্ত ছিল। নিজেদের ভোগ বিলাসের উপকরণ হাসিল করার উদ্দেশ্যে দেশ জাতি অসংখ্য মানব গোষ্ঠীকে বিপর্যস্ত করে ফেলা তাদের জন্য সাধারণ ব্যাপার ছিল। কিন্তু অঢেল অর্থ ব্যয় ছাড়া এগুলো অর্জন করা সম্ভব ছিল না বিধায় কৃষক, ব্যবসায়ী শ্রমিক মজদুর শ্রেণীর উপর করের বোঝা চাপানো হতো। কিন্তু এ অন্যায় ও অতিরিক্ত কর আদায়ে অপরাগ অবস্থায় বেতনভোগী সৈন্য বাহিনী দ্বারা গরীবদের উপর অত্যাচার-নিপীড়নের ঝড় বইয়ে দেয়া হতো। শাসক শ্রেণীর শক্তির দাপটের সামনে আত্ম সমর্পণকারী গরু গাধার মতো খাটানো হতো। ফলে নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দের প্রতি কিঞ্চিৎ নযর দেয়ার অবকাশই ছিল না। অবস্থা এই দাঁড়িয়েছিল যে, লাখো কোটি আদম সন্তানের ধ্যান-ধারণা থেকে দ্বীন-ধর্ম ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জনের গুরুত্ব বিলীন হয়ে যায়। কল্যাণধর্মী ও উন্নয়ন মুখী কোন পরিকল্পনা ও বৃহৎ কাজ, যার উপর জাতির ভবিষ্যত নির্ভরশীল সার্বিকভাবে বাস্তবক্ষেত্রে বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য শিল্প ক্ষেত্রে কিছু হতো না তা নয়, তবে সেটা ছিল নিছক প্রভুদের প্রমোদমূলক কিংবা তাদের ভোগের সহায়ক সামগ্রী। কেননা এছাড়া প্রভুর নিকট শ্রমিক শিল্পীর কোন কদর ছিল না। কেবল স্বাচ্ছন্দই ছিল মনিবের মনতুষ্টির একমাত্র উপায়। অপর দিকে একদল অর্থ লোভী কবি সাহিত্যিক, অনুকরণ-প্রিয়, গায়ক, চাটুকার, তোষামোদী এবং উমিদার সৃষ্টি হয়ে যায়, দরবারী হিসাবে পরিচিত কিংবা দরবারের সাথে তারা সংশ্লিষ্ট ছিল। তাদের সাথে তথাকথিত একদল কপট দ্বীনদার শ্রেণীও শরীক ছিল, যারা প্রকৃত পক্ষে দ্বীনদার তো ছিল না বরং ধর্মের ছদ্মাবরণে স্বার্থসিদ্ধি এবং ধর্মের ব্যবসাই ছিল তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। ফলে সমাজের উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সর্বস্তরে ব্যক্তিস্বার্থ ও সুবিধাবাদী নীতি সংক্রামক ব্যাধিরূপে ছড়িয়ে পড়ে। গোটা সমাজদেহ চরিত্রহীনতায় তলিয়ে যায়। এমনিভাবে তথাকথিত সমাজপতি শ্রেণীর কল্যাণে (!) খোদাভীতি এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বীজ অংকুরিত হতে বাধাপ্রাপ্ত ও বিনষ্ট হয়ে যায়।"

তিনি আরো বলেন : "রূম ও আযমের উপর সীমাহীন এ বিপদ আপতিত হওয়ার পর খোদাই গযব টুটে পড়ে এবং সংস্কারের চিকিৎসার মাধ্যমে এ ব্যাধি নির্মূল করার ফয়সালা স্বরূপ আরবের বুকে একজন উম্মী নবী (সা) আগমন করেন, যার নির্মল চরিত্রে তাদের মিথ্যা আভিজাত্যের কোন ছোঁয়া লাগেনি এবং তাদের রীতি-নীতি আর দুশ্চরিত্রের ছায়া থেকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত। আল্লাহ তাঁর নবীকে (সা) আদর্শ জীবনের, উন্নত চরিত্রের প্রতীক বানিয়ে পাঠিয়েছেন। তাঁর কণ্ঠে রূমী ও পরাসিক চরিত্রহীনতা ও খোদাহীন কার্যকলাপের নিন্দা করিয়েছেন এবং পার্থিব ভোগ বিলাসে মত্ত থাকাকে অসার প্রতিপন্ন করেছেন। অনারবীয় আচার-আচরণকে নিষিদ্ধ করেছেন। যেমন সোনা

রূপার থালা-বাসন, স্বর্ণ-মণির অলংকার, রেশমী কাপড়, মূর্তি প্রতিমা ইত্যাদি হারাম করা হয়। মোটকথা, মহানবীর নেতৃত্বে পারস্য ও রোমক সাম্রাজ্য সমূলে উৎখাত করা হয়। আর নবীর কণ্ঠে ঘোষিত হয়–

هَلَكَ كِسْرٰى لاَكِسْرٰى بَعْدَهٗ وَهَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهٗ -

"কিসরা ও কায়সার বিলীন হয়ে গেছে। অতঃপর তাদের অভ্যুত্থান আর হবার নয়।"

মোটকথা, মহানবীর আবির্ভাবকালে সারা বিশ্ব তৎকালীন বৃহৎ শক্তি রোম ও পারস্যের আধিপত্য বলয়ে ছিল, তা নিষ্পিষ্ট হওয়ার ন্যায় আজ সারা জাহান ইঙ্গ-মার্কিনের মতো যেই দুই বৃহৎ শক্তির দাসত্বের পক্ষপুটে আবদ্ধ, তাও মুসলমানরা ইসলামকে খণ্ডিতভাবে বিচার না করে খোদায়ী নির্দেশমাফিক যুগোপযোগী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উদ্ভাবনে অন্যদের মতো মনযোগী হলে এবং যথাযথ ইসলামী অনুশাসন মেনে চললে, নৈতিক আর্থিক, সামরিক আধ্যাত্মিক সকল দিক থেকে আজকের এই বৃহৎ শক্তিদ্বয়ের পরিনীতিও অতীত রোম-পারস্যের অনুরূপ হতে বাধ্য। মূলতঃ উল্লেখিত শক্তিদ্বয় ছাড়া অন্য রাষ্ট্রসমূহ দৃশ্যতঃ যদিও স্বাধীন বলে জোর গলায় প্রচার করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এবং বাস্তবের প্রেক্ষাপটে বিশ্ব সমাজ নানান দিক থেকে এদের গোলামীর কঠিন শিকলে বাঁধা। এদেরই স্বার্থবাদী রাজনীতি, পংকিল কৃষ্টি সভ্যতা, সংস্কৃতি নোংরা আচার আচরণ অনুকরণীয় বলে স্বীকার করা হয়। তাদের অপসংস্কৃতি এবং আয়েশী জীবন ধারার অনুকরণে নিজেদের চরিত্র গঠনে যত্ন সহকারে বিশেষ তৎপরতায় অংশ নেয়া হয়। অথচ পাশ্চাত্যের আধুনিক সভ্যতা সংস্কৃতি বিশেষ ক্ষেত্রে বিশ্ব সমাজকে আজ বিপদগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত করে রেখেছে।

সংক্ষেপ কথা হল, বিশ্ব যদি শান্তি চায়, জীবনের নিরাপত্তা কামনা করে পার্থিব এবং পারলৌকিক জীবনে শান্তি কামনায় আগ্রহী হয়, তবে ঐশী গ্রন্থ আল-কুরআন এবং ইসলামকে বাস্তব জীবনে সামগ্রিকভাবে কার্যকর করণে এগিয়ে আসতে হবেই। কারণ, এ বিধান কোন মানব রচিত বিধান নয় বরং এটা আল্লাহ প্রদত্ত এক চিরন্তন জীবন বিধান। অধিকন্তু মহান আল্লাহ্র সৃষ্ট জগতে একমাত্র তাঁরই বিধান জারী হলেই শান্তি আসতে পারে। মহানবী (সা) এবং খুলাফায়ে রাশেদীন এ মূলনীতি বলেই ইসলামী বিপ্লবের মাধ্যমে গোটা বিশ্বে পরিবর্তনের হাওয়া চালু করেন। অর্ধ শতাব্দীরও কম সময়ে পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর সর্বত্র ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়। যার ফলে নিরাপত্তা শান্তি ও কল্যাণময় রাষ্ট্রের শীতল ছায়ায় বিশ্ববাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পায়। উপরন্তু أَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا সীমাহীন শক্তি গোটা বিশ্বকে ছেয়ে ফেলে। তাই পরিশেষে পরিতাপের সুরে বলতে হয়, হায়! মুসলিম জাতি যদি পুনরায় জাগ্রত হয়ে মহানবী (সা) এবং সাহাবীগণের আনুগত্য ও পদাংক অনুসরণে এগিয়ে আসতো, তাহলে মানুষের এ দুনিয়া প্রায় বেহেশতের উদ্যানে রূপান্তরিত হতো। সর্বত্র শান্তির ফল্গুধারা বয়ে যেতো।

لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ اَمْرًا -

অর্থাৎ - হয়তো আল্লাহ্ এর পরে অনুরূপ অবস্থা সৃষ্টি করবেন।

[দশ]

ন্যায় বিচার ঃ অপরাধের খোদায়ী দণ্ডবিধি

শরীয়তের 'হদ্দ' এবং 'হক' বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের সাথে সীমাবদ্ধ নয়, হদ্দের ব্যাপারে সুপারিশ করা হারাম, তা রহিত বা হ্রাস করার জন্য ঘুষদাতা, গ্রহীতা এবং দালাল সবাই অপরাধী গুনাহগার।

মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশ– وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ.

"মানুষের কলহ-বিবাদ, মামলা-মোকদ্দমা মীমাংসা করার সময় তোমরা ইনসাফের ভিত্তিতে ফায়সালা করবে।" (সূরা নিসা : ৮ রুকূ)

মানুষের মধ্যে ফয়সালা করার অর্থ শরীয়তের হদ্দ এবং হকের ব্যাপারে হুকুম দেয়া। হদ্দ ও হক দু'প্রকার। এর কোন প্রকারই কোন বিশেষ গোত্র, সম্প্রদায় এবং গোষ্ঠীর সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। বরং মুসলমান জাতি এ নিরপেক্ষতা দ্বারা উপকৃতই হয়। যেমন চোর, ডাকাত, লুটেরা, ব্যাভিচারী ইত্যাদির উপর হদ্দ বা শরীয়তী দণ্ডবিধি জারী করা। রাষ্ট্রীয় সম্পদ, সরকারী মাল, ওয়াকফ ও অসিয়তের মাল– এগুলো বিশেষ কোন গোত্র বা সম্প্রদায়ের সাথে নির্দিষ্ট নয়। এসব বিষয়ের প্রতি রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা প্রমুখ সকলের বৈষম্য মুক্ত বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে। এ সম্পর্কে হযরত আলী (রা) বলেন–

لاَبُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ اِمَارَةٍ بَرَّةً كَانَتْ اَوْ فَاجِرَةً -

"পূর্ণ সৎ কি অসম্পূর্ণ সৎ, পূর্ণ ভাল কি অসম্পূর্ণ ভাল, মানুষের জন্য নেতৃত্ব অপরিহার্য।" জনগণ প্রশ্ন তুললো– হে আমীরুল মুমিনীন! সৎ নেতৃত্বের গুরুত্ব তো বুঝে আসল; কিন্তু অসম্পূর্ণ সত্যের তাৎপর্য কি? জবাবে তিনি বললেন–

يُقَامُ بِهَا الْحُدُوْدُ تَأْمَنُ بِهَا السُّبُلُ وَيُجَاهَدُ بِهَا الْعَدُوُّ وَيُقْسَمُ بِهَا الْفَيْءُ -

"যে নেতার দ্বারা হদ্দজারী (অপরাধ দণ্ডবিধি) কার্যকর করা হয়, রাস্তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়, তাঁর নেতৃত্বে শত্রুর সাথে জিহাদ করা যায় এবং তাঁর মাধ্যমে 'ফাঈ' তথা যুদ্ধলব্ধ গণীমতের মাল বণ্টিত হতে পারে।" অর্থাৎ অন্য দিকে

নেতৃত্বের ত্রুটি থাকলেও হদ্দজারীর মতো শক্ত ভূমিকা তার থাকতেই হবে। রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে এ গুণ নানান কারণে অপরিহার্য।

এ নিয়ে রাষ্ট্রের অধিনায়ক, স্থানীয় প্রশাসক এবং জন প্রতিনিধিগণের আলোচনা পর্যালোচনা অবশ্য কর্তব্য এবং কারো দাবী ছাড়াই সমাজে অপরাধ নির্মূলে হদ্দ কায়েম হতে হবে। শাহাদত তথা সাক্ষ্যেরও একই হুকুম যে, কারো দাবী-দাওয়া ছাড়াই সাক্ষ্য গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। অবশ্য চোরের হাত কাটার হদ্দ জারী করার জন্য যার মাল চুরি করা হয়েছে তার পক্ষ থেকে চুরি যাওয়া মালের দাবী করতে হবে কি হবে না, এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আহমদ প্রমুখের মতে কোনো বাদী হয়ে দাবী ব্যতীত হদ্দ জারী করা যাবে না। কিন্তু অন্যান্য সকল ইমামের সর্বসম্মত মত হলো এই, যে ব্যক্তির মাল চুরি হয়েছে তার পক্ষ থেকে দাবী আসুক বা না আসুক 'হদ্দ' জারী করতে হবে। কোন কোন আলিম মালের দাবী করার শর্ত এ জন্যে আরোপ করেন, যেন চোরের চুরি সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহ না থাকে।

এসব হল সে চরিত্রের অপরাধ, যেগুলোতে হদ্দ জারী করা ওয়াজিব। চাই সে সম্ভ্রান্ত হোক অথবা নীচ বংশীয়, বৃহৎ দলের সদস্য হোক কিংবা দল ছাড়া, শক্তিশালী হোক অথবা দুর্বল, সবার ক্ষেত্রেই সমভাবে 'হদ্দ' জারী করা ফরয। এক্ষেত্রে কারো সুপারিশ, হাদিয়া তোহফা, উপহার-উপঢৌকন অথবা অন্য কোন কারণে 'হদ্দ' বাতিল করা কিছুতেই জায়েয নয়। প্রয়োগ শক্তি থাকা সত্ত্বেও হদ্দ বাতিলকারীর উপর আল্লাহ, রাসূল, ফেরেশতা এবং সকল মানুষের অভিসম্পাত বর্ষিত হবে। মোটকথা 'হদ্দ' জারী না করার কোন প্রকার সুপারিশ গ্রহণযোগ্য নয়। বরং সুপারিশকারী - مَنِ اشْتَرَى بِايَاتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلاً (অর্থাৎ "বিচার বিভাগের যেই সংশ্লিষ্ট বিচারক অল্প দামে (অর্থাৎ বৈষয়িক স্বার্থে) আল্লাহর আয়াতসমূহ বিক্রয় করে") 'হদ্দ' জারি থেকে বিরত থাকে সে আয়াতের আলোচ্য চরিত্রের লোকদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) এর সূত্রে আবু দাউদ (রহ) কর্তৃক বর্ণিত, মহানবী (সা) বলেছেন–

مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدٍّ مِّنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ - فَقَدْ ضَادَّ اللّٰهَ فِىْ اَمْرِهِ وَمَنْ خَاصَمَ فِىْ بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُ لَمْ يَزَلْ فِىْ سَخَطِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْزِعَ وَمَنْ قَالَ فِىْ مُسْلِمٍ مَالَيْسَ فِيْهِ حُبِسَ فِىْ رَدْغَةِ

الْخِبَالُ حَتّٰى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَارَدْغَةُ الْخِبَالِ؟ قَالَ عُمَارَةُ اَهْلِ النَّارِ - (ابو داود)

"যার সুপারিশ আল্লাহর কোন হদ্দের বাস্তবায়নে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, সে যেন আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করলো। আর যে ব্যক্তি জ্ঞাতসারে মিথ্যা ও বাতিলের পক্ষে ঝগড়ায় অবতীর্ণ হয় অথচ সে জানে যে এটা মিথ্যা, তাহলে ঝগড়া থেকে বিরত না হওয়া পর্যন্ত সে ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টিতে নিপতিত থাকবে। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে এমন অপবাদ দিল বা দোষারোপ করল যার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। সে ব্যক্তি 'রাদগাতুল খিবালে' আটক থাকবে। সাহাবীগণ আরয করলেন হে রাসূলাল্লাহ, 'রাদগাতুল খিবাল' কি জিনিস? তিনি বললেন– জাহান্নামীদের দেহের গলিত রক্ত ও পুঁজ।" (আবু দাউদ)

নবী করীম (সা) শাসনকর্তা, সাক্ষী এবং বিবাদকারীদের বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন এজন্য যে, এরাই হল বিচারের মূল স্তম্ভ এবং এদের সততার উপরই সমাজে সংঘটিত বিভিন্ন বিরোধ-মামলা-মোকদ্দমার সঠিক ফয়সালা নির্ভরশীল।

হযরত আয়েশা (রা) সূত্রে সহীহ বুখারী-মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত সুপারিশ সম্পর্কিত 'বনী মখযূম' গোত্রীয় মহিলার ঘটনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। উক্ত মহিলা জনৈক ব্যক্তির মাল চুরি করেছিল। তার পক্ষে তদবীর করার জন্য কিছু লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে এ ব্যাপারে আলাপ করতে চাইল। তাদের মধ্য হতে কেউ বলল এমন সাহস কার যে, এ নিয়ে তাঁর সাথে কথা বলবে? বলা হলো– এ ব্যাপারে আলাপ করা একমাত্র উসামা ইবনে যায়েদের (রা) পক্ষেই সম্ভব। সুতরাং তিনি সে মহিলার পক্ষ হয়ে নবী করীম (সা)-এর খিদমতে কথা পেশ করলে নবীজি বলেন–

اَتَشْفَعُ فِىْ حَدٍّ مِّنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ؟ اِنَّمَا هَلَكَ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ لاَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ - وَاِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا - (بخارى، مسلم)

"তুমি কি আল্লাহ নির্ধারিত হদ্দের ব্যাপারে সুপারিশ করতে এসেছ? ইতিপূর্বে বনী ইসরাঈল নিপাত হওয়ার একমাত্র কারণ হলো যে, তাদের শরীফ লোক চুরি

করলে তাকে তারা ছেড়ে দিত। কিন্তু কোন দুর্বল লোক যদি চুরি করতো, তার উপর তারা 'হদ্দ' জারি করতো। সেই মহান সত্তার কসম যার 'কবজায়' মুহাম্মদের প্রাণ; মুহাম্মদ তনয়া ফাতিমাও যদি চুরি করতো আমি তাঁর হাতও কেটে দিতাম।" (বুখারী ও মুসলিম)

এটা একটা মহাশিক্ষণীয় ঘটনা। কেননা কুরাইশ গোত্রের দু'টি শাখাই সম্ভ্রান্তরূপে খ্যাত ছিল। (১) বনী মখযূম এবং (২) বনী আবদে মান্নাফ। লক্ষণীয় যে, এই মখযূম গোত্রীয় মহিলা পর্যন্ত হাত কাটা থেকে নিস্তার পায়নি। অথচ কোন কোন আলিমের মতে ধার নেয়া সামান্য একটি জিনিসের বিনিময়ে হাত কাটা পড়েছিল, আসলে সেটা চুরিই ছিল না। অবশ্য কারো কারো মতে সেটা চুরি ছিল। কাজেই সেক্ষেত্রে অপরের বেলায় তো কোন প্রশ্নই উঠে না। জনসংখ্যার দিক দিয়ে সংখ্যায় ছিল তারা অধিক, অতি সম্ভ্রান্ত, তদুপরি মহানবী (সা)-এর প্রিয় খাদিম হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা) সুপারিশ করেছিলেন। এতদসত্ত্বেও এ সুপারিশের ফলে তিনি তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে উক্তি করেছিলেন : তুমি কি একটি হারাম ও নাজায়েয বিষয় নিয়ে সুপারিশ করতে এসেছো? এটা কি আল্লাহ নির্ধারিত হদ্দের ব্যাপারে অন্যায় সুপারিশ নয়? অতঃপর তিনি হযরত ফাতিমা (রা)-এর দৃষ্টান্ত পেশ করে এর গুরুত্ব ব্যক্ত করেন যে, এহেন গর্হিত কাজে আমার মেয়ে ফাতেমাও যদি লিপ্ত হতো, হাত কাটার সাজা থেকে তাঁরও অব্যাহতি ঘটতো না।

বর্ণিত আছে– হাত কাটা সে মহিলা তওবা করেছিলেন। অতঃপর সময় সময় নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাজির হলে, তিনি তাঁর অভাব পূরণ করে দিতেন।

আরো বর্ণিত আছে–

اِنَّ السَّارِقَ اِذَا تَابَ سَبَقَتْهُ يَدُهُ اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنْ لَّمْ يَتُبْ سَبَقَتْهُ يَدُهُ اِلَى النَّارِ -

"চোর নিষ্ঠাপূর্ণ তওবা করলে তার সে কর্তিত হাত তাকে বেহেশতে নিয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি সে তওবা না করে, তবে সে কর্তিত হাত তাকে জাহান্নামের পথে এগিয়ে নিবে।"

'মুওয়াত্তা' গ্রন্থে ইমাম মালিক (রহ) রেওয়ায়েত করেছেন, একদল লোক জনৈক চোরকে পাকড়াও করে হযরত উসমান (রা)-এর দরবারে রওয়ানা হয়। পথিমধ্যে হযরত যুবায়ের (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে, তাঁরা তাকে হযরত উসমান

(রা)-এর নিকট সুপারিশের অনুরোধ জানায়। তিনি বললেন : "হদ্দ সম্পর্কিত মামলা খলীফার দরবারে দায়ের হয়ে যাওয়ার পর সুপারিশকারী এবং যার পক্ষে সুপারিশ করা হয়, এদের উভয়ের উপর আল্লাহর লা'নত বা অভিশাপ বর্ষিত হয়।"

হযরত সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া একবার মসজিদে শুয়ে আছেন। জনৈক চোর এসে তাঁর চাদরখানা নিয়ে রওয়ানা দেয়। তিনি তাকে পাকড়াও করে নবী (সা)-এর খিদমতে হাজির করেন। সাফওয়ান (রা) বললেন, আমার একটি মাত্র চাদরের বিনিময়ে এর হাত কাটা পড়বে? আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। হুযূর (সা) ইরশাদ করলেন–

فَهَلاَّ قَبْلَ اَنْ تَأْتِيَنِى بِهٖ عَفَوْتَ عَنْهُ - ثُمَّ قَطَعَ يَدَهُ -

"আমার নিকট উপস্থিত করার পূর্বেই তাকে ক্ষমা করনি কেন? অতঃপর তিনি তার হাত কাটার দণ্ড দিলেন।" (সুনান)

এ দ্বারা নবী করীম (সা)-এর উদ্দেশ্য ছিল, আমার নিকট উপস্থিত করার পূর্বে তোমার ক্ষমা করার সুযোগ ছিল, কিন্তু আমার আদালতে হাজির করার পর হদ্দ বাতিল কিছুতেই সম্ভব নয়। ক্ষমা সুপারিশ কিংবা অর্থ কোন প্রকারেই হদ্দ বাতিল করার ক্ষমতা কারো নেই। আমার জানামতে সর্বস্তরের আলিমগণের সর্বসম্মত ঐক্যমত অনুসারে চোর, ডাকাত, লুটেরা, হাইজাকার ইত্যাকার দুষ্কৃতকারীগণকে বিচারকের নিকট হাযির করার পর তাদের তওবা গ্রহণযোগ্য নয়, তওবা দ্বারা হদ্দের হুকুম রদ হয়ে যাবে না। বরং হুকুম বহাল রেখে হদ্দ জারী করা ওয়াজিব। সত্যিই যদি তারা একান্ত নিষ্ঠার সাথে তওবা করে থাকে, তবে এ হদ্দ তাদের জন্য কাফ্ফারা হয়ে যাবে। আর এর উপর স্থির থাকা সম্ভব হলে তাদের তওবা আরো মজবুত ও শক্তিশালী হবে। আর এটা হকদারের হকের পূর্ণ কিসাস বা প্রতিশোধের সমপর্যায়ভুক্ত। মহান আল্লাহর এ বাণীতে এর মূল সূত্র লক্ষ্য করা যায়–

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَّهُ نَصِيْبٌ مِّنْهَا - وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا.

"যে ব্যক্তি কোন সৎ কাজে সুপারিশ করে, এর প্রতিদানে তার জন্যও একটা অংশ নির্ধারিত থাকবে, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন অসৎ কাজে সুপারিশ করবে, এর মন্দ ফলে সেও শরীক থাকবে। আল্লাহ পাক সর্ব বিষয়ে পূর্ণ দৃষ্টিমান।" (সূরা নিসা : ৮৫)

বস্তুত সুপারিশের অর্থ হল সাহায্য সহায়তা প্রার্থনা করা। আরবীতে شفيع বা شفع 'দ্বি' বা দুইকে বলা হয়, যার বিপরীতে বসে وتر তথা বেজোড় বা এক। সুতরাং شفيع (দুই) وتر (একক) এর সাথে মিলিত হওয়াতে 'এক' যেন 'দুইয়ে পরিণত হল। কাজেই সৎ কাজে সাহায্য করা হলে এটা شفاعة حسنة তথা 'সৎ কাজে সুপারিশ' হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু যদি অন্যায় অবিচার শত্রুতা ও পাপাচারে সাহায্য করা হয়, এটা شفاعة سيئة 'অসৎ কাজে সুপারিশ'রূপে পরিগণিত হয়। বলাবাহুল্য, মানুষকে নেক ও সৎ কাজে সুপারিশের আদেশ করা হয়েছে আর অসৎ কাজে সুপারিশ দ্বারা সাহায্য করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন, وَلاَتَعَاوَنُوْا عَلَى الاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ কাজেই, কারো মিথ্যা কাজকর্মকে পুষ্টি সাধন করতে না দেয়াই হলো খোদাই বিধান। আল্লাহ বলেছেন– انَّ اللّٰهَ لاَيَهْدِىْ كَيْدَ الْخَائِنِيْنَ "বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্তকে আল্লাহ কিছুতেই কার্যকর হতে দেবেন না।" (সূরা ইউসুফ : ৫২)

মহান আল্লাহ আরো ইরশাদ করেছেন–

اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الاَرْضِ ـ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ـ اِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ. فَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ الرَّحِيْمٌ . (سورة مائدة)

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ এবং যমীনের বুকে বিপর্যয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালায়, তাদের শাস্তি তো হলো, (রাষ্ট্রীয় আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী) তাদের খুঁজে খুঁজে ধরে এনে বিচারের মাধ্যমে প্রাণদণ্ড দেবে অথবা শূলীতে চড়াবে কিংবা তাদের হাত পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করে দেবে, কিংবা দেশ থেকে তাদের বহিষ্কার করে দেবে, এগুলো হল তাদের পার্থিব লাঞ্ছনা, আর পরকালে রয়েছে তাদের জন্য কঠিন আযাবের ব্যবস্থা। কিন্তু তোমাদের হাতে ধৃত হওয়ার পূর্বেই যদি তারা তওবা করে নেয়, (সঠিক পথে এসে সংশোধিত হয়ে যায়,) তাদের কথা স্বতন্ত্র। তোমরা জেনে রেখো, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা মায়েদা : ৩৩-৩৪)

আলোচ্য আয়াতে সেসব লোকদেরকেই উক্ত সাজা থেকে অব্যাহতি দেয়ার

বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে, যারা ধৃত হয়ে বিচারকের আদালতে নীত হবার পূর্বেই নিষ্ঠার সাথে তওবা করে নেয়। তওবা অনুযায়ী কাজ করে। পক্ষান্তরে আদালতে হাজির করার পর যারা তওবা করবে, আলোচ্য আয়াতের মর্মানুযায়ী তাদের তওবা আইনত গৃহীত হবে না এবং তাদের উপর হদ্দ জারী করা ওয়াজিব। বলাবাহুল্য, এ নির্দেশ তখনই কার্যকর হবে যখন সাক্ষী এবং উপযুক্ত দলীল প্রমাণ দ্বারা অপরাধ প্রমাণিত হবে অথবা অপরাধী নিজেই তার অপরাধের কথা স্বীকার করে এবং বিচারালয়ে নিজে উপস্থিত হয়ে অপরাধের স্বীকৃতি প্রদান করে। কিন্তু এরই সাথে সে যদি তওবাও করে নেয় তবে এ ক্ষেত্রে ইমামগণের মধ্যে দ্বিমত লক্ষ্য করা যায়, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ)-এর যাহেরী রেওয়ায়েত অনুযায়ী এমতাবস্থায় হদ্দ জারী করা যাবে না। কিন্তু সে নিজেই যদি নিজের উপর হদ্দ জারী করার আবেদন জানায়, তবে হদ্দ জারী করা হবে। আর সে যদি হদ্দ জারী করতে আগ্রহী না হয় এবং চলে যায়, তবে হদ্দ জারী করা যাবে না। হযরত মাইয ইবনে মালিক (রহ)-এর হাদীস এর প্রতি ইঙ্গিতবহ। মাইযকে যখন রজম করা হয় তখন তাঁর অবস্থা কি ছিল তার বর্ণনা রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীগণের মুখে শোনার পর বলেছিলেন هَلاَّ تَرَكْتُمُوْهُ "তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেন?" এছাড়া অন্যান্য হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, ধৃত অবস্থায় হাকিমের নিকট উপস্থিত করার পূর্বে তওবা করে থাকলে, তার উপর হদ্দ জারী করা যাবে না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর সূত্রে আবু দাউদ ও নাসাঈ (রহ) বর্ণনা করেছেন, মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন–

تَعَافُوْا الْحُدُوْدَ فِيْمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِىْ مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ -

(ابو داود و نسائى)

"পরস্পর একে অপরকে তোমরা ক্ষমা করে দাও। কেননা আমার সামনে মামলা দায়ের করা হলে হদ্দ জারী করা ওয়াজিব হয়ে পড়বে।"

হযরত আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস নাসাঈ ও ইবনে মাজায় উল্লেখিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন–

حَدٌّ يَعْمَلُ بِهِ فِى الْاَرْضِ خَيْرٌ لاَهْلِ الْاَرْضِ مِنْ اَنْ يُمْطَرُوْا اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا - (نسائى و ابن ماجه)

"যমীনের বুকে হদ্দ জারী করা বিশ্ববাসীদের পক্ষে চল্লিশ দিনের প্রাতকালীন বৃষ্টি

বর্ষণ অপেক্ষা অধিক কল্যাণময়।"

আর এটা এজন্য যে, গুনাহ্ দ্বারা রিযিকের মাত্রা হ্রাস পায় এবং অন্তরে শত্রুভীতি সঞ্চারিত হয়। কুরআন হাদীসের আলোকে এটা প্রমাণিত। বস্তুতঃ হদ্দ জারীতে আল্লাহর অবাধ্যতা হ্রাস পেয়ে অপরাধের মাত্রা কমে আসে। কাজেই পাপাচার হ্রাস পাওয়ার ফলে বান্দার রিযিক ও সুখ স্বাচ্ছন্দ বৃদ্ধি পায় এবং আল্লাহর অফুরন্ত সাহায্য আসতে থাকে।

ব্যভিচারী, মদখোর, চোর, ডাকাত ছিনতাইকারী কোন অপরাধপ্রবণের কাছ থেকেই অর্থ-সম্পদ নিয়ে হদ্দ রহিত করা, কোন অবস্থাতেই জায়েয নয়। ব্যক্তিগতভাবে কারও জন্যে কিংবা বাইতুল মালে জমা দেওয়ার নামে কোনো অবস্থায়ই এ টাকা গ্রহণ করা জায়েয নয়। হদ্দ রহিত কিংবা বাতিল করার উদ্দেশ্যে গৃহীত অর্থ সম্পূর্ণ হারাম ও নিষিদ্ধ। বিচারক অথবা শাসক এরূপ কাজ করলে, সে যেন দুটো অবৈধ কাজের সমাবেশ ঘটালো। (১) হারাম অর্থের বিনিময়ে সে হদ্দ বাতিল করে দিল, (২) ওয়াজিব তরক করে হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ল। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী—

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ـ (سورة مائدة : ٦٣)

"তাদের (আহ্লে কিতাবদের) আলিম ও ধর্মীয় নেতাগণ তাদের অনুসারীদেরকে মিথ্যা বলা এবং হারাম মাল খাওয়া থেকে কেন নিষেধ করেনি? তাদের ধর্মীয় নেতা-বুযুর্গদের এহেন ক্ষমা ও উপেক্ষণীয় কার্যকলাপ কতই না নিন্দনীয় বিষয়।" (সূরা মায়েদা : ৬৩)

আল্লাহ তায়ালা ইহুদীদের অবস্থা ব্যক্ত করে বলেছেন— سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ "তারা মিথ্যা কথার কাসুন্দী ঘেটে বেড়ায় আর হারাম অর্থের মৌজ করে।" (সূরা মায়েদা : ৪২)

কারণ, ইহুদীরা সুদ, ঘুষ ইত্যাদি দ্বারা হারাম ও অবৈধ পন্থায় অর্থোপার্জন করত। এমনকি ঘুষকে তারা 'বরতল' এবং 'হাদিয়া' বলতো।

সুতরাং হাকিম বিচারক হারাম মাল গ্রহণ করলে, মিথ্যা সাক্ষীও তাকে গ্রহণ করতে হবে। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন—

اَلرَّاشِىْ وَالْمُرْتَشِىْ وَالرَّائِشُ الَّذِىْ بَيْنَهُمَا...

"ঘুষখোর, ঘুষদাতা, আর দু'জনের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী সবাই সমপর্যয়ের গুনাহগার।" (আহলে সুনান)

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে– দু'ব্যক্তি মহানবী (সা)-এর খিদমতে মামলা নিয়ে হাজির হলো। একজন বললো, হে রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কিতাবানুসারে আমাদের মামলার ফয়সালা করে দিন, দ্বিতীয়জন একটু হুশিয়ার ছিল, সেও বললো! হাঁ, হে রাসূলুল্লাহ! মীমাংসা আল্লাহর কিতাবানুসারেই করা হোক কিন্তু আমি কিছু বলার অনুমতি চাই। হুযূর (সা) বললেন আচ্ছা বল। সে বলতে থাকে, আমার ছেলে এর বাড়িতে মজদুর হিসাবে কাজ করতো। কিন্তু ঘটনাক্রমে এর স্ত্রীর সাথে আমার ছেলে যিনায় লিপ্ত হয়। আর তারপক্ষ থেকে ফিদিয়া স্বরূপ আমি একশ (১০০) বকরী দান করেছি, তদুপরি একটি গোলামও আযাদ করেছি। অন্যদের নিকট মাসআলা জিজ্ঞেস করেই আমি এ ব্যবস্থা করেছি। হুযূর (সা) জবাব দিলেন, তোমার পুত্রকে একশত দোররা মারতে হবে এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন দিতে হবে। আর উক্ত মহিলার উপর রজমের হদ্দ জারী করতে হবে।" অতঃপর তিনি ইরশাদ করেন–

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ - اَلْمِائَةُ الْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلٰى اِبْنِكَ حَدٌّ مِائَةٍ تَغْرِيْبُ عَامٍ وَاغْدُيَا اُنَيْسُ وَعَلٰى اِمْرَاةِ هٰذَا فَاسْئَلْهَا - فَاِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا - فَسَئَلَهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا -

"সেই মহান সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহ্র বিধানের ভিত্তিতে আমি তোমাদের মামলা ফয়সালা করে দেব। সুতরাং খাদিম ও বকরী তুমি ফিরত নিয়ে যাও। তোমার ছেলেকে একশ' কোড়া লাগাতে হবে অধিকন্তু এক বছরের জন্য দেশ ত্যাগ করতে হবে। আর হে উনাইস! ভোর হতেই তুমি সে মহিলার নিকট গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস কর, যদি সে অপরাধ স্বীকার করে, তবে তাকে রজম করে দাও। এই নির্দেশানুযায়ী তাকে জিজ্ঞেস করা হলে সে অপরাধ স্বীকার করে। সুতরাং 'রজম' তথা প্রস্তরাঘাতে তার প্রাণ দণ্ড দেওয়া হয়।"

লক্ষণীয় বিষয় যে, সাধারণ মুসলমান, গরীব মিসকীন এবং মুজাহিদগণের হাতে আগত সম্পদ তিনি গ্রহণ করতঃ 'হদ্দ' বাতিল করেন নাই। কাজেই আলিমগণের ইজমা তথা সর্বসম্মত ঐক্যমতে হদ্দের বিনিময়ে মাল গ্রহণ করা জায়েয নয়। অধিকন্তু এ ব্যাপারেও সবাই একমত যে, যিনাকার, চোর, মদখোর, রাষ্ট্রবিদ্রোহী,

ডাকাত ইত্যাদির নিকট থেকে হদ্দ থেকে বাঁচার জন্যে গৃহীত মাল সম্পূর্ণ হারাম ও অপবিত্র। সাধারণতঃ অধিকাংশ লোকের আচার-আচরণ নৈতিকতা বিরোধী এবং চরিত্র হীনতার শিকার, অর্থ-বিত্ত ও মান-মর্যাদার দোহাই দিয়ে হদ্দের হুকুম বাতিল করে দিতে বিশেষ তৎপর। ফলে শহর-বন্দর, গ্রাম-পল্লী, ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা, নেতা-সৈনিক এককথায় গোটা সমাজদেহ কলুষিত হয়ে পড়ে। উপরন্তু এ কারণেই ক্ষমতাসীন শাসক এবং বিচারকের মান মর্যাদা ধূলিস্যাৎ হয়ে যায়। ঘুষ খেয়ে হদ্দ বাতিল করার কারণে তাদের আসন পর্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। একজনের হদ্দ বাতিল করা হলে অন্যজনের উপর হদ্দ জারী করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, মানসিক শক্তি হারিয়ে বসে। পরিণামে তারা ইহুদী নাসারাদের পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে। যেমন হাদীসে আছে–

اِذَا دَخَلَتِ الرِّشْوَةُ مِنَ الْبَابِ خَرَجَتْ اَمَانَةٌ مِنْ كُوَّةٍ ـ

"ঘুষ এক দ্বার দিয়ে প্রবেশ করলে অপর দরজা দিয়ে আমানত বিশ্বস্ততা বের হয়ে যায়।"

'তা'দীবাত'-এর নামে রাজত্ব ও কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যে যে অর্থ আদায় করা হয় তা হারাম। এ পর্যায়ে সেসব এক রোখা গুণ্ডা পাণ্ডা লোকদের আচরণ লক্ষণীয়, তারা নিজের জন্য কিংবা পরের স্বার্থে কোন অঘটন ঘটিয়ে দুষ্কর্ম করে শাসকদের নিকট টাকা-পয়সা, দ্রব্য-সামগ্রী নিয়ে হাজির হয়। এর ফলে এদের লোভ-লালসা, দুঃসাহস আরো বেড়ে যায়। এমনিভাবে তারা ঘুষের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সুনাম সুখ্যাতি ধূলিস্যাৎ করে দেয়। এক শ্রেণীর কৃষকের অবস্থাও তাই। আর (মদ্যপায়ী) শরাবীরতো কথাই নেই। কোন মদখোর ধরা পড়লে টাকা পয়সা দিয়ে রেহাই পেয়ে যায়। শরাবী (মদ্যপায়ী) মাত্রই ধারণা করে, 'ধরা পড়লে টাকার জোরে মুক্তি পেয়েই যাব।' বলাবাহুল্য ঘুষের টাকা ও অবৈধ পন্থায় উপার্জিত সম্পদে কোন বরকত থাকতে পারে না। বরং এতে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়েরই সৃষ্টি হয়। তদ্রূপ কোন বিত্তশালী ও সম্মানী লোক যদি তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়ায় এবং হদ্দের সাজা থেকে রক্ষা করে যেমন কোন কৃষক বা শ্রমিক অপরাধ করে বাদশাহ অথবা আমীর তথা রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানের পিএ, সচিব বা কোনো প্রতিনিধির নিকট হাজির হল, আর সে আল্লাহ ও রাসূলের বিপক্ষে সাহায্যও সুপারিশ দ্বারা তাকে বাঁচিয়ে দিল। এ জাতীয় সাহায্য সুপারিশের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অভিসম্পাত বর্ষিত হয়েছে। হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-এর সূত্রে ইমাম মুসলিম (রহ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন–

لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ اَحْدَثَ حَدَثًا اَوْ اٰوٰى مُحْدَثًا ـ فَكُلُّ مَنْ اٰوٰى مُحْدَثًا مَنْ هٰؤُلَاءِ الْمُحَدِثِيْنَ فَقَدْ لَعَنَهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ ـ

"যেসব ব্যক্তি কোন বিদআত সৃষ্টি করে অথবা কোন অপরাধীকে আশ্রয় দেয়, তাদের উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের লা'নত বর্ষিত হয়।" (শরীয়তে মনগড়া কোনো নীতি নিয়মের উদ্ভাবনের নাম হচ্ছে বিদআত।) মহানবী (সা) অরো ইরশাদ করেছেন–

مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ فَقَدْ ضَادَّ اللّٰهَ فِىْ حُكْمِهِ ـ (مسلم)

"যদি কারো সুপারিশ আল্লাহর কোন হদ্দের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় তবে, মূলতঃ এটা আল্লাহ্র নির্দেশ অকার্যকর করার চেষ্টারই নামান্তর।" (মুসলিম)

কাজেই যাদের হাতে হদ্দ কায়েম করার ক্ষমতা ও দায়িত্ব ন্যস্ত, তারা যদি অর্থের বিনিময়ে অপরাধীকে ক্ষমা করে ছেড়ে দেয়; তাহলে এটা যে কত বড় বিপর্যয় ডেকে আনবে, তা সহজেই অনুমেয়। কারো প্রভাব প্রতিপত্তির ভয়ে কিংবা ঘুষের বিনিময়ে অপরাধীকে মুক্তি দেয়া হলে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সে জালিম তথা সীমা অতিক্রমকারীদের সাহায্য করলো। দ্বিতীয়তঃ যে মালের বিনিময়ে ছাড়া হচ্ছে, সেটা হয়তো বাইতুল মালের সম্পদ অথবা শাসন কর্তার। আর ঘুষ কখনো প্রকাশ্যে গ্রহণ করা হয়, কখনো গোপনে, উভয় অবস্থাতেই ঘুষ নিষিদ্ধ ও হারাম। এটিই ইসলামী আইনজ্ঞদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। যেমন কোন মদের দোকানির যামিন হওয়া, নিজে এর জন্য জায়গা দেয়া কিংবা অন্যত্র জায়গার বন্দোবস্ত করে দেয়া, অথবা অন্য কোন প্রকারে এর সহায়তা করা কিংবা ঘুষ খেয়ে এর অনুমতি দেয়া এসবই একই শ্রেণীর অপরাধ, জোরপূর্বক যিনার ব্যবস্থা করে বিনিময় গ্রহণ, গনককে গণনার জন্যে অর্থ প্রদান, কুকুর বিক্রি করে মূল্য গ্রহণ, এসবই যেমন হারাম, ঘুষও তেমনি হারাম। ঘুষ এখানে হারাম আচরণের উদ্দেশ্যে দালালীর পর্যায়ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন–

ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيْثٌ وَمَهْرُ الْبَغْيِ خَبِيْثٌ وَحُلْوَانُ الْكَاهِنِ خَبِيْثٌ. (بخارى)

"কুকুরের মূল্য অপবিত্র, যিনার বিনিময় অপবিত্র এবং গনকের পারিশ্রমিক অপবিত্র।" (বুখারী)

যিনার বিনিময় ও পারিশ্রমিক, পতিতা নারীর পারিশ্রমিক সম্পূর্ণ হারাম। হিজ্ড়া, ক্লিব চাই গোলাম হোক চাই আযাদ, এদের সাথে কুকর্মে লিপ্ত ব্যক্তি ও গনক এদের হুকুমও একই। এসব হারাম কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করাও সম্পূর্ণ হারাম।

যে বিচারপতি ও শাসক অপরাধ ও অসৎ কাজ দমন করবে না, হদ্দ জারী করবে না, বরং অর্থের বিনিময়ে অপরাধীকে ছেড়ে দেবে, তাদের অবস্থা হারামকারী ও চোরের সরদারের ন্যায়। তারা অশ্লীলতা ও ব্যভিচারে লিপ্ত দালালের অনুরূপ। যে যিনাকারদের সহায়তা করার বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করে থাকে, ঘুষখোররা তারই সমপর্যায়ের। উপরন্তু তাদের অবস্থা হযরত 'লূত' (আ)-এর বৃদ্ধা স্ত্রীর ন্যায়, যে সমকামী পাপিষ্ঠদেরকে লূত (আ)-এর বালকবেশী ফেরেশতা মেহমানদের উপস্থিতির খবর দিয়েছিল। যার সম্পর্কে মহান আল্লাহর উক্তি হলো–

فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ اِلاَّ امْرَاَتَهٗ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِيْنَ. (اعراف : ٨٣)

"অতএব আমি লূত এবং তাঁর পরিবার-পরিজনকে নাজাত দিলাম কিন্তু তার স্ত্রী, যে পশ্চাৎগামীদের অন্তর্ভুক্ত রইল (তাকে মুক্তি দেইনি)।" (সূরা আরাফ : ৮৩)

কুরআনে লূত (আ)-কে লক্ষ্য করে আরো বলা হয়েছে–

فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلاَيَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلاَّ امْرَاَتَكَ. اَنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَااَصَابَهُمْ -

"তুমি নিজ পরিবার-পরিজন নিয়ে রাতের এক অংশে (শেষ ভাগে) যাত্রা কর, কিন্তু তোমাদের কেউ যেন কোনো দিকে ফিরেও না তাকায়, অবশ্য তোমার স্ত্রী না তাকিয়ে ছাড়বে না। কাজেই এর উপরও একই আযাব আপতিত হবে যা ঐ পাপিষ্ঠদের উপর পতিত হবে।" (সূরা হূদ : ৮১)

সুতরাং আল্লাহ পাক সে দালাল বৃদ্ধাকে একই আযাবের আওতাভুক্ত করেন, যা পাপাচারী সম্প্রদায়ের উপর নাযিল করেছিলেন। কেননা এসবই হলো সীমালংঘনের অন্তর্ভুক্ত। আর এর জন্য অর্থ গ্রহণ করা অন্যায় সহযোগিতার শামিল। কোন ব্যক্তিকে শাসন ক্ষমতায় এ জন্যই বসানো হয়, সে যেন সৎ কাজে আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধের দায়িত্ব যথাযথ পালন করে। শাসন কার্যের মূল উদ্দেশ্য এটাই। সুতরাং খোদ্ শাসক কর্তৃক অর্থ-সম্পদ নিয়ে, ঘুষ খেয়ে সমাজে কোন অসৎ কার্য প্রচার-প্রসারের সুযোগ করে দেয়াটা মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। এটি এমন যে, কাউকে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠানো হলো, আর সেখানে

পৌছে সে মালিকের বিপক্ষে দুশমনেরই সাহায্যে লেগে গেল। এর আরেকটি উদাহরণ হলো, মাল দেওয়া হয়েছে জিহাদের জন্য কিন্তু বাস্তবে তা ব্যয় করা হচ্ছে মুসলমানদের নিধন করার কাজে।

ভিন্ন অর্থে এর ব্যাখ্যায় বলা যায়, সৎ ও সঠিক কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধের ফলশ্রুতিতেই মানব কল্যাণ সাধিত হয়। কেননা, মানব জাতির অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের নিরাপত্তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যেই নিহিত। এ আনুগত্য মূলতঃ পূর্ণতা লাভ করতে পারে একমাত্র সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের মাধ্যমেই। এর ভিত্তিতেই মুসলিম জাতিকে "খায়রা উম্মাহ্" তথা 'উত্তম জাতি'রূপে ঘোষণা করা হয়েছে, কারণ, তাদেরকে বিশ্ব মানবের কল্যাণে সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ -

"তোমরাই উত্তম জাতি। তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে এজন্য যে, তোমরা সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধের দ্বারা মানব জাতির কল্যাণ সাধন করবে।" (সূরা আলে ইমরান : ১১০)

আরো বলা হয়েছে–

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ -

"তোমাদের মধ্য হতে এমন এক দল লোক প্রস্তুত হওয়া দরকার, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎ কাজের আদেশ করবে আর মন্দ-গর্হিত কাজে নিষেধ করবে।" (সূরা আলে ইমরান : ১০৪)

বনী ইসরাইলের অবস্থা বর্ণনায় বলা হয়েছে-

كَانُوْا لَايَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوْهُ - وَلَبِئْسَ مَاكَانُوْا يَفْعَلُوْنَ -

"যে গর্হিত কাজে তারা লিপ্ত ছিল, তা থেকে তারা বিরত থাকত না, অবশ্যই সেগুলো ছিল অতি নিন্দনীয় কাজ, যা তারা করত।" (সূরা মায়েদা : ৭৯)

মহান আল্লাহ আরো ইরশাদ করেছেন–

فَلَمَّا نَسُوْا مَاذُكِّرُوْا بِهٖ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْءِ وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. (سورة الاعراف : ١٦٥)

"সুতরাং অবাধ্যরা তাদের প্রতি কৃত আদেশ উপদেশ ভুলে গেলে, তাদের মধ্য থেকে যারা মন্দ কাজে নিষেধ করত তাদেরকে আমি রক্ষা করেছি, কিন্তু পাপাচারীদেরকে আমি তাদের মন্দ কাজের পরিণামে কঠিন শাস্তিতে নিপতিত করেছি।" (সূরা আরাফ : ১৬৫)

অত্র আয়াতে আযাব থেকে সেসব লোকদের পরিত্রাণ লাভের কথা বলা হয়েছে, যারা গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকত আর আল্লাহ্ পাক পাপাচারীদের কঠিন আযাবে নিপতিত করেছেন।

হযরত সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) একবার মিম্বরে নববীতে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন যে, মুসলমানগণ! তোমরা এ আয়াত পাঠ কর কিন্তু একে ভুল অর্থে প্রয়োগ করে থাক :

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لاَيَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ـ (سورة مائدة : ١٠٥)

"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজের কল্যাণ চিন্তা কর। তোমরা নিজেরা যদি হিদায়াতের উপর দৃঢ় থাক তবে, কারো পথহারা হওয়াতে তোমাদের কোনই ক্ষতি নেই।" (সূরা মায়েদা : ১০৫)

নবী করীম (সা)-কে আমি বলতে শুনেছি—

اِنَّ النَّاسَ اِذَا رَأَوْ اَلْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوْا اَوْشَكَ اَنْ يَّعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ ـ

"মানুষ যখন মন্দ কাজ দেখেও তা সংশোধনের ব্যবস্থা করে না, তাই অতিসত্ত্বর তাদের উপর ব্যাপকভাবে আল্লাহর আযাব পতিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।" অন্য এক হাদীসে আছে-

"গোপনে কৃত গুনাহর ক্ষতি কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট গুনাহগারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু যদি তা প্রকাশ্যে করা হয় এবং সংশোধনের ব্যবস্থা না নেয়া হয়, তাতে সাধারণ লোকেরা পর্যন্ত এ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। একই বিষয়বস্তু 'হদূদে এলাহী এবং হুকুকুল্লাহ'র অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ।

বস্তুতঃ নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, সত্যবাদিতা, আমানতদারী, পিতা মাতার সঙ্গে সদাচরণ, আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখা, পরিবার-পরিজন ও প্রতিবেশীদের সাথে সদব্যবহার ইত্যাদি সৎকর্মসমূহ 'আমর বিল মা'রূফ' তথা সৎ কাজের আদেশের অন্তর্ভুক্ত। শাসনকর্তা এবং হাকিম ও প্রশাসন যন্ত্রের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব হলো, নিজেদের অধীনস্থ ব্যক্তিদেরকে নামাযের হুকুম করা এবং নামায তরককারীকে শাস্তি দেয়া। এ ব্যাপারে সকল মুসলিম আইন বিশেষজ্ঞ একমত।

দ্বিতীয় সর্বসম্মত ঐক্যমত হলো (মুসলিম পরিচয়ের) বেনামাযী সংঘবদ্ধ দল যারা নামাজ অস্বীকার করে, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা কর্তব্য। অনুরূপভাবে যাকাত, রোযা বর্জনকারীর বিরুদ্ধেও জিহাদ করার বিধান রয়েছে। হারামের বিরুদ্ধেও জিহাদ ঘোষণা করতে হবে। যেমন, শরীয়ত নিষিদ্ধ রমণীকে বিবাহ করা এবং সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করা ইত্যাদির বিরুদ্ধে জিহাদ করাও ফরয। শরীয়তের প্রকাশ্য ও দ্ব্যর্থহীন হুকুমকে অস্বীকারকারী দলের বিরুদ্ধে জিহাদ করাও ফরয, যতক্ষণ না আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী হয়। এ ব্যাপারে 'ইসলামী আইনবিদগণ পূর্ণ একমত।

বেনামাযী যদি একক ব্যক্তি হয় তবে বলা হয়েছে তাকে প্রহার করতে হবে, সাজা দিতে হবে এবং নামাযের পাবন্দ না হওয়া পর্যন্ত বন্দী করে রাখতে হবে। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে, নামায অস্বীকার করলে সরকার তাকে মৃত্যুদণ্ড দিবে। অবশ্য এর নিয়ম হল– প্রথমে তাকে তওবা করে নামায শুরু করার নির্দেশ দিতে হবে। যদি সে তওবা করে নামায আরম্ভ করে, তবে তো সেটা উত্তম। অন্যথায় (অর্থাৎ মুরতাদ হয়ে তা) অস্বীকারে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে।

প্রশ্ন হলো, এ মৃত্যুদণ্ড কিসের ভিত্তিতে? নামাজ ছাড়াতে সে কাফির হয়ে গিয়েছিল সে কারণে, না কি ফাসেক হওয়ার কারণে? এ ব্যাপারে দু'ধরনের মত রয়েছে। অধিকাংশ ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞের মতে (মুসলিম থেকে) কাফির হয়ে যাওয়া মৃত্যুদণ্ড দানের কারণ। এ মতভেদ তখন যদি নামায 'ফরজ হওয়া' তো স্বীকার করে কিন্তু বাস্তবে আমল করে না, কিন্তু যদি নামায ফরজ হওয়াটাই অস্বীকার করে, তবে সর্বসম্মতভাবে এ অস্বীকৃতির কারণে সে কাফির (মুরতাদ) হয়ে যাবে। অন্যান্য সব ফরজ-ওয়াজিব ও হারামের হুকুমও অনুরূপ। অস্বীকৃতির দরুন যার বিপরীত আমল করায় তাকে মৃত্যুদণ্ড দান অপরিহার্য। এ পরিস্থিতিতে সাজার মূল কারণ হলো ফরজিয়াত বর্জন করা এবং হারামসমূহে লিপ্ত হওয়া। সবার ঐক্যমতে (এরূপ অবাধ্য সংঘবদ্ধ দলের বিরুদ্ধে) উম্মতে মুসলিমার উপর জিহাদ করা ওয়াজিব। কুরআন-হাদীসে এর অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। আর জিহাদ হলো

বান্দার উৎকৃষ্ট আমল। একবার মহানবী (সা)-এর নিকট কেউ এ মর্মে আবেদন করে যে–

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ دُلَّنِىْ عَلٰى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ لَاتَسْتَطِيْعُهُ اَوْ لَاتُطِيْعُهُ - قَالَ اَخْبِرْنِىْ بِهٖ - قَالَ تَسْتَطِيْعُ اِذَا خَرَجَهُ الْمُجَاهِدُ اَنْ تَصُوْمَ وَلَاتَفْطُرْ وَتَقُوْمَ وَلَاتَفْتُرْ - قَالَ وَمَنْ يَسْتَطِيْعُ ذَالِكَ - فَذَا الَّذِىْ يَعْدِلُ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

"হে রাসূলুল্লাহ (সা), আল্লাহর পথে জিহাদের সমতুল্য অন্য কোনো আমলের কথা ইরশাদ করুন। তিনি বললেন : এ ধরনের আমল করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়।" সে বলল : "আমাকে বলে দিন।" হুযূর (সা) বললেন : "মুজাহিদ দল আল্লাহর পথে রওয়ানার সময় থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে একাধারে রোযা রাখবে, কখনো ইফতার করবে না। আর তুমি রাতব্যাপী নামায পড়বে কখনো ছাড়বে না, এটা কি তোমার পক্ষে সম্ভব? তিনি বললেন : এমনটি কার সাধ্যে কুলাবে? অতঃপর তিনি বললেন : এ আমলই আল্লাহর পথে জিহাদের সমান হতে পারে।" (বুখারী ও মুসলিম)

তিনি আরো ফরমান–

اِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَمِأَةَ دَرَجَةٌ بَيْنَ الدَّرَجَةِ اِلَى الدَّرَجَةِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالاَرْضِ اَعَدَّ اللّٰهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ -

"জান্নাতে একশ'টি স্তর রয়েছে। এক স্তর থেকে অপর স্তরের ব্যবধান আকাশ পাতাল পরিমাণ। এ বিশাল জান্নাত আল্লাহ পাক তাঁর রাস্তায় জিহাদকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

অধিকন্তু তিনি আরো বলেছেন–

رَأْسُ الْاَمْرِ اَلْاِسْلَامُ عُمُوْدُهُ اَلصَّلٰوةُ وَذَرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

"ইসলাম (অর্থাৎ আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পণই) হচ্ছে সকল কাজের মূল। আর নামায এর স্তম্ভ। আর জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ সর্বোৎকৃষ্ট।"

এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন–

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا

وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ.

"নিষ্ঠাবান মুমিন একমাত্র তারাই যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে। অতঃপর কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করে না এবং জান মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে, প্রকৃতপক্ষে এরাই যথার্থ সত্যবাদী।" (সূরা হুজরাত : ১৫)

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন–

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَايَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ـ وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ـ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا جَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ـ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ ـ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ـ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ـ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ اَجْرٌ عَظِيْمٌ. (سورة توبة : ٢٢-١٩)

"তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো আর 'মসজিদুল হারাম' আবাদ রাখাকে সে ব্যক্তির কাজের সমতুল্য ধরে নিয়েছো, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং আখিরাতে বিশ্বাস রাখে, তদুপরি আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করে? (জেনে রেখো মর্যাদায়) আল্লাহর নিকট এরা সমপর্যায়ের নয়, আর আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে সরল পথ দেখান না। যারা ঈমান আনে, হিজরত করে এবং জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে, আল্লাহর নিকট তারা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী আর এরাই সফলকাম। তাদের পালনকর্তা তাদেরকে নিজ অনুগ্রহ, সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের সুসংবাদ দান করছেন, যেখানে তারা চিরন্তন সুখে অনন্ত জীবন যাপন করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সওয়াব ও প্রতিদানের অফুরন্ত ভাণ্ডার মওজুদ রয়েছে।" (সূরা তাওবা : ১৯-২২)

[এগার]

ডাকাত-ছিনতাইকারীদের সাজা এবং যুদ্ধকালীন সময় সামরিক বাহিনীর যেসব কাজ নিষিদ্ধ

ডাকাত-ছিনতাইকারী ও লুণ্ঠনকারীদের সাজা। কাউকে জিহাদে প্রেরণকালে নবী করীম (সা) নসীহত করতেন : দুশমনের সাথে লড়াই করবে। কিন্তু সীমা অতিক্রম করবে না। নিজের ওয়াদা ও অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, শত্রু পক্ষের কারও কান, নাক কেটে 'মুছলা' করবে না। ছোট শিশুদের হত্যা করবে না, নিজ হাতিয়ারসহ যে ব্যক্তি স্বগৃহে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকে, এমন লোকদেরকে হত্যা করবে না। যদি কাফিররা মুসলমানদের 'মুছলা' করে তবে মুসলমানদের জন্যেও আগ্রাসীদের সাথে অনুরূপ করার অনুমতি রয়েছে কিন্তু না করাই উত্তম।

ডাকাত, পথিক প্রবাসীদের মালামাল লুণ্ঠন ও ছিনতাইকারী চাই সে পল্লীবাসী গ্রাম্য হোক চাই শহুরে, কৃষক কিংবা চরিত্রহীন সিপাহী, শহুরে যুবক হোক অথবা অন্য কেউ– এদের শাস্তি সম্পর্কে কুরআনের ভাষ্য হলো–

اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا ـ اَنْ يُّقَتَّلُوْا اَوْيُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ـ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ. (سورة مائدة : ٣٣)

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক সন্ত্রাসী কার্য করে বেড়ায়, ইসলামী আদালতে তাদের শাস্তি হলো, তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেবে অথবা শূলে চড়ানো হবে, কিংবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত পা কেটে ফেলা হবে অথবা দেশান্তরিত করা হবে। এটা হল তাদের দুনিয়ার লাঞ্ছনা আর পরকালে রয়েছে তাদের জন্য ভয়াবহ শাস্তি।" (সূরা মায়েদা : ৩৩)

ডাকাত ও লুটেরা সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) প্রমুখ বলেন : ইমাম শাফিঈ (রহ) তাঁর সুনান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন–

اِذَا قَتَلُوْا وَاَخَذُوا الْمَالَ قُتِّلُوْا وَصُلِّبُوْا ـ وَاِذَا قُتِّلُوْا وَلَمْ

يَأْخُذُوا الْمَالَ قُتِّلُوْا وَلَمْ يُصَلَّبُوْا - وَاِذَا اَخَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوْا قُطِّعَتْ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ وَاِذَا اَخَافُوا السُّبُلَ وَلَمْ يَاْخُذُوا الْمَالَ نُفُوْا مِنَ الاَرْضِ.

"তারা যদি হত্যাসহ মালামাল লুট করে, তবে শাস্তিস্বরূপ তাদের মৃত্যুদণ্ড দেবে এবং শূলে চড়ানো হবে। আর যদি শুধু হত্যাই করে মালামাল লুট না করে, তাহলে মৃত্যুদণ্ড দেবে, শূলে চড়াতে হবে না। কিন্তু যদি শুধু মালপত্রই নিয়ে যায়, হত্যা করে নাই এমতাবস্থায় বিপরীতভাবে তাদের হাত পা কাটতে হবে। আর যদি মালামাল না নিয়ে কেবল ভীতিপ্রদর্শন করে, তবে তাদেরকে দেশান্তরিত করতে হবে।"

ইমাম শাফিঈ (রহ) ইমাম আহমদ (রহ)সহ অধিকাংশ ইসলামী আইনবিদের রায় এটাই। অধিকন্তু এ মতটি ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর অভিমতের প্রায় কাছাকাছি।

এদের মধ্যে কোন কোন লোক এমনও হবে যাদের ব্যাপারে প্রধান বিচারক ও আমীরকে ইজতিহাদ করতে হবে এবং বিশেষ বিবেচনা করতে হবে। হত্যা করা বা না করা উভয় অবস্থায় কল্যাণকর দিক সামনে রাখতে হবে। (অপরাধের চরিত্র ও পরিস্থিতি বুঝে) মৃত্যুদণ্ড বা অন্য দণ্ড প্রদান করবে।

আর যদিও তারা টাকা কড়ি নেয় নাই, কিন্তু শক্তিশালী ও সাহসী, ইচ্ছা করলে ছিনিয়ে নেয়ার শক্তি তাদের ছিল, এদেরও একই হুকুম। কারো মতে তারা যদি সম্পদ লুট করে তবে তাদের হাত কাটার দণ্ড দেবে শূলে চড়াতে হবে না। অধিকাংশ আলিম প্রথম মত সমর্থনকারী।

কোন ব্যক্তি যদি ডাকাতি করে, সেই সাথে হত্যাও করে এমতাবস্থায় ইমাম, আমীর, বিচারপতি বা হাকিম তার উপর হদ্দ জারী করবেন, মৃত্যুদণ্ড দিবেন। এমন লোককে ক্ষমা করা কোন অবস্থাতেই জায়েয নয়। ইবনুল মুনযিরের মতে, এর উপর 'ইজমা' তথা সর্বসম্মত ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণের মতামতের উপর এটা নির্ভরশীল নয়।

পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি যদি পারস্পরিক শত্রুতা, দুশমনী অথবা অন্য কোন কারণে কাউকে হত্যা করে, এ ক্ষেত্রে তাকে প্রাণদণ্ড দান, ক্ষমা করা কিংবা রক্তমূল্য গ্রহণের অধিকার নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণের রয়েছে। কেননা বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশেষ কারণে এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে।

ফকীহ্ তথা ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞগণের ঐকমত্য হলো, ডাকাতদের সবাইকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। কেননা, এরা মালামাল লুণ্ঠন ও ছিনতাই করেছে। আর চোরের ন্যায় তারাও সমাজের জন্যে ব্যাপক ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। তাই হদ্দের ভিত্তিতে তাদেরকে প্রাণদণ্ড দিতে হবে।

নিহত ব্যক্তি যদি হত্যাকারীর 'কুফূ' তথা সমপর্যায়ের না হয় যেমন হত্যাকারী 'আযাদ' কিন্তু নিহত ব্যক্তি ভৃত্য বা দাস, হত্যাকারী মুসলমান আর নিহত ব্যক্তি অমুসলিম যিম্মী- অথবা মুসতামান (রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রাপ্ত), এমতাবস্থায় ঘাতক হওয়ার কারণে 'প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ'-নীতির ভিত্তিতে তাকে মৃত্যুদণ্ড দান অনিবার্য কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তবে প্রাণদণ্ড দানের পক্ষেই শক্তিশালী মত পরিলক্ষিত হয়। কেননা ব্যাপক বিপর্যয়ের আশংকায় হদ্দের ভিত্তিতে এহেন অপরাধীকে প্রাণদণ্ড দানই সমাজের জন্যে কল্যাণকর। যেমন মালামাল লুণ্ঠন বা ছিনতাইর কারণে হাত কাটা হয় এবং অপরের অধিকার বিনষ্ট করার দায়ে কারাদণ্ড দেয়া হয়।

প্রতিপক্ষ লড়াইকারী সংঘবদ্ধ দলটি যদি হারমাদ ও চোর চোট্টা ধরনের হয় আর তাদের মধ্য হতে মাত্র একজন হত্যাকাণ্ড ঘটায়, অবশিষ্টরা হয় তার সহযোগী, এমতাবস্থায় বলা হয়েছে, কেবল হত্যাকারীকেই প্রাণদণ্ড দিতে হবে। ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ অধিকাংশের মতে সংখ্যায় তারা যত বেশী হোক না কেন, তাদের সবাইকে হত্যা করতে হবে। খুলাফায়ে রাশেদীনের পক্ষ থেকেও একই মত বর্ণিত হয়েছে। হযরত উমর (রা) শত্রুপক্ষের সহযোগী পর্যবেক্ষণকারীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে ছিলেন। সে একটি উচ্চস্থানে বসে মুসলমানদের গতিবিধি লক্ষ্য করত এবং কাফিরদের নিকট তথ্য সরবরাহে লিপ্ত ছিল। কারণ, এ ধরনের লোকদের দেয়া তথ্য এবং সাহায্য পেয়েই হত্যাকারী হত্যাকাণ্ডে সফল হয়ে থাকে। কাজেই সওয়াব ও শাস্তির বেলায় এরা সম-অংশীদার। যেমন, মুজাহিদগণ সওয়াব ও গনীমতের মালে সবাই সমান অংশীদার হয়ে থাকে। মহানবী (সা) বলেছেন–

اَلْمُسْلِمُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَائُهُمْ وَيَسْعٰى بِذِمَّتِهِمْ اَدْنَاهُمْ وَهُمْ عَلٰى يَدٍ عَلٰى سِوَاهُمْ وَيَرُدُّ مُتَسَرِّيْهِمْ عَلٰى قَاعِدَتِهِمْ -

"মুসলমানের রক্ত সব সমমানের, তাদের একজন নগণ্য ব্যক্তির দায় দায়িত্বও পূর্ণ করা হবে। প্রতিপক্ষের তুলনায় এরা একক বাহুতুল্য। আর মুসলমানগণ কর্তৃক প্রেরিত ক্ষুদ্র বাহিনী যুদ্ধ জয়ের পর গনীমতের মাল প্রেরণ করলে তাতে প্রেরণকারী পশ্চাদবর্তী লোকরাও সম-অংশীদার হয়।"

এর সারমর্ম হলো, বিরাট মুসলিম বাহিনী কর্তৃক মুষ্ঠিমেয় সৈন্যের ক্ষুদ্র বাহিনী যদি কোথাও প্রেরিত হয়, তবে যুদ্ধ জয়ের পর তাদের অর্জিত গনীমতের মাল প্রেরণকারী পশ্চাদবর্তী গোটা বাহিনীসহ সবাই সমভাবে অংশীদার হবে। কেননা তাদের বলে এবং সহযোগিতায়ই এদের পক্ষে জয়লাভ করা সম্ভব হয়েছে। অবশ্য ক্ষুদ্র বাহিনীভুক্ত সৈন্যদেরকে হারাহারি অংশের বাইরে অতিরিক্ত কিছু দান করাটা স্বতন্ত্র কথা। মহানবী (সা)ও "সারিয়্যা" যুদ্ধে (যে যুদ্ধে হযরত সা. স্বয়ং শরীক হননি) তথা ক্ষুদ্র বাহিনীকে অতিরিক্ত দান করেছেন। প্রথমতঃ তিনি 'খুমুস" (এক পঞ্চমাংশ)-এর পরে এক চতুর্থাংশ দিয়েছেন। অতঃপর লোকেরা দেশে ফিরে এলাকা থেকে 'সারিয়্যা' প্রেরণ করলে, খুমুসের স্থানে তাদেরকে ছুলুছ অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশ দিয়েছিলেন।

অনুরূপভাবে সেনাবাহিনী যদি গনীমতের মাল হাসিল করে, তবে সারিয়্যাকেও তাতে শামিল করে নেয়া উচিত! কেননা সারিয়্যাও মুসলমানদেরই সেনাদল। বিশেষ প্রয়োজনে তাদেরকে পাঠানো হয়েছিল। বদর যুদ্ধে যেমন হযরত তালহা (রা) ও হযরত যুবায়ের (রা)কে দেয়া হয়েছিল। কারণ, জাতির কল্যাণে এবং সামরিক প্রয়োজনেই তাঁরা প্রেরিত হয়েছিলেন। কাজেই সাহায্যকারী হিসাবে অন্যান্যদের ন্যায় তারাও সমভাবে এর সুফল ভোগ করার অধিকারী।

বাতিল ও মিথ্যা যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের অবস্থাও একই, যেমন আঞ্চলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, গোত্রীয় দলাদলি এবং জাহিলী যুগের মূর্খতাসুলভ বিষয়কেন্দ্রিক পরস্পর যুদ্ধে অনেকে লিপ্ত হয়ে পড়তো। যেমন 'কয়েস' এবং 'য়ামনী' গোত্র দু'টি অন্যায় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। আর এতে তারা উভয়ই ছিল বাতিলপন্থী। মহানবী (সা) বলেছেন- اِذَا الْتَقَى بِسَيْفِهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ كِلاَهُمَا فِى النَّارِ۔। তলোয়ার নিয়ে দুই মুসলমান যদি পরস্পর খুনাখুনিতে লিপ্ত হয় এমতাবস্থায় হত্যাকারী ও নিহত উভয়েই জাহান্নামী হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

এতে উভয়পক্ষই একে অপরকে মনে প্রাণে ধ্বংস করতে প্রয়াস চালিয়েছে। হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি যদিও জানত না যে, কে মারবে কে মরবে। উভয়পক্ষই সাধ্য অনুযায়ী আত্মরক্ষায় সচেষ্ট ছিল; কিন্তু এরি মধ্যে একজন নিহত হয়ে যায়।

কিন্তু যদি হত্যা না করে শুধু ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে, যা (জাহিলী যুগের) আরবদের অধিকাংশের অভ্যাস ছিল, তাহলে প্রত্যেকের ডান হাত বাম পা কেটে দিতে হবে। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমদ প্রমুখসহ অধিকাংশ ইমাম এ মতের সমর্থনকারী। আর এর পক্ষে কুরআনেরও সমর্থন

রয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে– أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ ـ "অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত পা কেটে দিতে হবে।" (সূরা মায়েদা : ৩৩)

কারণ, হাতের সাহায্যে সে লুণ্ঠন কার্য সম্পন্ন করতো, পায়ের সাহায্যে সে পথে অগ্রসর হতো, তাই (সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও এই অপরাধ প্রবণতা সম্পূর্ণ নির্মূল করার স্বার্থে) এ দুটো অঙ্গ কাটার দণ্ড দিতে হবে। অতঃপর রক্ত বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ফুটন্ত যাইতুনের তেল বা অন্য উপায়ে দাগ দিতে হবে। * যাতে প্রাণে মারা না যায়। চোরের হাতও সে একই নিয়মে কাটতে হবে।

এভাবে হাত পা কাটার মধ্যে প্রাণদণ্ড অপেক্ষা সর্বাধিক ভীতিপ্রদ শাস্তি ও শাসন নিহিত রয়েছে। কেননা সমাজে চলা ফেরার সময় তার প্রতি দৃষ্টি পড়তেই পরস্পরের মধ্যে চর্চা হয়ে থাকে যে, এটা অমুক অপরাধের পরিণতি। তাতে জনমনে ভীতির সঞ্চার হয়। কুরআনে বলা হয়েছে– وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَّا أُولِي الْأَلْبَابِ ـ "হে জ্ঞানবানরা! 'কিসাস' তথা জানের বদলা জান, হাতের বদলা হাত এভাবে অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বদলা অনুরূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বদলার শাস্তির মধ্যে রয়েছে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা। এছাড়া প্রাণদণ্ডের পরিণতি অল্প দিনেই মানুষ ভুলে যেতে পারে। এজন্য কোন কোন লোক হাত পা কাটা পড়ার পরিবর্তে নিহত হওয়া বা মরে যাওয়াকেই অধিক পছন্দ করে থাকে। কাজেই বলা যায়, চোরের এ সাজা সত্যি বড় কার্যকর ও বড় শিক্ষণীয়।

অস্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বিরা অস্ত্র উন্মুক্ত করেছিল কিন্তু কাউকে আঘাত করেনি, সম্পদ লুণ্ঠন করেনি, বরং তলোয়ার কোষবদ্ধ করে ফেলে অথবা পালিয়ে যায় কিংবা লুটপাট ও সংঘর্ষ এড়িয়ে যায়। এমতাবস্থায় এদেরকে দেশান্তরিত করতে হবে। নির্বাসনের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তারা যেন কোন শহর বন্দর নগরের উপকণ্ঠে কিংবা কোন বস্তীতে দলবদ্ধভাবে একত্রিক হতে না পারে। আবার নির্বাসনের অর্থ কারো কারো মতে তাদেরকে কারারুদ্ধ করে রাখা। এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে কেউ বলেছেন, ইমাম আমীর বা হাকিম তথা রাষ্ট্রীয় ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষই তা ঠিক করবেন, নির্বাসন, কারারুদ্ধ অথবা অন্য কোন্ পন্থা সঠিক হবে, যেটা জাতির জন্য কল্যাণকর। দেশান্তর বা নির্বাসনের এটাই অর্থ।

শরীয়তের আইনে প্রমাণিত অপরাধীর প্রাণদণ্ড কার্যকর করার নিয়ম হলো তরবারি কিংবা অন্য কোন ধারালো অস্ত্র দ্বারা অপরাধীর প্রাণদণ্ড দান, যা সহজ পন্থা। মানুষের প্রাণদণ্ড এবং জীব জন্তু বধ করার খোদাই বিধান এটাই। সুতরাং মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন,

---

* টীকা– বর্তমানে রক্ত বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা হয়ে থাকে। এ উদ্দেশ্যে তৎকালীন সময় যাইতুনের তেল দ্বারা দাগ দেয়া হত।

اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْاِحْسَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُوْا الْقِتْلَةَ وَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلْيَحِدَّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهٗ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهٗ ـ (مسلم)

"আল্লাহ সকল জীবের প্রতি অনুগ্রহ ও দয়া করা 'ফরয' করেছেন। (রাষ্ট্রীয় বিচারে) তোমরা (প্রমাণিত অপরাধী) কে মৃত্যুদণ্ড দানে উত্তম পন্থায় তা কর, কোন প্রাণী জবাই করতে উত্তম নিয়মে জবাই কর। নিজেদের ছুরি চাকু শাণিত করে নিবে যাতে জবাইকৃত জীব দ্রুত শান্ত হয়।" (মুসলিম)

তিনি আরো বলেছেন– اِنَّ اَعْفَ النَّاسِ قِتْلَةً اَهْلُ الْاِيْمَانِ ـ "ঈমানদারগণই অপরাধীর প্রাণদণ্ড দানে অধিকতর শান্তিদায়ক।" (নিষ্ঠুরতামুক্ত) শূলে চড়ানোর নিয়ম হল উচ্চস্থানে লটকাতে হবে। যেন মানুষ প্রকাশ্যে দেখতে পায় এবং ব্যাপক হারে প্রচার হয়। 'জমহুর' (সর্বস্তরের) ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পর তাকে এভাবেই লটকাতে হবে। কারও কারও মতে অপরাধীকে শূলে চড়িয়ে প্রাণদণ্ড কার্যকর করতে হবে।

কোন কোন আইনজ্ঞ আলিম তরবারি ছাড়া আরও অন্য উপায়েও প্রাণদণ্ড কার্যকর করা জায়েয মনে করেন। হত্যাকৃত ব্যক্তির নাক কান কেটে 'মুছলা' করা আদৌ জায়েয নহে। অবশ্য মুসলমানদের সাথে তারা অনুরূপ আচরণ করলে, তারাও তাই করত। তবে এরূপ না করাটাই উত্তম মনে করা হতো। যেমন, মহান আল্লাহ ঈমানদারদের বলেন,

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَاعُوْقِبْتُمْ بِهٖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ ـ لِلصّٰبِرِيْنَ ـ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ـ (سورة نحل : ١٢٧-١٢٦)

"শত্রুদের সাথে কঠোরতার প্রয়োজন হলে সে পরিমাণ কঠোরতাই কর, যে পরিমাণ তোমাদের সাথে করা হয়েছে। আর যদি তোমরা ধৈর্য্য ধর, তবে ধৈর্য্যশীলদের জন্য সেটাই উত্তম। আর হে নবী! আপনি সবর করুন, অবশ্য আল্লাহর তৌফিক ব্যতীত সবর করা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়।" (সূরা নহল : ১২৬-১২৭)

বর্ণিত আছে, হযরত হামযা (রা) এবং উহুদের শহীদগণের সাথে কাফিরদের এহেন নৃশংস আচরণের প্রেক্ষিতেই উক্ত আয়াত নাযিল হয়। তাঁদের সাথে কৃত 'মুছলা'র দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ (সা) মর্মাহত হয়ে ইরশাদ করেন–

لَئِنْ اَظْفَرَ نِيَ اللّٰهُ بِهِمْ لَاُمَثِّلَنَّ بِضِعْفَىْ مَامَثَّلُوْا بِنَا ـ

"আল্লাহ্ যদি আমাকে জয়ী করেন তবে তারা আমাদের সাথে যে আচরণ করেছে এর দ্বিগুণ আমি 'মুছলা করে ছাড়াবো।" অতঃপর যদিও ইতিপূর্বে মক্কায় উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়, তবুও পুনরায় এ আয়াতটি নাযিল হয়।

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ - قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ.

"হে নবী! আপনাকে রূহ-এর রহস্য সম্পর্কে তারা জিজ্ঞেস করছে। আপনি বলে দিন– এটি আমার প্রতিপালকের একটি নির্দেশ।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ৮৫)

যেমন নিম্নের আয়াতটি দু'বার নাযিল হয়েছিল বলে রেওয়ায়াত আছে–

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. (سورة هود : ١١٤)

"হে রাসূল! সকাল সন্ধ্যা দিনের উভয়াংশে এবং রাতের প্রথমাংশে নামায আদায় করুন। সৎ কাজ অবশ্যই গুনাহসমূহকে মিটিয়ে দেয়।" (সূরা হূদ : ১১৪) তদ্রূপ সূরা নাহলের আয়াতটি প্রথমে মক্কায় এবং পুনরায় মদীনায় নাযিল হয়। অর্থাৎ দু'বার নাযিল হয়।

যুদ্ধক্ষেত্রে জুলুম থেকে বিরত থাকার জন্যে রাসূলুল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর হুযূর (সা) বলেন, بَلْ نَصْبِرُ "আমরা বরং সবরই করবো।" হযরত বরূদা ইবনুল হাসীব (রা)-এর সূত্রে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন : মহানবী (সা) যখনই কোন ব্যক্তিকে 'সারিয়্যা' তথা ছোট বানিহী কিংবা বিরাট বাহিনীর আমীর (নেতা) নিযুক্ত করে প্রেরণ করতেন, তখন তাঁকে ও সঙ্গীদেরকে বিশেষ নসীহত এবং খোদাভীতির হেদায়েত দানের পর বলতেন–

اُغْزُوْا بِسْمِ اللّٰهِ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - قَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ لاَتَغُلُّوْا وَلاَ تَغْدِرُوْا وَلاَتَمْثُلُوْا وَلاَتَقْتُلُوْا وَلِيْدًا.

"আল্লাহর নাম নিয়ে জিহাদ কর, আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর, যারা আল্লাহ্‌র সাথে কুফরীবশতঃ ন্যায়-সত্য পথের যাত্রীদের প্রতিরোধ করে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর। তবে সীমা অতিক্রম করবে না, বিশ্বাসঘাতকতা ও 'মুছলা' করবে না। আর শিশুদের হত্যা করবে না।"[১] (মুসলিম)

১: এই ছিল মহানবীর ন্যায় ও মানবিক মূল্যবোধ সমৃদ্ধ সমরনীতি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যার ফলে আরব জাহানসহ অর্ধ শতাব্দীর মত সময়ের এ ক্ষুদ্র পরিসরে অর্ধেক বিশ্ব ইসলামের ছায়াতলে এসে যায়, সর্বত্র ইসলামের পতাকা উড়তে থাকে। তৎকালীন আরবে গোত্রবাদ, স্বজনপ্রীতি, আঞ্চলিকতা ইত্যাদি কুসংস্কার প্রথা এত প্রবল ছিল, যা বিশ্বের অন্য কোথাও

ধন সম্পদ লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে কাফিররা যদি মুসলিম জনপদ অভিমুখে অস্ত্র সজ্জিত অবস্থায় এগিয়ে আসে তখন তাদেরকে 'মুহারিব' তথা যুদ্ধ ঘোষণাকারী আগ্রাসী বলা হবে কিনা? এ সম্পর্কে দ্বিমত রয়েছে। কারো কারো মতে তাদেরকে 'মুহারিব' আগ্রাসী বলা যাবে না, বরং তারা সমাজ বিরোধী ডাকাত, গুণ্ডা পর্যায়ের লোক। যাদের বিরুদ্ধে সাহায্য চাওয়া হলে নগর-জনপদবাসীরা এমনিতেই দৌড়ে আসে। অধিকাংশের মতে বিরাট জনপদ আর জনশূন্য মরু ময়দানের একই হুকুম। ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমদের অধিকাংশ শিষ্য এবং

দৃষ্টিগোচর হত না। প্রত্যেক গোত্রের দেবতা ছিল স্বতন্ত্র। গোত্রপ্রীতির মুকাবিলায় ন্যায়-নীতি এমনকি মানবতা পর্যন্ত ছিল উপেক্ষিত। স্বগোত্রীয়ের অন্যায় অপরাধ যত মারাত্মকই হোক অন্য গোত্রের মুকাবিলায় কোন অপরাধ হিসেবে গণ্য হত না বা এর কোন শাস্তি কিংবা প্রতিকারও ছিল না। যার ফলে তৎকালীন বৃহৎ শক্তি পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের পক্ষে এখানে স্থায়ী প্রভুত্ব কায়েম করা সম্ভব হয়নি। অপরপক্ষে দেশীয় বিচ্ছিন্ন গোত্রগুলোকে ঐক্য সূত্রে আবদ্ধ করে কোন একক শক্তির অধীনে রাষ্ট্র গঠন করাও কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। বস্তুত গোত্রবাদের বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণাই ছিল আরবদের ঐক্যের মূল অন্তরায়। সেই ভয়াবহ গোত্রবাদের একটি চিত্রই পবিত্র কুরআন মহানবী (সা)কে সম্বোধনের মধ্যদিয়ে তুলে ধরেছে।

لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ
ـ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ. (سورة انفال)

ইরশাদ হচ্ছে- "সারা বিশ্বের সকল ধনভাণ্ডার ব্যয় করলেও আপনি তাদের অন্তরে ঐক্য ও সম্প্রীতির ভাব সৃষ্টি করতে পারবেন না, কিন্তু একমাত্র আল্লাহই তাদের হৃদয়ে সৌহার্দানুরাগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তিনি প্রবল পরাক্রমশালী এবং প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আনফাল)

প্রকৃতপক্ষে সমকালীন বিশ্বে গোত্রবাদী ধ্যান-ধারণা একমাত্র আরব ভূখণ্ডেই আক্ষরিক অর্থে কার্যকর ছিল, যার ফলে এ অঞ্চল কখনো পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যে বিলীন হয়নি। আর হলেও তা ছিল সাময়িক ব্যাপার। তাই কোন বৃহৎ শক্তি এতদঞ্চলে পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়নি। অপরপক্ষে তারা নিজেরাও কোন স্বাধীন শক্তিশালী সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম দিতে পারেনি। মহানবী (সা) বাল্যকাল থেকেই জনগণের মধ্যে 'আল আমীন' বিশেষণে খ্যাতিমান ছিলেন। এটা ছিল তাঁকে দেয়া জনগণের সর্বসম্মত উপাধি। সকলের প্রতিই ছিল তাঁর অভিন্ন আচরণ। মদীনায় হিজরতের পর মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর উপর খিলাফতের দায়িত্ব অর্পিত হয়। মাত্র ৪/৫ বছরের ব্যবধানে পরস্পর বিচ্ছিন্ন গোত্রগুলোকে তিনি ঐক্যের প্রীতিডোরে আবদ্ধ করতে সক্ষম হন এবং তাঁর মহান নেতৃত্বে জাহিলী যুগের গোত্রবাদের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে গোটা সমাজ সকল গোত্র এক দেহে এক আত্মায় বিলীন হয়ে যায়। এ ঐক্য-শৃংখলা বলেই রোম পারস্য সাম্রাজ্য ইসলামী আধিপত্যের সামনে লুটিয়ে পড়তে বাধ্য হয়।

এখানে বিশেষ লক্ষণীয় যে, উহুদের ময়দানে হযরত হামযার শহীদী লাশে কাফিরদের কৃত 'মুছলার' লোমহর্ষক দৃশ্য লক্ষ্য করে ব্যথিত প্রাণে মহানবীর যবান মুবারক থেকে বেরিয়ে আসে- "সুযোগ পেলে আমরাও অনুরূপ আচরণ করবো" এরি প্রেক্ষিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে সম্বোধন করে বলা হয়-

ইমাম আবু হানীফার কোন কোন শিষ্য-শাগরিদ এ মতের সমর্থক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জনশূন্য মাঠ-ময়দানে ডাকাতি লুটপাট করার তুলনায় শহরে বন্দরে এ জাতীয় দুষ্কৃতির কঠোর সাজা হওয়া বাঞ্ছনীয়। এজন্য যে, শহরে জনপদ অধিকতর নিরাপদ হয়ে থাকে। পরস্পর একে অপরের সাহায্যে দ্রুত এগিয় আসা সহজ। কাজেই এরূপ স্থলে ডাকাতি লুটপাটের পদক্ষেপ নেয়া শক্তিশালী দলের পক্ষেই সম্ভব। আর শক্তি সাহস আছে বলেই এরা নাগরিকদের বাসগৃহে প্রবেশ করে জোরপূর্বক তাদের ধন-সম্পদ, মালামাল হাতিয়ে নেয়ার দুঃসাহসী প্রয়াস চালায়। পক্ষান্তরে, পথিক মুসাফিরদের সঙ্গে মালামাল অল্পই থাকে। কাজেই সামান্য শক্তিতে এদের প্রতি আঘাত হানা সহজ। এদের সম্পর্কে এ মতই বিশুদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত।

এরা যদি লাঠি-সোটা, পাথর দ্বারা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তবে এদেরকেও 'মুহারিব' বলা হবে। এ ব্যাপারে ফকীহদের এ অভিমত বর্ণিত আছে–

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَاعُوْقِبْتُمْ بِهٖ ـ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِيْنَ وَاصْبِرْ وَمَاصَبْرُكَ اِلاَّ بِاللهِ ـ (سورة نحل : ١٢٧-١٢٦)

"হে মুসলমানগণ! শত্রুদের সাথে কঠোরতার প্রয়োজন হলে, সে পরিমাণ কঠোরতাই অবলম্বন কর, যা তোমাদের সাথে করা হয়েছে, কিন্তু যদি তোমরা ধৈর্য ধর, তবে ধৈর্যশীলদের জন্য সেটাই উত্তম। আর হে নবী! আপনি সবর করুন, কিন্তু আল্লাহ্‌র তৌফিক ব্যতীত সবর করা আপনার পক্ষে সম্ভবই নয়। (সূরা নাহল : ১২৬-১২৭) তখন তিনি বলেন– بَلْ نَصْبِرُ "অবশ্যই আমরা ধৈর্য ধারণ করবো।"

একমাত্র নৈতিক চরিত্রের ভিত্তিতেই তিনি ৪/৫ বছরের মধ্যে গোটা আরব উপদ্বীপে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে সক্ষম হন। কিন্তু আল্লাহর নির্ধারিত হদ্দের বেলায় তিনি কারো রেয়াত করেননি। তিনি আক্ষরিক অর্থেই আচার ব্যবহারে, বলিষ্ঠ নীতি, সাহসিকতা, দূরদর্শিতা, উদার ও মহৎ প্রাণের পরিচয় দেন। উপরন্তু তিনি অনুগ্রহ ও করুণার বর্ষণে হিংসা-দ্বেষ, বিদ্রোহ ও যাবতীয় অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিশোধ নিয়েছেন। অত্যাচারের মাত্রা যতই বেড়েছে প্রতিদানে তাঁর অনুগ্রহের হাত অধিক সম্প্রসারিত হয়েছে। কুরআনের উদ্দেশ্য ও মর্ম তিনি বাস্তবায়িত করেছেন পূর্ণ মাত্রায়, পরম নিষ্ঠার সাথে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَلاَتَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ـ وَمَايُلَقّٰهَا اِلاَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَايُلَقّٰهَا اِلاَّ ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ. (سورة حم السجدة : ٣٥-٣٥)

"হে নবী! সৎ-অসৎ ভাল-মন্দ সমান হতে পারে না, উত্তম পন্থায় মন্দের প্রতিকার কর। যদি এরূপ কর তবে, পরম শত্রুও তোমার প্রাণের বন্ধুতে পরিণত হবে। আর ধৈর্যশীলদেরকেই কেবল উত্তমাচরণের সুযোগ দেয়া হয় আর সুযোগ দেয়া হয় সেসব লোককে যারা মহা ভাগ্যবান।" (সূরা হা-মীম আস সাজদা : ৩৪-৩৫)

لامحاربة الا بالحدود "সংঘর্ষ কেবল ধারালো অস্ত্র দ্বারাই হতে পারে।" কেউ কেউ এর উপর আলিমগণের 'ইজমা' (সর্বসম্মত ঐকমত্য) বর্ণনা করেছেন যে, ধারালো এবং ভারী অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা সংঘটিত সংঘর্ষকে 'মুহারাবা' বলা হয়। অতঃপর এ সম্পর্কে মতভেদ থাকুক, চাই না থাকুক বিশুদ্ধ মত সেটিই, যার উপর মুসলমানদের ইজমা বা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত। আর তা হলো, যে ব্যক্তি ধন সম্পদ লুণ্ঠন করার উদ্দেশ্যে হত্যা ও লুটপাটের আশ্রয় নেয়, এমতাবস্থায় যেভাবেই ঐ ব্যক্তি সংঘর্ষ বাধাক না কেন, সে 'মুহারিব', ডাকাত, লুণ্ঠনকারী ইত্যাদি অভিধায় আখ্যায়িত হওয়ারযোগ্য। যেমন, মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কাফিরকে 'হরবী' বলা হয়। এখন সে যেভাবেই যুদ্ধ করুক, তরবারী, বর্শা, পাথর ইত্যাদি যাই সে ব্যবহার করুক না কেন, 'হরবী' নামেই তাকে অভিহিত করা হবে আর প্রতিপক্ষ মুসলমানদের বলা হবে 'আল্লাহ্‌র পথের মুজাহিদ'।

আরো ইরশাদ হয়েছে–

أُولٰئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ. (سورة القصص : ٥٤)

"এরাই সে লোক, সবরের প্রতিদানে যাদেরকে দ্বিগুন সওয়াব দেয়া হবে, (তাওরাত, কুরআনে ঈমান আনার কারণে) আর যারা সত্যের দ্বারা অসত্যের প্রতিরোধ করে থাকে এবং আমার দেয়া ধন-সম্পদ আমারই পথে ব্যয় করে।" (সূরা কাসাস : ৫৪)

মহানবী (সা) এর জীবনাদর্শ প্রণিধানযোগ্য যে, নিজ গোত্র আপনজনেরা তাঁর উপর নানাবিধ নির্যাতন চালাচ্ছে, কষ্ট দিচ্ছে, অন্যায় আক্রমণে পবিত্র দেহ মোবারক রক্তাক্ত করে ফেলেছে কিন্তু ঐ অবস্থায় তাঁর বরকতময় যবান থেকে বদদু'আর পরিবর্তে নেক দু'আ বেরিয়ে আসছে। অকথ্য নির্যাতনের পর তাঁর মুখ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ.

"হে আল্লাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা করুন। কেননা তারা বুঝে না।"

বস্তুতঃ এহেন ভাষায়ই নবীর মুখ থেকে নিঃসৃত হওয়ারযোগ্য। তাই বিবেকবানদের জন্য এতে চিন্তার খোরাক রয়েছে। 'ইহসান' তথা মহানুভবতা ও অনুগ্রহের চারটি স্তর রয়েছে যা দ্বারা কওমের অন্যায় অত্যাচারের মুকাবিলা করা যায়। (১) ক্ষমা ও মার্জনা, (২) তাদের জন্য ইসতিগফার তথা তাদের অপরাধ মার্জনার জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করা, (৩) কওমের অন্যায় অত্যাচারের কারণে আল্লাহর নিকট তাঁর ফরিয়াদ– তারা বুঝতে পারেনি বলেই তাদের এই আচরণ, অন্যথায় তারা এরূপ করত না, (৪) কওমের প্রতি তিনি এতই সদয় যে, এই বলে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ আকর্ষণ করেছেন যে, হে আল্লাহ! এরা আমারই গোত্রীয় স্বজন। কোন ব্যক্তি যেরূপ স্বীয়পুত্র গোলাম কিংবা কোন বন্ধুর পক্ষে বলে থাকে– এ আমার পুত্র, গোলাম অথবা বন্ধু, এর একাজটি করে দিন, আবেদন গ্রহণ করুন। চিন্তার বিষয়, কারো প্রিয়পাত্র যদি তার আপন জনের জন্য এমনি ভাষায় ফরিয়াদ জানায়, তাহলে ওদের ওপর তার কি পরিমাণ প্রভাব পড়বে? এই হল নবীর উন্নত চরিত্র মু'জিযা, নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের নমুনা যা বিশ্বকে অভিভূত ও আলোড়িত করেছে। সকলকে তিনি আপন গুণে মুগ্ধ করেছেন।

সম্পদ হরণের উদ্দেশ্যে যারা গোপনে হত্যা করে, যেমন পথিপাশের উল্লেখযোগ্য স্থানে দোকান, মুসাফিরখানা, আবাসিক হোটেল ইত্যাদি বানিয়ে তথায় প্রবাসীদের আশ্রয় দেয়। আর কোন পথ যাত্রী (বিদেশী) হাতের নাগালে পেলে তাকে হত্যা করে তার সর্বস্ব লুটে নেয়। আবার কেউ কেউ দর্জি, ডাক্তার, কবিরাজকে ফিস দিয়ে বাড়িতে ডেকে নিয়ে ধোকায় ফেলে হত্যা করে তার সর্বস্ব লুটে নেয়। এভাবে সম্পদ লুণ্ঠন করার পর তাকে 'মুহারিব' বলা হবে কি না, তার উপর হদ্দ জারী হবে কিনা? এ সম্পর্কে ফকীহদের দু'ধরনের মত লক্ষ্য করা যায়। (১) সে মুহারিবের অন্তর্ভুক্ত। কেননা প্রকাশ্য বা ধোকায় ফেলে উভয় প্রকারের হত্যা একই পর্যায়ভুক্ত। উভয় অবস্থাতেই প্রাণ বাঁচানো দায়। বরং প্রকাশ্য হত্যার তুলনায় ষড়যন্ত্রমূলক হত্যা অধিক বিপদজনক। কেননা প্রকাশ্য হত্যা থেকে আত্মরক্ষা হয়তো সম্ভব কিন্তু গোপন হত্যা থেকে প্রাণ রক্ষা করা অধিকতর কঠিন। (২) প্রকাশ্যে হত্যাকারীই আদতে 'মুহারিব'। অধিকন্তু ধোকায় ফেলে হত্যাকারীর

অতঃপর পূর্ণ শান-শওকতের সাথেই মক্কা বিজয় হয়। আর বিজয়ীর বেশে তথায় তিনি প্রবেশ করেন। বিজিত কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে সে নবীরই দরবারে পেশ করা হয়, যাদের অত্যাচারে তিনি জর্জরিত, এমনকি দেশ ছাড়া হন।

বন্দীদের মধ্যে সে ব্যক্তিও রয়েছে, যে নামাযে সিজদারত নবীর পিঠে উটের ভুঁড়ি তুলে দিয়েছিল, হিজরত করে আবিসিনীয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর নিকট আশ্রয় গ্রহণকারী মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের পক্ষ থেকে যেসব কর্মকর্তা আবিসিনিয়া গমন করেছিল, তারাও আজ হাজির। কালিমা তাওহীদের ওয়াজ করার কারণে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) কে আঘাতের চোটে জখমকারী এবং দারুন্নাদওয়ার মিলনায়তনে এক পরামর্শ সভায় মহানবীকে (সা) হত্যার প্রস্তাবকারী ও হত্যার চুক্তিনামায় শরীক ব্যক্তি তিনবছর ব্যাপী মহানবীকে (সা) "শাবে আবূ তালিবে" নযরবন্দী করে রাখার নায়করা, প্রিয় জন্মভূমি মক্কা ত্যাগে বাধ্যকারী জালিমরা, বদর, উহুদ ও খন্দক যুদ্ধে যোগদানকারী কাফিররা, হযরত হামজার ঘাতক 'মুছলা'কারী পাপিষ্ঠ, নবীর বিরুদ্ধে আরব গোত্রসমূহকে উস্কানী দানকারী এবং ইসলাম ও নবীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের হোতারা মোটকথা হযরতের প্রাণের শত্রুরা আজ বন্দী অবস্থায় মহানবীর দরবারে যুদ্ধ অপরাধী হিসাবে নতশিরে উপস্থিত, অথচ বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করা সত্ত্বেও মহানবী (সা)-এর কণ্ঠে এসব হত্যাযোগ্য অপরাধীদের সম্পর্কে তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে–

مَنْ دَخَلَ دَارَ اَبِىْ سُفْيَانَ فَهُوَ اٰمِنٌ وَمَنْ اَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ فَهُوَ اٰمِنٌ وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ اٰمِنٌ ـ

"যে ব্যক্তি আবূ সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ, যে ব্যক্তি নিজ গৃহের দরজা বন্ধ করে দিবে এবং যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে এদেরকেও নিরাপত্তা দেয়া হলো।"

অতঃপর কা'বা শরীফের দরজায় দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা দিলেন–

ব্যাপারটি নিহতের ওয়ারিশদের অধিকারভুক্ত বিষয়। তবে প্রথম মতটি শরীয়তের নীতি মালার সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল। কেননা, মুহারিবের তুলনায় এর মধ্যে ক্ষতির আশংকা অধিক পরিমাণে বিদ্যমান।

কোন ব্যক্তি রাষ্ট্র নায়ক হত্যা করলে তার হুকুম কি? এ বিষয়ে ফকীহগণের মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। যেমন হযরত উসমান (রা), হযরত আলী (রা)কে শহীদ করা হয়েছে। এখন এদের হত্যাকারী কি মুহারিব? তাদের উপর হদ্দ জারী হবে? নাকি মামলার ভার ওয়ারিশদের হাতে ন্যস্ত করা হবে– এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আহমদ থেকে এ বিষয়ে দু'ধরনের মত বর্ণিত রয়েছে। এক মতে মুহারিব। কারণ, রাষ্ট্রের এ ধরনের শীর্ষ পর্যায়ের লোকের হত্যা সমাজে বিশৃংখলা বিপর্যয়ের প্রবল আশংকা রয়েছে।

لَاإِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهَ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ - اَلاَ كُلُّ مَاثِرٍ اَوْ دَمٍ وَمَالٍ يُدْعٰى بِهٖ فَهُوَ تَحْتَ قَدَمَىَّ هَاتَيْنِ اِلاَّ سَدَانَةَ الْبَيْتِ وَسِقَايَةَ الْحَاجِّ -

"আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই, তিনি একক, যাঁর কোনো শরীক নাই, নিজের ওয়াদা তিনি সত্যে পরিণত করেছেন, স্বীয় বান্দাকে তিনি সাহায্য করেছেন আর একাই তিনি সকল গোত্রকে পরাজিত করেছেন। হুশিয়ার! সকল রক্তমূল্য অথবা খুন কিংবা দাবীযোগ্য সম্পদ আমার এ দু'পায়ের নীচে (দাবিয়ে দেয়া হল)। তবে বায়তুল্লাহর চাবি রক্ষণ এবং হাজীদের পানি পান করানোর খিদমতের দায়িত্ব সাবেক ব্যক্তিদের কাছেই।"

অতঃপর অতি গম্ভীর স্বরে মক্কার কুরাইশদেরকে সম্বোধন করে মহানবী ঘোষণা করলেন–

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ مَاتَظُنُّوْنَ اِنِّىْ فَاعِلٌ بِكُمْ؟

"হে কুরাইশগণ! আমার থেকে তোমরা আজ কি ধরনের ব্যবহার প্রত্যাশা করো?

জবাবে কুরাইশরা বলল– উত্তম, কারণ আপনি আমাদের দয়ালু ভাই এবং সম্ভ্রান্ত ভ্রাতুষ্পুত্র। তাদের জবাবে মহানবী (সা) তাঁর ঐতিহাসিক ঘোষণায় বললেন, اِذْهَبُوْا فَاَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ - "যাও তোমরা সবাই আজ মুক্ত– স্বাধীন।" তাঁর এ দয়া ও অনুগ্রহ মানব জাতির গৌরবের বিষয়। তাদের সে অতীত দুষ্কর্মের প্রতিশোধ তিনি কিভাবে গ্রহণ করেছেন।

এই হল মহানবীর দয়া অনুগ্রহ, ইসলামী খিলাফতের অগ্রনায়কের খোদাভীতি, যা মানব জাতির জন্য উত্তম আদর্শ ও চিরস্থায়ী মুক্তি সনদ।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ -

[বার]

সরকার বা রাষ্ট্র প্রধান হত্যাকারীদের শাস্তি প্রসঙ্গ

সুলতান বা খলীফাকে হত্যাকারী মুহারিব, তার উপর হদ্দ জারী করা হবে না কি নিষ্পত্তির ভার ওয়ারিশদের হাতে ন্যস্ত করা হবে, পরবর্তী রাষ্ট্রপতি কিংবা তাঁর প্রতিনিধি যদি হত্যাকারীকে তলব করে, কিন্তু গোত্রীয় বা দলীয় লোকেরা তার সাহায্যে এগিয়ে আসে আর সংঘর্ষের জন্য তারা প্রস্তুত হতে থাকে, এমতাবস্থায় ইসলামী আইনবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, হত্যাকারী ও তার সহযোগী পক্ষালম্বনকারীদের পরাজিত ও গ্রেফতার না করা পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ করা মুসলমানদের উপর ফরয।

সুলতান, নায়েবে সুলতান, রাষ্ট্রপতি, সরকার প্রধান অথবা হাকিম, রাষ্ট্রপ্রধান হত্যাকারীর উপর ন্যায় নীতির অধীন হদ্দ জারী করার উদ্দেশ্যে তাকে যদি আদালতে তলব করেন, সে সময় হত্যাকারীর সমর্থনকারীরা সংঘর্ষে লিপ্ত হতে প্রস্তুতি নিলে, এমতাবস্থায়' তাদের বিরুদ্ধে (সরকারী বাহিনীর সমর্থনে) জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া সকল মুসলমানের উপর ফরয। যতক্ষণ পর্যন্ত না এরা পরাস্ত হয়, লড়াই অব্যাহত রাখবে। এ ব্যাপারে সর্বস্তরের ইসলামী আইনবিদগণ অভিন্ন মত পোষণ করেন। মৃত্যুদণ্ড ছাড়া এরা বশ্যতা স্বীকার না করলে যেভাবে সম্ভব এদেরকে দমন করতেই হবে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে হত্যাকারীর সমর্থনকারীগণসহ ব্যাপক হারে এসব বিদ্রোহীকে প্রাণদণ্ড দিতে হবে। কেননা সেটা ছিল হদ্দ জারী করার প্রশ্ন আর এটা হল ইসলামের বিরুদ্ধে মুকাবিলা। কাজেই এটা রীতিমত জিহাদ বিধায় এর গুরুত্ব অধিক। সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করে দলবদ্ধ হয়ে এরা ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে, ক্ষেতের ফসল ধ্বংস ও প্রাণহানি ঘটিয়ে সমাজ বিধ্বংসী কার্যে এরা লিপ্ত। দ্বীন কায়েম করা কিংবা দেশের খিদমত করা এদের উদ্দেশ্য নয়। এরা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত লোকদেরই সমপর্যায়ের, যারা দুর্গ, শৈলচূড়া কিংবা উপত্যকায় পার্টি করে পথিকদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে, অন্যায় হত্যাকাণ্ড চালায়। বাদশাহ বা হাকিম, শাসনকর্তা অথবা সৈন্যবাহিনী যদি তাদের আনুগত্যের আহ্বান জানায় এবং তওবা করতে, ক্ষমা চাইতে, মুসলমানদের দলভুক্ত হতে ও হদ্দ জারীর উদ্দেশ্যে তাদের বলে, জবাবে তারা যুদ্ধ শুরু করে দেয়। আত্মরক্ষার পদক্ষেপ নেয়। তাদের অবস্থা হজ্জযাত্রী এবং পথচারীদের মালামাল লুণ্ঠনকারীদের ন্যায় অথবা পাহাড়ের টিলায় ওঁৎ পেতে বসে

থাকা দস্যু-ডাকাতদের অনুরূপ কিংবা ছিনতাইকারী ব্যক্তিদের ন্যায় অপর দেশগামী যাত্রীদের উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও এদের সাথে মুকাবিলা আর কাফিরদের সাথে মুকাবিলা এক কথা নয়। কেননা এরা কাফির নয়। এরা পরস্ব লুণ্ঠন করার পূর্বে এদের সম্পদ লুট করা বৈধ নয়। আর তারা যদি লুণ্ঠন করেও, তবে তাদের কাছ থেকে সমপরিমাণ ক্ষতি পূরণ আদায় করতে হবে, যদি লুণ্ঠনকারীকে চিহ্নিত করা সম্ভব না হয়। কিন্তু যদি প্রকৃত লুণ্ঠনকারী চিহ্নিত হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে লুণ্ঠনকারী ও তার সাহায্যকারী সবাই সমপর্যায়ের অপরাধী যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। সুতরাং লুণ্ঠনকারী নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হওয়া সাপেক্ষে লুটকৃত মালের সমপরিমাণ মাল জরিমানাস্বরূপ তার কাছ থেকে আদায় করা হবে। অন্যথায় তার স্বগোত্রীয় বিত্তবানদের উপর তার দায়িত্ব বর্তাবে। কিন্তু তাদের থেকে যদি জরিমানার অর্থ আদায় করা কঠিন হয়, তবে জাতির স্বার্থে তাদের সঙ্গে যুদ্ধরত সৈনিকদের মাসিক বেতন ধার্য করে দিতে হবে। কেননা এ যুদ্ধ ইকামতে হদ্দ এবং সামাজিক বিপর্যয় রোধ করার লক্ষ্যে করা হচ্ছে। ইসলাম ও গণদুশমনদের কেউ গুরুতর জখমী হলে তার চিকিৎসার দায়িত্ব তাদের। মরে তো বিনা ঔষধে মরুক। এরা পালিয়ে গেলে জননিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা না থাকলে পশ্চাদ্ধাবন করার প্রয়োজন নেই। অবশ্য যদি কারো উপর হদ্দ জারী করা ওয়াজিব হয় অথবা জনগণের নিরাপত্তা হুমকীর সম্মুখীন হওয়ার আশংকা দেখা দেয় তবে, তাদের পশ্চাদ্ধাবন করা অপরিহার্য।

এদের মধ্যে যারা বন্দী হয়ে আসে, অন্যদের ন্যায় তাদের উপর হদ্দ জারী করতে হবে। কোন কোন ফকীহ্ আরো কঠোর নীতি অবলম্বনের পক্ষপাতি যে, এদের থেকে গনীমতের মাল আদায় করে তা থেকে খুমুস বা পঞ্চমাংশ পৃথক করা বিধেয়। কিন্তু অধিকাংশ ফকীহ্ এ মতের বিরোধী। কিন্তু তারা যদি ইসলামী রাষ্ট্রের বাইরে অন্য কোন দেশে আশ্রয় নেয় আর সেখানে বসে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সক্রিয় চক্রান্তে অংশ নেয়, তাহলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের অপরাধে তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে।

একদল লোক ডাকাতি রাহাজানী তো করে না কিন্তু কাফিলার পাহারাদারী ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিনিময়ে পথচারী মুসাফিরদের কাছ থেকে জনপ্রতি ও উট ইত্যাদি পশুর মাথাপিছু নির্দিষ্ট হারে অর্থ আদায় করে থাকে, এটা শুল্কের পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং তাদেরকে অন্যায় শুল্ক উসূলকারীদের ন্যায় শাস্তি দিতে হবে। এ জাতীয় অপরাধীদের হত্যার ব্যাপারে ইসলামী আইনবিদদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। কেননা এরা ডাকাত ও রাহ্যন ছিনতাইকারী নয়, অথচ এদের ছাড়াও

রাস্তা যাতায়াত পথ নিরাপদ থাকে। এরা- اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (কিয়ামতের দিন কঠোর সাজা প্রাপ্ত হবে।)

নবী করীম (সা) জনৈকা গামেদিয়া মহিলা সম্পর্কে বলেছেন–

لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ -

"সে এমন তওবাই করেছে যদি জঙ্গী কর আদায়কারীরা এরূপ তওবা করতো তবে তারাও ক্ষমা পেয়ে যেতো।"

আর যাদের মাল-সম্পদ উদ্ধারে মুসলিম বাহিনী মুহারিবদের সাথে যুদ্ধরত তাদের জন্য অর্থ ব্যয় আদৌ করা যাবে না, যতক্ষণ যুদ্ধ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়। মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন–

مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ - وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ - وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دِيْنِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ حُرْمَتِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ -

"মালের হিফাজতে যে ব্যক্তি নিহত হয় সে শহীদ, যে ব্যক্তি প্রাণ রক্ষার্থে নিহত হয় সে শহীদ, যে ব্যক্তি দ্বীন রক্ষার্থে নিহিত হয় সে শহীদ, আর যে ব্যক্তি নিজ পরিবারের মান-সম্ভ্রম রক্ষা করতে গিয়ে কতল হয়, সেও শহীদ।"

ফকীহ্গণ এক্ষেত্রে الصائل। শব্দটি ব্যবহার করেছেন যার অর্থ হলো, তাবীল বা রাষ্ট্রীয় শক্তি ছাড়া জুলুমকারী।

যুদ্ধ ছাড়া এদের দমন করা সম্ভব না হলে অগত্যা যুদ্ধেরই আশ্রয় নিতে হবে। কিন্তু সংঘর্ষে না জড়িয়ে সংশোধনকল্পে কিছু অর্থ ব্যয়ে যদি এদের এই খারাপ পথ থেকে ফেরানো যায়, তবে এটাও জায়েয।

কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য যদি হয় কারো সম্মানে আঘাত করা, কারো মা-বোন, স্ত্রী-কন্যা ইত্যাদির সম্ভ্রম বিনষ্ট করা অথবা কোন মহিলা কিংবা বালকের সাথে কুকর্ম করা, তবে প্রাণ-সম্পদ সব দিয়ে হলেও এদের মুকাবিলা করতে হবে। এমনকি প্রয়োজন হলে এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করতে হবে। অর্থাৎ, কোন অবস্থাতেই এ ধরনের পাপাচারের সুযোগ দেয়া যাবে না। কিন্তু যদি অর্থের বিনিময়ে উদ্দেশ্য সফল করা যায়, তবে সেটা জায়েয। তবুও নিজের কিংবা মহিলাদের সম্ভ্রম নষ্টের বিষয়টি সহ্য করা যাবে না।

আর যদি তার উদ্দেশ্য হয় কাউকে হত্যা করা, তবে তো প্রাণ রক্ষা অবশ্যই জরুরী এবং আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

এ সম্পর্কে উলামা, ইমাম আহমদ এবং অন্যান্যদের মযহাবে দু'ধরনের মতামত পরিলক্ষিত হয়। এটা দেশের সুলতান বা শাসনকর্তা বিদ্যমান থাকাকালীন সামরিক ব্যবস্থা মাত্র। কিন্তু "আল্লাহ না করুন" যদি দু'জন শাসনকর্তার ক্ষমতার লড়াইয়ের কারণে দেশে বিরাট ফিৎনার সৃষ্টি হয়, এমন অবস্থায় কোনো পক্ষে যোগদান না করে জনগণের উচিত নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা। এ সম্পর্কে ইমাম আহমদসহ অন্যান্য মযহাবে দু'ধরনের মত রয়েছে।

বাদশাহ চোর, গুণ্ডা, ডাকাত, লুটেরাদেরকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হলে লুণ্ঠিত মালামাল এদের থেকে উসূল করে প্রকৃত মালিককে তা ফেরত দিতে হবে এবং এদের উপর হদ্দ জারী করতে হবে। চোরের বেলায়ও একই হুকুম। সঠিক প্রমাণ পাওয়া গেলে প্রয়োজনে প্রহার করে সাজা দিয়ে এদের থেকে চোরাই মাল উদ্ধার করে মালিককে ফেরত দেবে এবং এদেরকে জেলখানায় বন্দী করে রাখবে। অতঃপর এরা উকিল দ্বারা লুণ্ঠিত মাল হাজির করবে অথবা মাল কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে সন্ধান দেবে। পাওনাদারদের প্রাপ্য আদায় না করাতে যেরূপ শাস্তি দেয়া হয়, এদের বেলায়ও একই শাস্তি দিতে হবে। অনুরূপভাবে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের হক আদায় করতে অস্বীকার করলে কিংবা স্ত্রী অবাধ্য হলে, শরীয়তে শাস্তির বিধান থাকবে, এক্ষেত্রেও তাই। বরং এরা হকদারের হক আদায় না করার কারণে অধিকতর শাস্তির যোগ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও অপরাধীকে ক্ষমা করার অধিকার মালিকের থাকবে, সুবিধাজনক বিবেচনায় তিনি সাজাও মাফ করে দিতে পারেন। অবশ্য হদ্দের ব্যাপার অন্যরকম। হদ্দ জারী করতে বাধা দেয়া বা ক্ষমার অধিকার কারো নেই। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত অকাট্য বিধান।

ইমাম বা হাকিমের কর্তব্য হল চোরাই মাল বিনষ্ট করে ফেললে চোরের নিকট থেকে ক্ষতি পূরণ আদায় করা। যেমন, গোমকারীর নিকট থেকে যেমনিভাবে ক্ষতি পূরণ আদায় করা হয়। ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমদ এ মতের সমর্থনকারী। কিন্তু অপারগ অবস্থায় তাকে সময় দিতে হবে। কেউ বলেছেন– জরিমানা ও হাত কাটা একই সাথে দুটো চলতে পারে না। ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর সমর্থক। কারো মতে, জরিমানার হুকুম কেবল আর্থিক সচ্ছলতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইমাম মালিক (রহ) এর সমর্থক। চোর, ডাকাতের মুকাবিলা কিংবা মাল অনুসন্ধান করার খরচ পত্র, বিনিময় ইত্যাদি মালিকের কাছ থেকে আদায় করা সরকারের জন্য জায়েয নয়। সরকারী কর্তৃপক্ষ নিজের অথবা

সৈন্যদের জন্য কোনক্রমেই মালিককে বিনিময় আদায়ের জন্য চাপ দেয়া জায়েয নয়। বরং তাদের মুকাবিলা করা জিহাদতুল্য। কাজেই যে খাত থেকে জিহাদের ব্যয় নির্বাহ করা হয়, এক্ষেত্রেও একই খাত থেকে খরচ বহন করতে হবে। মুজাহিদগনকে যদি জমাজমি দেয়া হয়ে থাকে কিংবা সরকার থেকে তাদের বেতন ধার্য করা থাকে তবে তাই যথেষ্ট, নতুবা বায়তুল মাল থেকে তাদের প্রয়োজন মিটানো হবে। কেননা এটাও "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর" অন্তর্ভুক্ত।

যাকাত অনাদায়কারী কোন মুসাফির যদি ঘটনাচক্রে চোরের সাথে বন্দী হয়ে আসে, তবে তার নিকট থেকে যাকাত আদায় করে আলোচ্য জিহাদে খরচ করতে হবে, যেমন ডাকাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সৈন্যদের পিছনে ব্যয় করা হয়।

এরা শক্তিশালী হওয়ার ফলে এদের মন জয়ের উদ্দেশ্যে আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দিলে 'ফাঈ' এবং যাকাত তহবিল থেকে কেবল সরদারদেরকে এ শর্তে দিতে হবে যে, হয় বাকীদের হাজির করবে, না হয় সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ ছেড়ে দেবে। ইমামের জন্য এ ধরনের ব্যবস্থা করা জায়েয। কেননা এর ফলে তাদের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়বে। আর এরা "মুয়াল্লাফাতুল কুলূবের" পর্যায়ভুক্ত হবে। কুরআন, হাদীস, শরীয়তের মূলনীতি, ইমাম আহমদ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ইমামগণ এর সমর্থনকারী।

চোর, ডাকাত, সন্ত্রাসবাদী এদের মুকাবিলায় দুর্বল, মুসাফির, ব্যবসায়ী এবং ধনী লোকদের প্রেরণ করা উচিত নয়। বরং শাসনকর্তার উচিত হল, বিত্তশালীদের থেকে আর্থিক সাহায্য নেয়া আর শক্তিশালী, সাহসী ও বিশ্বাসী লোকদের এ কাজে পাঠানো। কিন্তু যদি এ ধরনের লোক পাওয়া না যায়, তবে অবশ্য বিকল্প চিন্তা করা যেতে পারে।

কোন কোন সরকারী কর্মকর্তা, নেতা, উপনেতা, সরদার, শাসনকর্তা এবং উচ্চ পদস্থ সামরিক অফিসার কি প্রকাশ্যে বা গোপনে সন্ত্রাসবাদী, সমাজ বিরোধী চোর ডাকাতদের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ সমর্থন পৃষ্ঠপোষকতা করে এদের লুণ্ঠিত মালের একটা অংশ হাতিয়ে নেয়। এরা ফরিয়াদীকে সামান্য অর্থের বিনিময়ে রাজী করিয়ে নেয়, বাধ্য হয়ে তারাও রাজী হয়ে যায়। এটা একটা গুরুতর অপরাধ। এরা চোর, ডাকাতের সরদারের চাইতেও মারাত্মক অপরাধী। কেননা, তাদেরকে দমন করা সম্ভব কিন্তু এদের দমন করা কঠিন।

সুতরাং এদের সম্পর্কে বিধান হলো– সমাজ বিরোধীদের সমর্থনের দায়ে এরাও শাস্তিযোগ্য অপরাধে অপরাধী। তাই ডাকাতরা খুন করলে হযরত উমর (রা) এবং

অধিকাংশ আলিমের মতে এদেরকেও প্রাণদণ্ড দিতে হবে। আর ডাকাতরা মাল লুট করলে এদেরও ডান হাত-বাম পা কাটা যাবে। যদি তারা খুন এবং লুট উভয় অপরাধে জড়িত থাকে, তবে এদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে শূলীতে চড়াতে হবে। একদল আলিমের মতে এদের হাত-পা কেটে, কতল করে, অতঃপর শূলে ঝুলাতে হবে। কারো মতে কতল অথবা শূলী দুটার যে কোন একটা করার ইখতিয়ার রয়েছে। কেননা কার্যতঃ যদিও এরা লুণ্ঠন বা ডাকাতিতে অংশ নেয়নি কিংবা প্রকাশ্য অনুমিত দেয়নি কিন্তু লুণ্ঠিত মালে ভাগ বসিয়েছে। আর ধৃত হওয়ার পর শরীয়তের বিধান এদের হুকুম বানচাল করে ব্যক্তিগত স্বার্থে অর্থের লোভে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে। অথচ তাদের উপর হদ্দ জারী করা ওয়াজিব ছিল। আর আল্লাহ ও বান্দার হক আদায় করা ফরয। তাদেরকে আশ্রয় দিতে ও আশ্রয় দিয়ে হত্যা ও লুণ্ঠনে এরা সমভাবে শরীক রয়েছে। তাই এরাও অপরাধী যাদের সম্পর্কে আল্লাহ ও রাসূলের অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে। সুতরাং হযরত আলী (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে– নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন–

لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ اَحْدَثَ حَدَثًا اَوْ اٰوٰى مُحْدِثًا ـ

"অপরাধ! গুনাহগার এবং অপরাধকারীর আশ্রয়দাতা, এদের উপর আল্লাহ লানত করেছেন।"

কোন লোক সমাজ বিরোধীকে আশ্রয় দিয়েছে বলে যদি প্রমাণিত হয় তবে অপরাধীকে উপস্থিত করার অথবা তার অবস্থান নির্দেশ করার জন্য আশ্রয়দাতার প্রতি নির্দেশ দিতে হবে। যদি নির্দেশ সে যথাযথ পালন করে, তবে উত্তম নতুবা অপরাধী গ্রেফতার না হওয়া পর্যন্ত তাকে আটক রেখে তার অবস্থান জানার জন্য প্রয়োজন সাপেক্ষে প্রহার, দৈহিক নির্যাতন চালানো অবৈধ নয়। উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, এমন লোককে সাজা দেয়া ব্যতীত গত্যন্তর নেই যে ব্যক্তি ওয়াজিব মাল আদায় করতে বাধা দেয় অথবা টালবাহানা করে।

প্রার্থিত ধন কিংবা জনের অবস্থান সম্পর্কে যে ব্যক্তি জ্ঞাত, এ সংবাদ প্রকাশ করে দেয়া তার উপর ওয়াজিব। গোপন রাখা তার জন্য আদৌ জায়েয নয়। কেননা প্রকৃতপক্ষে এটা সৎকাজে সহযোগিতার শামিল আর তাকওয়া ও সৎকাজে সহযোগিতা করা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে যদি অন্যায়ভাবে জুলুম অত্যাচারের উদ্দেশ্যে কারো জানমালের তথ্য তালাশ করা হয়, তবে এ সংবাদ প্রকাশ করা আদৌ জায়েয নয় কারণ মূলত এটা হল পাপ ও অসৎকাজে সাহায্য করার

নামান্তর। বরং এ সংবাদ গোপন রাখা এবং প্রতিহত করা ওয়াজিব। কারণ মজলুমের সাহায্য করা ওয়াজিব। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন–

أُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَنْصُرُ مَظْلُوْمًا فَكَيْفَ أَنْصُرُ ظَالِمًا؟ قَالَ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَذَالِكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ -

"তুমি তোমার জালিম কিংবা মজলুম ভাইয়ের সাহায্য কর। আমি বললাম : হে রাসূলুল্লাহ (সা)! মজলুম ভাইয়ের সাহায্য তো যথার্থ। কিন্তু জালিমের সাহায্য কিরূপে করব? তিনি বললেন : তাকে জুলুম করা থেকে বাধা দাও, এটাই তাকে তোমার সাহায্য করা।" (বুখারী, মুসলিম)

হযরত বারা ইবনে আযিব (রা) থেকে বুখারী, মুসলিমে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) আমাকে সাতটি জিনিসের হুকুম করেছেন এবং সাত বিষয়ে নিষেধ করেছেন। আমাকে হুকুম দিয়েছেন : রোগীর শুশ্রূষা করতে, জানাযায় শরীক হতে, হাঁচির জবাব দিতে, কসম পূর্ণ করতে, দাওয়াত কবূল করতে এবং মজলুমের সাহায্য করতে। আর স্বর্ণের আংটি ব্যবহার, রূপার পাত্রে পান, মোটা, মিহিন, চিকন তথা যাবতীয় রেশমী কাপড় পরিধান এবং জুয়া খেলতে নিষেধ করেছেন।

মোটকথা, অপরাধীর অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তি সূত্র জানাতে অস্বীকার করলে, তা না জানানো পর্যন্ত তাকে আটক রাখা অথবা অন্য কোন সাজা দেয়া জায়েয। কিন্তু সাজার পূর্বে এটা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হতে হবে যে, ঠিকানা তার জানা আছে। 'গভর্ণর' বিচারপতি এবং সংশ্লিষ্ট সবাই গুরুত্বসহকারে এমনভাবে এ হুকুম পালন করবে যে, এ ধরনের জ্ঞাত ব্যক্তিকে সাজা দেয়ার পূর্বে নিখুঁত তদন্তের মাধ্যমে অবশ্যই প্রমাণ করে নিতে হবে যে, গোপন তথ্য সে জানে। বিষয়টা এমন নয় যে, জানিয়ে দেয়া কেবল তারই উপর ওয়াজিব ছিল, তোমাদের দায়িত্ব পালন তোমাদের উপর ওয়াজিব ছিল না, অথবা এমন নয় যে; একের সাজা অপরকে দিতে হবে। কেননা কুরআনে বলা হয়েছে–

اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى -

"কোন গুনাহগার অপরের গুনাহ্র বোঝা বহন করবে না।" (সূরা নজম : ৩৮)

মহানবী (সা) বলেছেন- اَلاَ لاَيَجْزِى جَانٌ اِلاَّ عَلٰى نَفْسِهِ "জেনে রাখবে, প্রত্যেক গুনাহগার নিজের জন্যই গুনাহ করে থাকে।" অর্থাৎ এর কুফল তার নিজেকেই ভোগ করতে হবে।

এর দৃষ্টান্ত, যেমন এক ব্যক্তি কারো জামিন বা উকিলও হয়নি এবং তার কাছ থেকে আদায় করার মতো এমন কোন মালও নাই, এমন লোকের নিকট টাকা দাবী করা অথবা নিজ আত্মীয় কিংবা প্রতিবেশীর কৃত অপরাধের কারণে কাউকে শাস্তি দেয়া অথচ কোন ওয়াজিব তরকের সে অপরাধী নয়, হারাম কাজও সে করেনি, জালিমের ঠিকানা প্রকৃতই তার জানা নাই। কাজেই তাকে সাজা দেয়া জায়েয নয়। সাজা তারই প্রাপ্য, যে প্রকৃত অপরাধী। অবশ্য জানা থাকলে প্রকাশ করা তার উপর ওয়াজিব। এ সহযোগিতা কুরআন, হাদীস ও ইজমার ভিত্তিতে তার উপর ওয়াজিব। আর সাম্প্রদায়িক, গোত্রবাদী লোকদের ন্যায় সে যদি জালিমের অন্যায় সহযোগিতা, আনুকূল্য অথবা তার ভয়ে ঠিকানা প্রকাশ করতে অস্বীকার করে কিংবা বিরত থাকে অথবা মজলুমের সাথে ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে তথ্য গোপন করে, তাহলে এমর্মে আল্লাহ্র ইরশাদ নিম্নরূপ-

وَلاَيَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَنْ لاَّ تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى - (سورة مائدة : ٨)

"কোনো মানুষের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ স্পৃহা যেন তোমাদের বেইনসাফীর কারণ না হয়। তোমরা ইনসাফ করবে, কেননা ন্যায়পরায়ণতা তাকওয়া-খোদাভীতির সাথে সম্পৃক্ত।" (সূরা মায়েদা : ৮)

অথবা এও হতে পারে যে, ইনসাফ কায়েম করতে, ভীরুতাবশত দ্বীনের সহযোগিতা করতে অভিযুক্ত অস্বীকার করছে কিংবা আল্লাহর দ্বীনকে হেয় করার উদ্দেশ্যে সে অস্বীকার করছে যেমন ধর্ম বিমুখ লোকেরা করে থাকে। এদেরকে যখন বলা হয়- চল আল্লাহর পথে জিহাদ করতে তখন এরা নিস্পৃহ হয়ে মাটিতে বসে যায়। মোটকথা, এমন সব লোক সর্বস্তরের আলিমগণের মতে শাস্তিযোগ্য।

এ পথে সক্রিয় ব্যক্তিরা আল্লাহর নির্ধারিত হদ্দ এবং বান্দার হক বিনষ্ট করে। নিজেদের বল শক্তি, শৌর্য-বীর্যে দুর্বল এসব লোক সেই ব্যক্তির ন্যায়, যার নিকট জুলুমবাজ ও ধোকাবাজের মালামাল রয়েছে অথচ দ্বীনি দায়িত্ব পালনরত ন্যায়পরায়ণ হাকিম ও শাসকের হাতে সে তা সোপর্দ করছে না। ফলে এর অসহযোগিতার কারণে তাঁরা তাদের কর্তব্য সম্পাদনে বাধা প্রাপ্ত হচ্ছেন। কাজেই এরা শাস্তিযোগ্য অপরাধী।

কিন্তু তার সংবাদ না দেয়া বা অপরাধী বা অপহৃত মাল হাজির না করার কারণ এই যে, তলবকারী নিজে তার উপর জুলুম-অত্যাচার চালাবে। অন্যথায় সে একজন জনহিতৈষী ও সৎকর্মশীল ব্যক্তি, তবে এটা চিহ্নিত করা সুকঠিন যে, অবৈধ সহযোগিতা কোনটা আর জুলুম-অত্যাচার থেকে বাঁচার প্রেরণায় উদ্ভূত পরিস্থিতি কোনটা। সন্দেহ এবং রিপুর তাড়না উভয়টি একত্রিত হওয়ার সম্ভাবনা এখানে বর্তমান। কাজেই সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করা হাকিমের কর্তব্য।

গ্রাম্য কিংবা শহুরে বিত্তবানদের মধ্যেই সাধারণতঃ এ অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে। আত্মীয় বন্ধু কিংবা কোন আশ্রয় প্রার্থী তাদের সাহায্য কামনা করলেই তাদের অন্তরে এ অন্যায় পক্ষপাতিত্বের আগুন জ্বলে উঠে। তদুপরি সমাজের চরিত্রহীন লোকদের মহলে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি কায়েমের লালসাই তাদেরকে এ অন্যায় কাজে উৎসাহিত করে। কাজেই জালিম মজলূম উভয়ের ন্যায্য অধিকার, বৈধ পাওনা তারা নস্যাৎ করে দেয়। বিশেষতঃ মজলূম যদি তাদের নিজেদের সমকক্ষ কোন বিত্তশালী হয়, তবে আশ্রয় প্রার্থীকে সোপর্দ করা তার নিজের জন্য অপমানকর এবং আত্মসম্মানের পরিপন্থী বলে সে বিবেচনা করে। অথচ এটা মূর্খতাপ্রসূত জাহেলী চিন্তার অবৈধ ফসল। বস্তুতঃ এরাই হল দ্বীন ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রে বিপর্যয় সৃষ্টির মূল উৎস। বর্ণিত আছে, জাহেলী যুগের অধিকাংশ যুদ্ধ, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এ কারণেই সংঘটিত হয়েছে। স্বজনপ্রীতি ও গোত্রবাদের প্রেরণাই বনু বকর ও বনু তাগলিব ইতিহাস খ্যাত "হরবুল বসূস" (বসূস যুদ্ধ) নামক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে উৎসাহিত করেছিল।* অন্ধযুগীয় গোত্রবাদী চিন্তা ও আত্মাভিমানের অনলশিখা দিয়েই তুর্কী-তাতারী বর্বররা মুসলিম জাহানকে

---

* টীকা : তৎকালীন আরবের বিখ্যাত গোত্র 'বকর' ও 'তাগাল্লুব'-এর মধ্যে 'হরবুল বসূস" নামে সংঘটিত যুদ্ধের কারণ ছিল– প্রভাবশালী গোত্রপতি "কুলায়ব ওয়ায়েল ইবনে রবীআ" একদিন স্বীয় উটনীর সাথে অপরিচিত অপর এক উটনিকে চরতে দেখেন, যেটি ছিল 'তামীম গোত্রীয় "বসূস বিনতে মুনকিয"-এর জনৈক অতিথির। স্বীয় উটনীর সাথে তার চারণভূমিতে অপরের উটনী চরে বেড়াবে, ঘাস খাবে? এটা তাঁর আত্মাভিমানকে বিশেষভাবে আহত করে। সাথে সাথে সে তীরের আঘাতে ঐ উটনীর স্তন জখমী করে এবং সেটিকে তাড়িয়ে দেয়। আহত উটনী বাড়ী ফিরলে তা দেখে বসূস মাথায় হাত দিয়ে وَاذُلَّاه 'হায়...রে অপমান'– বলে চিৎকার দিয়ে উঠে। সাথে সাথে 'বকর' গোত্রে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বকর গোত্রীয় জনৈক ব্যক্তি তাৎক্ষণিকভাবে বর্শার আঘাতে কুলায়বকে হত্যা করে। ফলে উভয় গোত্রে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বেধে যায়– যা ৪৯১ খৃষ্টাব্দ দীর্ঘ চল্লিশ বছরব্যাপী অবিরাম চলতে থাকে। পরিণামে দুই তরফের অগণিত প্রাণ, অসংখ্য খান্দান বিরাণ ও বরবাদ হয়ে যায়। অথচ এর মূলে উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো ঘটনাই ছিল না। নিছক কৃত্রিম জাত্যাভিমান, কুল-গৌরব, অন্যায় বাড়াবাড়ি আর সর্বনাশা প্রতিশোধ স্পৃহা ছিল এ যুদ্ধের প্রধান কারণ।

ছারখার করতে সক্ষম হয়েছিল। মাওয়ারা উন্ নহর, খুরাসান ইত্যাদির সুলতান বাদশাহদের উপর একই কারণে তাদের প্রভুত্ব কায়েম করার পথ সুগম হয়েছিল। একই জাহেলী, গোত্রবাদ, জাত্যাভিমান ও আভিজাত্যের মিথ্যা জৌলুসের অন্তরালে তারা মুসলিম সাম্রাজ্য গ্রাস করে সহস্র বছরে গড়া মুসলিম সভ্যতাকে ধুলিস্যাৎ করে দিতে সক্ষম হয়।* ইতিহাসে এর অসংখ্য প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে।

---

* টীকা : পূর্ব পশ্চিম দিগন্ত ব্যাপী আব্বাসী সাম্রাজ্যের ভিত ধ্বসে পড়ার পিছনে অন্যান্য উপসর্গের মধ্যে আভিজাত্য ও অন্যায় আত্মাভিমানও বহুলাংশে দায়ী ছিল। আরব অনারব, ইরান, রোম থেকে সিন্ধু পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডে যার সীমানা বিস্তৃত ছিল। ইউরোপ এশিয়া ছিল যার প্রভাব বলয়ে, সেই সম্রাট মনসুর আব্বাসী, হারূনুর রশীদ, মামূনুর রশীদের ন্যায় পরাক্রমশালী সম্রাটগণ মানব সভ্যতার বিকাশ সাধনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার উন্মোক্ত করেছিলেন। বিশ্বকে যারা রাজ্য শাসন পদ্ধতি শিখিয়েছিলেন, এদের উদার নীতির ফলেই ইউরোপীয়রা জ্ঞানের সন্ধান লাভ করেছিল। সাম্রাজ্যের বিশাল বিস্তৃত পরিধিতে তাঁদের প্রেরণায়ই জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাদপীঠ, খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ স্থাপিত হয়েছিল। এক কথায় তাঁদেরকে গোটা বিশ্বের শিক্ষক বললেও অত্যুক্তি হবার কথা নয়। তৎকালীন শক্তি হিসাবে তারা ছিলেন মর্যাদার উত্তুঙ্গ চূড়ায়। কিন্তু দ্বীনের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে (১০৭ পৃ. পর) জাহেলী গোত্রবাদ, মযহাবী দ্বন্দ্ব, শিয়া-সুন্নীর ঝগড়া ইত্যাদি বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়ে গোটা জাতি হীন বল ও অথর্ব হয়ে পড়ে, যা মহানবী (সা)-এর সময়কালীন ইহূদী খৃষ্টানদের অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যাদের অবস্থা আমরা অনুধাবন করতে পারি কুরআনের ভাষায় যেমন,

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصَارٰى عَلٰى شَيْءٍ - وَقَالَتِ النَّصَارٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتَابَ -

"আর ইহূদীরা বলত নাসারাদের ধর্ম! এটা কোন ধর্মই নয়। পক্ষান্তরে নাসারা বলত ইহূদীদের ধর্মও মূল্যহীন, অথচ উভয়পক্ষই কিতাব পাঠ করে থাকে।" (সূরা বাকারা : ১১৩)

যাহোক গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে, মসজিদ-মাদ্রাসায় এক কথায় সর্বত্র জনগণ থেকে শুরু করে সৈন্যদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও গোত্রবাদের বীজ ছড়িয়ে পড়ে। এহেন আত্মকলহের পরিণতিতে নিজেদের মধ্যে হানাহানি, কাটাকাটি শুরু হয়ে যায়। শিয়া সম্প্রদায় নিজস্ব রাষ্ট্র কায়েমের চিন্তা করে। অবশেষে এক পর্যায়ে তারা সুযোগ পেয়েও যায়। আব্বাসী খেলাফতের শিয়া প্রধানমন্ত্রী 'আলকামী' ফিরকাবন্দীর সুবাদে চেঙ্গিস খাঁকে খেলাফতের উপর আক্রমণের আহ্বান জানায়। গোত্রবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার অন্তরালে জাতি পূর্ব থেকেই বিচ্ছিন্নতার জালে আটকা পড়েছিল। তাই এখন আর তাতারী দস্যুদের আটকায় কে? সুতরাং বাগদাদে রক্তের স্রোত বহায়ে দেয়া হল। প্রায় দেড় লক্ষ মুসলমানের পবিত্র খুনে মহানগরী বাগদাদ ভাসতে থাকে, যাদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিল আলিম, ফাজিল, আমীর, ধনী এবং সেনানায়ক। মোটকথা, আত্মকলহ এবং ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ফলশ্রুতিতে দীর্ঘ শত শত বছরের সাধনায় গড়া ইসলামী সভ্যতা নিমিষে ধূলিস্যাৎ হয়ে যায়। এহেন পরিস্থিতিতেও জাতির হুশ ফিরে আসেনি। খাওয়ারযিম শাহ এবং আব্বাসী খলিফাদের মধ্যে পারস্পরিক মতবিরোধ তখন তুঙ্গে। ঘোর, আফগানিস্তান ও ভারতে

যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য নিজেকে হেয় করে, আল্লাহ তাকে মর্যাদাশালী করেন। যে ব্যক্তি ন্যায় বিচার করে, নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান মনে করে; আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেন। কেননা খোদাভীরু, মুত্তাকী-পরহেযগাররাই আল্লাহর নিকট সম্মানী ও অধিক মর্যাদাবান। কিন্তু যে ব্যক্তি সত্যকে নস্যাৎ, জোর-জুলুম দ্বারা মর্যাদা লাভের প্রয়াস চালায়, সে গুনাহগার-পাপী, আল্লাহ তাকে অপমানিত করেন এবং নিজের কৃত কর্মের দ্বারাই সে লাঞ্ছিত হয়। আল্লাহ বলেন–

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا.

"নিজের সম্মানেরই যে প্রত্যাশী তার জানা উচিত, সম্মান কেবল আল্লাহরই জন্য নির্ধারিত।" (সূরা ফাতির : ১০)

মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ.

তখন 'ঘোরী' বংশীয়দের রাজত্ব। সালাহউদ্দীন আয়্যূবীর হাতে মিসরের ফাতেমী বংশ নিধন হচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতেই খাওয়ারযিম শাহের সমর্থনপুষ্ট হিংস্র তাতারীরা ইসলামী সাম্রাজ্যে চরম আঘাত হানে। ফলে ইসলামী সাম্রাজ্য, এশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহ তাতারীদের অধিকারে চলে যায়। এমনিতর সহস্রাধিক বছরের প্রচেষ্টায় তিলে তিলে গড়া ইসলামী সভ্যতা ও মুসলিম সাম্রাজ্য আত্মহননের করাল গ্রাসে বিলীন হয়ে যায়। তাই فَاعْتَبِرُوْا يَا اُولِى الْاَبْصَارِ চিন্তাকর হে জ্ঞানীজন!

যেই খেলাফতের বুনিয়াদ স্বয়ং মহানবী (সা) রেখেছিলেন মদীনা তাইয়্যেবাতে, হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা), হযরত ফারুক আযম (রা) سروری دردین ماخدمت گریست "আমাদের ধর্মে নেতৃত্বের বিকাশ কেবল সেবা" নীতিতে পরিচালনা করেছিলেন, কুরআন-সুন্নাহ যার মূলনীতি, আসমান থেকে নাযিল হয়েছে যার সংবিধান, যে খেলাফত অর্ধশতাব্দীরও কম সময়ে অর্ধেক দুনিয়া পদানত করেছিল, সারা বিশ্বে যার প্রতিপত্তির দুর্বার গতি বিশ্ব মানবকে শান্তি নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েছিল, যে খেলাফতকে মানব জাতির নিরাপত্তার প্রাণকেন্দ্র মনে করা হতো, যে খেলাফত মানব সমাজে ভ্রাতৃত্ব, সাম্য, সহমর্মিতা, খোদাভীতি, ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠিত করেছিল, যা ছিল মানব জাতির কল্যাণে এক খোদাই অনুগ্রহ, যে খেলাফত ছিল দ্বীন দুনিয়ার সার্বিক সংস্কারের গ্যারান্টিস্বরূপ, আরবের বিবদমান গোত্রগুলোর মিলনকেন্দ্র ছিল যে খেলাফত এবং যার প্রতি তাকিয়ে আকাশের ফেরেশতাগণ পর্যন্ত নীড় বাঁধার কামনা করতো, এমনিভাবে অতীতের গর্ভে তার বাস্তব রূপ বিলীন হয়ে গেল। এভাবে অন্যায়, অত্যাচার, ভোগবিলাস ও পাপাচার ব্যক্তি পরিবার গোত্র তথা জাতিকে সমূলে বিনাশ করে, তদ্রূপ আলস্য, লোভ-লালসা, আভিজাত্য, জাত্যাভিমান জাতির রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়। فَلْيَتَدَبَّرِ الْمُتَدَبِّرُوْنَ. "সুতরাং জ্ঞানীজনদের গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত।"

"কপট বিশ্বাসী মুনাফিকরা বলে, আমরা মদীনায় ফিরে গেলে সেখানকার সম্মানী লোকেরা লাঞ্ছিতদের বের করে দেবে, অথচ প্রকৃত সম্মান, আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের জন্য, কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।" (সূরা মুনাফিকূন : ৮)

এ জাতীয় চরিত্রের লোকদের সম্পর্কে আরো ইরশাদ হচ্ছে–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِىْ قَلْبِهٖ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ. وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. اِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ. وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. (سورة بقرة : ٢٠٦-٢٠٤)

"হে নবী! কোন কোন লোকের পার্থিব জীবনের কথাবার্তা আপনার নিকট আকর্ষণীয় মনে হয় আর তারা অন্তরের বাসনা সম্পর্কে আল্লাহকে সাক্ষী বানায়, অথচ আপনার দুশমনদের মধ্যে তারাই সবচেয়ে মারাত্মক ঝগড়াটে। আর ফিরে যাওয়ার পর তারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টির জন্য বিশেষ তৎপর হয়ে ওঠে। ক্ষেতের শস্যাদি, মানুষ ও প্রাণীর বংশধারা বিনষ্ট করতে তারা সক্রিয় হয়ে পড়ে, আর আল্লাহ ফেৎনা-ফাসাদ ভালবাসেন না। এরূপ ব্যক্তিকে যদি বলা হয়, আল্লাহকে ভয় করো, তখন তার অসার অহংকার ও গৌরববোধ তাকে গুনাহে লিপ্ত করে দেয়। সুতরাং এহেন ব্যক্তির জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট, যা অতিশয় মন্দ ও নিকৃষ্ট আবাসস্থল।" (সূরা বাকারা : ২০৪-২০৬)

সুতরাং আশ্রয়প্রার্থী যথার্থই মজলূম কিনা এটা যাচাই করে নেয়া আশ্রয়দাতার কর্তব্য। প্রকৃতই যদি সে নির্যাতিত নিপীড়িত হয় তবে তাকে আশ্রয় দেবে। আর শুধু দাবী করলেই মজলূম প্রমাণিত হয় না বরং এর পিছনে সঠিক কারণ ও কার্যকর ভূমিকা থাকতে হবে। কেননা, অনেক সময় দেখা যায়, এক ব্যক্তি নিজেকে নির্যাতিত বলে কাৎরাচ্ছে অথচ নিজেই সে জালিম অত্যাচারী। এজন্য তার পার্শ্ববর্তী লোকদের নিকট কোনো প্রতিপক্ষকে জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রকৃত ঘটনা জেনে নিতে হবে। যদি সে প্রকৃত জালিম বলে অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয়, তবে তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে জুলুম থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করবে, বিনম্র ব্যবহার দ্বারা তাকে সৎ পথে আনতে সচেষ্ট হবে, সম্ভব হলে উভয়পক্ষকে ডেকে নিয়ে মীমাংসার উপায় খুঁজবে, প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ করবে। সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে, তাকে রাষ্ট্রীয় আইনের হাতে সোপর্দ করে দেবে।

অবস্থা যদি এমন হয় যে, পক্ষদ্বয়ের প্রত্যেকেই জালিম আবার মজলূমও যেমনটি

নফসের গোলাম ও ভোগবাদীরা সচরাচর হয়ে থাকে, যেমন কায়েস ও ইয়ামনী গোত্রসমূহ, শহর ও পল্লীবাসীদের মধ্যে প্রায়শঃ তা লক্ষ্য করা যায়। অথবা পক্ষদ্বয়ের কেউই জালিম নয় কিন্তু কোন সন্দেহের বশবর্তী কিংবা কোন ভুল ব্যাখ্যাজনিত কারণে তারা পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। এমতাবস্থায় বিরোধের মূল সমস্যা মীমাংসার চেষ্টা করবে, এমনকি দরকার হলে সালিশের আশ্রয় নিতে হবে। আল্লাহ বলেছেন–

وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا. فَاِنْ بَغَتْ اِحْدَى هُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِىْءَ اِلٰى اَمْرِ اللّٰهِ. فَاِنْ فَاءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ. (سورة حجرات : ١٠-٩)

"মুমিনদের দু'টি দল যদি পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তাদের বিবাদ মিটিয়ে দাও, আর তাদের এক পক্ষ যদি অপর পক্ষের উপর জুলুম করে, তবে আল্লাহর বিধানের প্রতি প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত জালিম দলের বিরুদ্ধে লড়াই কর। অতঃপর যদি তারা ফিরে আসে তবে, সাম্য ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে তাদের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ইনসাফকারীদের ভালবাসেন। মুমিনগণ হচ্ছে পরস্পর ভাই ভাই। তাই নিজের ভাইদের মধ্যে তোমরা মীমাংসা করে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর, পরিণামে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হবে।" (সূরা হুজুরাত : ৯-১০)

আরো ইরশাদ হচ্ছে-

لاَ خَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَجْوهُمْ اِلاَّ مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ. وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَالِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا. (سورج النساء : ١١٤)

"তাদের অধিকাংশ পরামর্শে কোনই কল্যাণ নেই, অবশ্য যে ব্যক্তি দান-খয়রাত, সৎ কর্ম এবং মানুষের মধ্যে কল্যাণধর্মী পরামর্শ দান করে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় এরূপ করবে, তাকে আমি বিরাট সওয়াব দান করব।" (সূরা নিসা : ১১৪)

নবী করীম (সা) থেকে আবূ দাউদে বর্ণিত আছে, তাঁকে প্রশ্ন করা হলো : "কোন ব্যক্তিকে সত্যের ব্যাপারে নিজ গোত্রের সাহায্য সহায়তা করা কি অন্ধযুগীয় সাম্প্রদায়িকতা?" তিনি বললেন (৮) না। তিনি আরো বললেন–

وَلَكِنَّ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ اَنْ يَّنْصُرَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ فِى الْبَاطِلِ ـ

বরং কোন ব্যক্তির অন্যায় কাজে নিজ গোত্রের সাহায্য করাই হলো সাম্প্রদায়িকতা।

তিনি বলেন– خَيْرُكُمْ الدَّافِعُ عَنْ قَوْمِهِ مَالَمْ يَاْثَمْ ـ

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম প্রতিরোধকারী, যে কোনো অপরাধে লিপ্ত না হয়ে নিজ গোত্রের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করে।"

মহানবী (সা) বলেছেন–

مَثَلُ الَّذِىْ يَنْصُرُ قَوْمَهُ بِالْبَاطِلِ كَبَعِيْرٍ تَرَدَّى فِىْ بِئْرٍ فَهُوَ يَجُرُّ بِذَنْبِهِ ـ

"যে ব্যক্তি অন্যায় কাজে আপন গোত্রের সাহায্য করে, সে ঐ উটের মতো যে উট কূয়ায় পড়ে লেজ নাড়ে।"

তিনি আরো ফরমান–

مَنْ سَمِعْتُمُوْهُ يَتَعَزَّى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَاعْضُوْهُ هُنَّ اَبِيْهِ وَلاَتَكْنُوْا ـ

"যার সম্পর্কে তোমরা শুনতে পাও যে, সে মূর্খতার পতাকা উড়িয়েছে, তখন তাকে মূল থেকে উপড়ে ফেল, যেন সে বাড়তে না পারে।"

মোটকথা, ইসলাম ও কুরআনের দাওয়াতের বিপরীত বংশগত, দেশ ও জাতিগত, ধর্মীয় কিংবা অন্য যে-কোন আবেদন নিবেদন, ডাক-আহ্বান ও ব্যাখ্যা সব জাহিলিয়াত তথা প্রাক ইসলামী যুগের মূর্খতার অন্ধকার। এমনটি যে করবে, সে যেন মূর্খতার ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিল। বরং সে মুহাজির ও আনসার হচ্ছে সেই ব্যক্তিদ্বয়ের অনুরূপ যারা ঘটনাচক্রে পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হলে, মুহাজির চিৎকার দিয়ে উঠল– يَالَلْمُهَاجِرِيْنَ - (হে মুহাজিরগণ!) আর আনসার আর্তনাদ করল– يَا لَلاَنْصَارِ (হে আনসারগণ!) বলে।" তাই সে পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ (সা)কে ইরশাদ করতে হলো– اَبِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ وَاَنَا بَيْنَ اَظْهُرِكُمْ.

"তোমরা কি জাহেলিয়াতের নামে ঝাঁপিয়ে পড়লে, অথচ আমি স্বয়ং তোমাদের মধ্যে বর্তমান।"

মোটকথা, তিনি তাদের আচরণে গভীর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

[তের]

সাক্ষ্য কিংবা নিজ স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে চোরের হাতকাটা প্রসঙ্গ

সাক্ষ্য কিংবা চোরের আপন স্বীকারোক্তির দ্বারা চুরি প্রমাণিত হলে, অনতিবিলম্বে তার হাত কেটে দিতে হবে। কারারুদ্ধ করা অথবা অর্থের বিনিময়ে তাকে ছেড়ে দেয়া অবৈধ।

চোরের হাত কাটা ওয়াজিব। কুরআন, হাদীস ও 'ইজমা' দ্বারা এটা সুপ্রমাণিত। মহান আল্লাহ্ বলেছেন–

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّٰهِ. وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ. اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ. (سورة مائدة : ٣٩-٣٨)

"পুরুষ চোর এবং নারী চোর উভয়ের হাত কেটে দাও, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এদের কৃতকর্মের এটা শাস্তিমূলক বিধান। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রমশালী এবং প্রজ্ঞাময়। অপরাধ করার পর যে ব্যক্তি তওবা ও নিজেকে সংশোধন করে, আল্লাহ্ তার তওবা কবুল করেন। কেননা, আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও মহা দয়ালু।" (সূরা মায়েদা : ৩৮-৩৯)

সাক্ষ্য কিংবা নিজ স্বীকারোক্তির পর চুরির অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর অনতিবিলম্বে তার উপর "হদ্দ' জারি করে' নির্ধারিত সাজা কার্যকর করতে হবে, বিলম্ব করা জায়েয নয়। কারাগারে আটক কিংবা 'ফিদ্‌য়া' তথা অর্থের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়া যাবে না। নির্দিষ্ট সময়ে দিবালোকে তার হাত কাটতে হবে। কেননা, আল্লাহর পথে জিহাদ করা যেমন ইবাদত, তেমনি 'হদ্দ' কার্যকর করা ইবাদতের মধ্যে গণ্য আর অন্তরে এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, হদ্দ কার্যকর করাটা মানুষের জন্য আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ।

সুতরাং শাসনকর্তা, বিচারপতি এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীলগণ এ ব্যাপারে মায়া-দয়া না দেখিয়ে কঠোর হওয়া উচিত এবং হদ্দ কিছুতেই বাতিল করা চলবে না। তারা মনে মনে এ বিশ্বাসই পোষণ করবেন যে, জনগণের উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্বরূপ

এবং অসৎ কাজ থেকে অপরাধপ্রবণ লোকদের বিরত রাখার উদ্দেশ্যে আমরা 'হদ্দ' জারি করার পদক্ষেপ নিয়েছি– অহংকার কিংবা ক্রোধ বশতঃ নয় বরং পিতা যেভাবে পুত্রকে শিক্ষা দেয়। সন্তানকে সুসভ্য করা থেকে গা বাঁচিয়ে পিতা যদি পুত্রকে মায়ের হাওলা করে দেয়, তাহলে মাতৃত্বসুলভ কোমলতার কারণে তার পক্ষে পুত্রকে গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। ফলে ছেলের চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়। বস্তুতঃ পিতার কড়া শাসনেই পুত্র সভ্য-শান্ত, শিক্ষিত ও চরিত্রবান হয়ে গড়ে ওঠে। এটাই হল পিতৃত্বের মূল দায়িত্ব এবং ছেলের প্রতি তার সত্যিকার অনুগ্রহ।[১]

অথবা তারা হলেন সে সহৃদয় চিকিৎসকের ন্যায় যিনি রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে রোগীকে তিক্ত ঔষধের ব্যবস্থা দেন। কিংবা মানব দেহের পচনশীল সে অংগের ন্যায় অস্ত্রোপাচারের দ্বারা যেই অঙ্গ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেই দেহের বাকী অংশ রক্ষা পায়। কিংবা সিংগা লাগিয়ে দূষিত রক্ত বের করার আশায় যেমন শরীরে জখম করা হয় আর ভবিষ্যতের মঙ্গল চিন্তা করে সাময়িক এ যাতনা সহ্যও করা হয়। মোটকথা ব্যাধির উপশম ও সুখের জন্যই মানুষ এতসব কষ্ট সহ্য করে। হদ্দের রহস্যও তাই যে, সাজার মাধ্যমে অপরাধী যেন চির শান্তি লাভ করতে পারে।

---

১. টীকা : চুরির দায়ে হাত কাটাকে আধুনিক বিশ্বের অগভীর চিন্তার কোনো কোনো মানুষ একটা বর্বর আইন ও কঠোর সাজা বলে মন্তব্য করে থাকে। কিন্তু বাস্তব সত্য এ ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত স্বাক্ষরই বহন করে থাকে। যে গ্রাম-সমাজ-জনপদে চুরি হয়, সেখানকার দু'একজনের হাত কাটা গেলে গোটা জনপদ শান্তি ও নিরাপদ হয়ে যায়, পুনরায় কেউ চুরি করতে সাহসই পায় না। সুতরাং দেখা যায়, এ হাত কাটা সমাজের জন্য অশেষ কল্যাণ বয়ে আনে। পক্ষান্তরে আজকাল মানব উদ্ভাবিত আইনে চুরির যে সাজা প্রবর্তন করা হয়েছে তা কবির ভাষায় তীব্র হলো পাপের নিশা– সাজা পাওয়ার পরে.....।" এ ধরনের সাজায় সমাজের ক্ষতিই হয়, লাভ কিছুই হয় না। জেলে গিয়ে পুরান চোরদের সাথে মিশে নতুন চোর দক্ষ হয়ে আসে। অথচ ইসলাম যে শাস্তির বিধান দিয়েছে তা কার্যকর করা হলে চুরির সম্ভাবনা একেবারেই মিটে যায়। আল্লাহও রাজি থাকলেন। উপরন্তু সমাজে, শান্তি, নিরাপত্তা ও স্বস্তিও নেমে এল। আর হদ্দের উপকারিতা ও মূল রহস্য জানতে পেরে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিও এই মনে করে সন্তুষ্ট যে, আখিরাতের কঠিন সাজা থেকে মুক্তি লাভের একটা উপায় তো হলো। এতেও অপরাধীর তাকওয়া অবলম্বন করার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজে ও রাষ্ট্রে।

মোটকথা, শরীয়তী বিধান 'হদ্দের' মধ্যে অশেষ বরকত ও বিবিধ কল্যাণ নিহিত রয়েছে। পার্থিব ও পারলৌকিক উভয় জীবনে শান্তি ধারা নেমে আসে। বিশ্ববাসীকে আল্লাহ বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধির তৌফিক দেন। সারা বিশ্ব না হোক অন্ততঃ মুসলিম দেশগুলো ইসলামের এ দণ্ড বিধানটি বাস্তবায়িত করে এর সুফল ভোগ করার সুযোগ লাভে যেন সচেষ্ট হয়।

হদ্দ কার্যকর করাতে শাসনকর্তা ও বিচারপতির উদ্দেশ্য এটাই হওয়া উচিত যে, জনগণের সার্বিক কল্যাণ, দুষ্টের দমন, শিষ্টের লালনের কল্যাণ অর্জন করা। উপরন্তু এটাও নিয়্যাত হওয়া উচিত যে, এদ্বারা একে তো আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়িত করা হলো, দ্বিতীয়তঃ এ শাস্তিই যেন অভিযুক্ত ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়– আখিরাতে মুক্তির উপায় হয়। কেননা এদ্বারা তার আত্মিক পরিশুদ্ধি হয়ে যাচ্ছে। এমনিভাবে হদ্দ জারি অর্থাৎ ইসলামের অপরাধ দণ্ড বিধি কার্যকর করাটা সবার জন্য আল্লাহর সরাসরি অপার অনুগ্রহ বৈ কিছু নয়।

পক্ষান্তরে, রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য যদি হয় আল্লাহর বান্দাদেরকে গোলাম বানানো, স্বীয় কর্তৃত্ব বজায় রাখা, নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা, ব্যক্তি, গোষ্ঠী স্বার্থ ও আর্থিক সুবিধা আদায় করা তাহলে এর পরিণতি বিপরীত হয়ে দাঁড়াবে। মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে হদ্দের আসল উদ্দেশ্য দূরে সরে যাবে।

বর্ণিত আছে, হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ) খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে ওলীদ ইবনে আবদুল মালিকের পক্ষ থেকে মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন। শাসন ও জনসেবায় তিনি যথাযথ দায়িত্ব পালনে আত্মনিয়োগ করেন। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ একবার ইরাক থেকে মদীনা পৌছে স্থানীয় লোকদের তিনি হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয সম্পর্কে প্রশ্ন করেন– كَيْفَ هَيْبَةُ فِيكُمْ.

“তোমাদের উপর তাঁর প্রভাব কিরূপ?” লোকেরা বলল : “তাঁর প্রভাবের কথা আর কি বলবো, আমরা তো ভয়ে তাঁর প্রতি তাকাতেও পারি না।” হাজ্জাজ كَيْفَ مُحَبَّتَكُمْ “তাঁর প্রতি তোমাদের ভালবাসা কিরূপ” তারা জবাব দিল : هُوَ اَحَبُّ اِلَيْنَا مِنْ اَهْلِنَا “নিজেদের পরিবার-পরিজন থেকেও তিনি আমাদের প্রিয়।” হাজ্জাজ– كَيْفَ اَدَبُهُ فِيكُمْ “তোমাদের প্রতি তাঁর শাসনগত আচরণের কি অবস্থা?” তারা বলল : “তিন থেকে দশ কোড়া পর্যন্ত তিনি লাগিয়ে থাকেন।” অতঃপর হাজ্জাজ বললেন–

“এ ভালবাসা, ভয় ও প্রভাব এবং শাসনগত আচরণ আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, আল্লাহর বিধানও তাই।”

হাত কাটার পর সাথে সাথে কর্তিত স্থানে গরম তেলের সেক দেয়া বাঞ্ছনীয়।[১] আর বিচ্ছিন্ন হাত তার গলদেশে ঝুলিয়ে দেয়া মুস্তাহাব।

টীকা-১ : আজকাল এর জন্য অন্যান্য ঔষধ ব্যবহার করা হয়। মূলতঃ রক্ত বন্ধ হওয়া এবং রক্ত ক্ষরণজনিত কারণে প্রাণহানি না ঘটাই এর উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়বার চুরি করলে তার বাঁ পা কাটতে হবে। তৃতীয়বার চুরি করলে সাজার ধরন কিরূপ হবে– এ সম্পর্কে সাহাবী ও পরবর্তী ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে দ্বিমত লক্ষ্য করা যায়। কিছু সংখ্যক লোকের মতে তৃতীয় ও চতুর্থবার চুরি করলে তার বাম অথবা ডান হাত কেটে দিতে হবে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ইমাম শাফেঈ এবং এক রেওয়ায়েতে ইমাম আহমদ এ মতের সমর্থনকারী। ইমাম আহমদের দ্বিতীয় মত হলো, তাকে কারারুদ্ধ করে রাখতে হবে। হযরত আলী (রা) এবং সূফীগণ এ মতের পক্ষপাতী।[১]

হাত তখনই কাটতে হবে যখন চুরির 'নিসাব' পূর্ণ হয়। ইমাম মালিক, ইমাম শাফি'ঈ, ইমাম আহমদ প্রমুখ ইমাম, উলামা, হিজাযবাসী এবং হাদীসবিদগণের মতে এর পরিমাণ হল– $\frac{১}{৪}$ (এক চতুর্থাংশ) দীনার অথবা ৩ (তিন) দিরহাম। কারো কারো মতে, হাত কাটার নিসাবের পরিমাণ এক দীনার অথবা দশ দিরহাম। বুখারী-মুসলিমে হযরত ইবনে উমর (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) তিন দিরহাম মূল্যের একটি 'মিজান্ন' তথা একটি ঢাল চুরির দায়ে হাত কাটার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সুতরাং মুসলিমের ইবারত হল–

قَطَعَ سَارِقًا فِىْ مِجَنٍّ قِيْمَتُهٗ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ -

"তিনি তিন দিরহাম মূল্যের একটি ঢাল চুরির অপরাধে চোরের হাত কেটেছিলেন।" হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) বলেছেন–

قَطْعُ الْيَدِ فِىْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا -

"এক চতুর্থাংশ $\frac{১}{৪}$ দীনার কিংবা এর চেয়ে অধিক পরিমাণ চুরির জন্য হাত কাটতে হবে।" একই মুসলিমে আরো বর্ণিত আছে–

لَاتُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ اِلاَّ فِىْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا -

"এক চতুর্থাংশ দীনার' কিংবা এর চেয়ে অধিক মূল্যের বস্তু চুরি করার জন্যই কেবল চোরের হাতকাটা যাবে।"

বুখারীর এক রেওয়ায়েতে নবী করীম (সা) বলেছেন–

اِقْطَعُوْا فِىْ رُبْعِ دِيْنَارٍ وَلَاتَقْطَعُوْا فِىْ مَا دُوْنَ ذَالِكَ -

---

টীকা-১ : এ ব্যাপারে হযরত আবু হানীফার মত হলো, হাত কাটার মামলায় আর্থ-সামাজিক অবস্থা লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সমাজে অর্থনৈতিক সুষম বণ্টন ব্যবস্থা আছে কি না? এছাড়া চৌর্যবৃত্তিটা অভাবজনিত না অভ্যাস তাড়িত?

"এক চতুর্থাংশ দীনার চুরির দায়ে তোমরা হাত কাটো, এর চেয়ে কমের দায়ে কাটবে না।" তখনকার সময়ে $\frac{১}{৪}$ দীনার মূল্য ছিল তিন দিরহাম আর পূর্ণ দীনারের মুদ্রামান ছিল ১২ দিরহামের সমান।

আর কোন সুরক্ষিত মাল অপহরণ করার পরই কেবল চুরির অপরাধ সাব্যস্ত হবে।

যেমন, কোন বিনষ্ট, অরক্ষিত মাল কিংবা মাঠে-ময়দানে প্রাচীর ঘেরা বা বেড়াবিহীন বৃক্ষের ফল-ফুল অথবা রাখাল বিহীন পশু ইত্যাদি অপহরণ করাকে হদ্দ যোগ্য চুরি বলা হবে না। সুতরাং এমন সব দ্রব্য অপহরণের দায়ে হাতকাটা যাবে না। অবশ্য হরণকারীকে 'তাযীর' তথা শাসনমূলক শাস্তি দিতে হবে এবং দ্বিগুণ ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে, যেমন হাদীসে বলা হয়েছে।

ক্ষতিপূরণের মাত্রা কি হবে, সে সম্পর্কে আলিমগণের দ্বিমত রয়েছে। হযরত রাফি' ইবনে খাদীজ (রা) বর্ণনা করেন, আমি নবী করীম (সা)-কে ইরশাদ করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন– لَاقَطْعَ فِىْ ثَمْرَةٍ وَلَاكَثَرٍ "ফল এবং পাকা খেজুরে হাতকাটা যাবে না।" (সুনান)

আমর ইবনে শুআইবের দাদা বলেন : বনী মুযাইন গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে আমি নবী করীম (সা)-কে প্রশ্ন করতে শুনেছি–

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جِئْتُ اَسْئَلُكَ عَنِ الضَّالَّةِ مِنَ الاِبِلِ ـ

"আমি নিখোঁজ উট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য আপনার নিকট হাজির হয়েছি।" তিনি বললেন–

مَعَهَا غِذَائُهَا وَسَقَائُهَا تَاْكُلُ الشَّجَرَةَ وَتَرُ الْمَاءِ حَتّٰى يَاْتِيَهَا بَاغِيْهَا ـ

"আহারের ব্যবস্থা তার সাথেই রয়েছে, বৃক্ষ লতা খাবে আর ঘাটে পানি পান করবে। তাকে ছেড়ে দাও, তালাশকারী যেন এর কাছে পৌঁছে যায়।"

লোকটি বলল– فَالضَّالَّةُ مِنَ الْغَنَمِ "নিখোঁজ বকরী সম্পর্কে আপনার কি হুকুম?" হুজুর (সা) বললেন–

ولَكَ اَوْ لاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ تَجْمَعُهَا حَتّٰى يَاْتِيَهَا بَاغِيْهَا ـ

"তোমার জন্য, তোমার ভাইয়ের অথবা বাঘের জন্য হবে, এর সন্ধানকারী আসা পর্যন্ত একে হেফাজত কর।" সে বলল–

فَالْحَرِيْسَةُ الَّتِيْ تُؤْخَذُ مِنْ رَّائِعِهَا ـ

"'হারীসাহ' অর্থাৎ, রাখালের হেফাজত থেকে যা নিয়ে যাওয়া হয়।" তিনি বললেন–

فِيْهَا ثَمَنُهَا مَرَّتَيْنِ وَضَرْبُ نَكَالٍ وَمَا أُخِذَ مِنْ عَطْنِهِ فَفِيْهِ الْقَطْعُ اِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَالِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ ـ

"এর দ্বিগুণ মূল্য দিতে হবে এবং 'তাযীর' করতে হবে। আর গোয়াল থেকে অপহৃত জন্তুর মূল্য যদি ঢালের মূল্যের সমান হয়, তবে হাত কাটতে হবে।"

সে ব্যক্তি প্রশ্ন করল : হে রাসূলুল্লাহ! যদি ফল মূল চুরি করে তবে? হুজুর (সা) উত্তর দিলেন–

مَنْ اَخَذَ مِنْهَا بِفِيْهِ وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً عَلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنِ احْتَمَلَ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ مَرَّتَيْنِ وَضَرْبُ نَكَالٍ وَمَا اُخِذَ مِنْ اِجْرَالِهِ فَفِيْهِ الْقَطْعُ اِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَالِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ وَمَالَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلْدَاتُ نَكَالٍ ـ (سنن)

"যে ব্যক্তি খোসা ছাড়া নিজ মুখে এসবের কিছুটা পুরে দেয় এর জন্য কোন সাজা হবে না। কিন্তু যদি নিজের সাথে করে কিছুটা নিয়ে যায়, তবে দ্বিগুন মূল্য দিতে হবে এবং 'তাযীর' করতে হবে। কিন্তু যদি ঝোপসহ নিয়ে যায়, তবে এর মূল্য ঢালের মূল্যের সমান হয়, তবে হাত কাটতে হবে, আর যদি এর দাম ঢালের দামের চেয়ে কম হয়, তবে দ্বিগুণ জরিমানা দিতে হবে এবং কোড়ার আঘাতে তাকে তাযীর করতে হবে।" (সুনান)

অতঃপর তিনি আরো বলেন–

لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ وَلَاعَلَى الْمُخْتَلِسِ وَلَاالْخَائِنِ قَطْعٌ ـ

"লুটকারী, ছিনতাইকারী এবং খেয়ানতকারীর হাতকাটা যাবে না।"

পকেটমার, রুমাল কিংবা আস্তিনে রক্ষিত মাল অপহরণকারীকে আলিমগণের বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী হাতকাটা যাবে।

ব্যভিচারী ও সমকামীদের প্রস্তরাঘাতে সাজা

ব্যভিচারীর সাজা, প্রস্তরাঘাতে বিবাহিত ব্যভিচারীর প্রাণ সংহার করা। 'লাওয়াতাত' অর্থাৎ, সমকামিতার সাজা। যে সমকামী এবং যার সাথে এই ঘৃণ্য কাজ করা হবে, উভয়কেই হত্যা করা।

'রজম' তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করাই হলো বিবাহিত ব্যভিচারীর সাজা। রাসূলুল্লাহ (সা) মায়েয ইবনে মালিক আসলামী, 'গামেদিয়া' মহিলা* এবং কোন কোন ইহুদীকে 'রজম' করিয়েছিলেন। তাঁর পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদীন এবং মুসলমানগণ যিনার শাস্তিস্বরূপ 'রজম' করেছেন।

এখন 'রজমের' পূর্বে একশ কোড়া লাগিয়ে পরে 'রজম' করা হবে কিনা? এ ব্যাপারে ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ)-এর মযহাবে দু'ধরনের মত পরিলক্ষিত হয়।

(১) যিনাকারী যদি মুহসিন (বিবাহিত) না হয়, তবে কিতাবুল্লাহর বিধান মতে একশ কোড়া লাগাতে হবে।

(২) নবী করীম (সা)-এর হাদীসের নির্দেশ মতে একশ কোড়ার সাথে সাথে এক বৎসরের জন্য দেশান্তরিত বা নির্বাসনের হুকুম দিতে হবে। অবশ্য কোন কোন আলিমের মতে এক বছরের নির্বাসন দেয়া জরুরী নয়।

---

* টীকা : 'গামেদিয়া' বলে হাদীসে উল্লেখিত জনৈকা সাহাবিয়া মহিলার দ্বারা ব্যভিচারের কর্ম সংঘটিত হয়। এ বিষয়ে অন্য কারো খবর বা কল্পনাও ছিল না। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস ছিল, আমার অপরাধ সম্পর্কে মহান আল্লাহ জ্ঞাত রয়েছেন, তাঁর আযাব দুনিয়ার যাবতীয় কষ্টের চেয়ে ভীষণ পীড়াদায়ক। তাই হুযুর (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিজের কৃত অপরাধ সবিস্তার বর্ণনাপূর্বক আবেদন করলেন : "যথাযোগ্য শাস্তি দিয়ে আমাকে পবিত্র করুন।" হুযুর (সা) এটাকে তেমন গুরুত্ব না দেয়াতে পুনরায় আরয করলেন : হুযুর! আমার একথা কোন পাগলের প্রলাপ নয়। স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে আমি এ বক্তব্য রাখছি। আমাকে রজম করিয়ে দিন, যেন পরকালের আযাব থেকে নিষ্কৃতি পাই।" তিনি আরো বলেন : "অবৈধ মিলনের ফলেই আমি অন্তঃসত্তা হয়েছি বলে আমার বিশ্বাস। "বিবরণ শুনে হুযূর (সা) বলেন : "যদি তাই হয় তবে, এখন তোমার উপর হদ্দ জারি করা যাবে না। প্রসবের পর আসবে।"

প্রসবের পর সন্তান কোলে নিয়ে আল্লাহর সে বান্দী হুযূরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আবেদন জানালেন "হুযূর! আমি অমুক অপরাধিনী মহিলা। সন্তান প্রসব হয়ে গেছে, তাই শাস্তি দানে

অধিকাংশ ইসলামী আইনবিদের মতে চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ অথবা সে নিজে চারবার স্বীকার না করা পর্যন্ত যিনাকারীর উপর হদ্দ (শাস্তি) জারী করা যাবে না। কিন্তু কোন কোন আইনবিদ বলেন– চারবার স্বীকার করা বিশেষ জরুরী নয়। বরং একবার স্বীকার করাই যথেষ্ট। কেউ যদি প্রথমবার স্বীকার করার পর, পরে অস্বীকার করে বসে? এক্ষেত্রে কোন কোন আলিমের মতে তার থেকে হদ্দ (যিনার শাস্তি) রহিত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে, কারো কারো মতে হদ্দ রহিত হবে না (বরং তা কার্যকরী করতে হবে)।

'মুহসিন' তাকেই বলা হবে, যে ব্যক্তি 'আযাদ', 'হুর' মুকাল্লাফ (শরীয়তের বিধান পালনের যোগ্যা) এবং বৈধ বিবাহের পর আপন স্ত্রীর সাথে ন্যূনতম একবার মিলিত হয়েছে।

আর যার সাথে সহবাস করা হয়েছে উপরোক্ত শর্তাবলী পাওয়া যাওয়া সাপেক্ষে সে মুহসিন পর্যায়ভুক্ত কিনা? এ প্রশ্নও এখানে উথাপিত হয়। এ ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে দু'ধরনের মত লক্ষ্য করা যায়।

(১) মেয়ে 'মুরাহেকা' (বালেগ হওয়ার নিকটবর্তী) কিন্তু বালেগ পুরুষের সাথে যিনা করেছে। কিংবা পুরুষ 'মুরাহেক' (বালেগ হওয়ার নিকটবর্তী) বালেগা নারীর সাথে যিনা করেছে।

অতঃপর জিম্মিদের বেলায়ও একই হুকুম। যদি সে 'মুহসিন' হয় তবে, অধিকাংশ আলিমের মতে 'রজম' করা হবে। যথা– ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম আহমদ প্রমুখদের এই মত।

কেননা নবী করীম (সা) আপন মসজিদের দরজার সামনে ইহুদীদের 'রজম' করিয়েছেন আর ইসলামে এটাই ছিল প্রথম 'রজম'।

আমাকে নির্মল করুন।" হুযূর (সা) বললেন : বাচ্চা এখনো মায়ের দুধের উপর নির্ভরশীল। দুধ ছাড়িয়ে যখন রুটি খেতে শুরু করে তখন আসবে।" অতঃপর বাচ্চাটি রুটি খাওয়ার যোগ্য হওয়ার পর তার হাতে রুটির টুকরা দিয়ে হুযূরের (সা) নিকট হাজির হন। বাচ্চাটি তখন রুটি চাবাচ্ছিল। আবেদন করলেন : "হুযূর! আমি সেই অপরাধিনী। আমার বাচ্চার এখন দুধের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। দেখুন রুটি খাচ্ছে। এখন একে কারো হাতে সোপর্দ করে পরকালের আযাব থেকে আমার মুক্তির ব্যবস্থা করুন।"

সুতরাং মহিলাটিকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হল। পাথর নিক্ষেপকারীগণের মধ্যে এ একজন বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন। হুযূর (সা) একথা জানতে পেরে উক্ত সাহাবীকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি এরূপ কেন করলে? তুমি জান কি, সে এমন তওবাই করেছে যে, মদীনাবাসীদের সকলের মধ্যে তা বন্টন করে দিলে তাদের সবার নাজাতের জন্য যথেষ্ট।" আল্লাহু আকবর! পরকাল চিন্তার কি অপূর্ব নিদর্শন।

স্বামীহারা কোন নারীকে যদি গর্ভবতী অবস্থায় পাওয়া যায়। অধিকন্তু তার কোন মনিব বা প্রভু বর্তমান না থাকে এবং গর্ভে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ না থাকে তবে, ইমাম আহমদ (রহ) প্রমুখের মযহাবে দু'ধরনের মত পরিলক্ষিত হয়।

(১) তার উপর হদ্দ জারী করা যাবে না। কেননা হতে পারে বলপূর্বক তার সাথে যিনা করার পরিণামে সে গর্ভবতী হয়েছে। কিংবা জোরপূর্বক উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অথবা আপন স্ত্রী সন্দেহে কোনো অবস্থায় তার সাথে সহবাস করা হয়েছিল।

(২) তার উপর হদ্দ জারী করতে হবে। খোলাফায়ে রাশেদীন থেকে রেহাই প্রমাণিত এবং এটা শরীয়তের উসূলের অনুকূল, অধিকন্তু মদীনাবাসীদের মযহাবেও এটাই। কেননা এটা বিরল সম্ভাবনা। আর এ ধরনের বিরল সম্ভাবনার প্রতি গুরুত্ব দেয়া সমীচীন নয়।

যেমন– সে মিথ্যা স্বীকারোক্তি করেছিল অথবা সাক্ষীগণের সাক্ষ্য মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ার সম্ভাবনা।

'লূতী (পুং মৈথুনকারী) এবং 'লাওয়াতাত' (পুং মৈথুন) এর শাস্তি সম্পর্কে কোন কোন আইনবিদ বলেন– যিনার অনুরূপ হদ্দ অর্থাৎ সাজা তার উপরও প্রয়োগ করতে হবে। কারো কারো মতে, লাওয়াতাত তথা সমকামিতার অপরাধে যিনার চেয়ে অপেক্ষাকৃত লঘুদণ্ড প্রদান করা বিধেয়। অপর দিকে সাহাবা কিরাম (রা) সকলেরই এক ও অভিন্ন মত যে, মুহসিন কিংবা গায়র মুহসিন পুং মৈথুনকারী এবং পুং মৈথুনকৃত (فَاعِل وَمَفْعُوْل) উভয়কে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। কেননা হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত– নবী করীম (সা) বলেছেন–

مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ كَقَوْمِ لَوْطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ ـ

"যাকে, কওমে লূতের অনুরূপ কর্মরত দেখতে পাও (পুং মৈথুনকারী ও কৃত) উভয়কে প্রাণদণ্ড দেবে।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে আবূ দাউদ বর্ণনা করেন : অবিবাহিত লূতী বালককে যদি কোন নারীর সঙ্গে পাওয়া যায় তবে, তাকে 'রজম' করতে হবে। এ সম্পর্কে হযরত আলী (রা)-ও একই মত পোষণ করেন। কিন্তু অন্যান্য সাহাবী (রা) তার কতলের ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেন এবং বিভিন্ন

প্রকার মত ব্যক্ত করেছেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা) তাকে আগুনে পুড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

আর অন্যান্য সাহাবীগণ (রা) বলেন– তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হোক। কেউ বলেছেন– প্রাচীর চাপা দিয়ে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে। কেউ বলেছেন– কোনও পচা দুর্গন্ধময় স্থানে তাকে বন্দী করে রাখতে হবে, যাতে এ অবস্থায়ই সে মারা যায়। কেউ বলেন, এলাকার সর্বোচ্চ প্রাচীর চূড়া থেকে ভূ-তলে নিক্ষেপ করে উপর থেকে তার উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করতে হবে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তায়ালা কর্তৃক অদ্রূপ কওমে লূতকে শাস্তি দেয়া হয়েছিল। এটা ইবনে আব্বাস (রা)-র এক রেওয়ায়েত।

তাঁর অপর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তাকে রজম (প্রস্তারাঘাতে প্রাণদণ্ড) দিতে হবে। অধিকাংশ সল্‌ফে সালেহীনের অভিমতও এটাই। এ মতের প্রমাণস্বরূপ তাঁরা বলেন– মহান আল্লাহ্ তায়ালা কওমে লূতকে রজম করেছেন এবং এর সাথে সামঞ্জস্যের ভিত্তিতেই রজমের দ্বারা যিনাকারীর শাস্তি বিধান করা হয়েছে। আর পুং মৈথুনজনিত পাপাচারীদ্বয় উভয়ে আযাদ হোক কিংবা গোলাম অথবা একজন কারো ক্রীতদাস হোক, এরা বালেগ হলে তাদের দু'জনকেই রজম করতে হবে।

তবে পুং মৈথুনকারী কিংবা কৃত তাদের উভয়ের একজন নাবালেগ হলে তাকে মৃত্যুদণ্ডের চেয়ে নিম্নতর সাজা দিতে হবে। পক্ষান্তরে বালেগকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে।

[পনের]

মদ্যপায়ীদের সাজা

মদ্যপানের সাজা নবী করীম (সা)-এর হাদীস এবং ইসলামী আইনজ্ঞদের 'ইজমা' (ঐক্যমত্য)-এর ভিত্তিতে প্রমাণিত। যে ব্যক্তি শরাব পান করবে, তাকে বেত্রাঘাত করতে হবে। পুনরায় পান করলে দ্বিতীয়বার তাকে কোড়া লাগাতে হবে। নবী করীম (সা) থেকে বর্ণিত যে, মদ্যপায়ীকে তিনি বারংবার বেত্রাঘাত করেছেন। অধিকন্তু খোলাফায়ে রাশেদীন, ইজমা এবং অধিকাংশ উলামার অভিমতও এটাই।

মদ্যপানের শাস্তি : মদ্যপানের সাজা নবী করীম (সা)-এর সুন্নত এবং মুসলমানদের 'ইজমা' (ঐক্যমত) দ্বারা প্রমাণিত।

এ পর্যায়ে হাদীস বিশারদ এবং রেওয়ায়েতকারীগণ বিভিন্ন সূত্রে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (সা) বলেন–

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ - ثُمَّ اِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوْهُ ثُمَّ اِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوْهُ ثُمَّ اِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوْهُ -

"যে ব্যক্তি শরাব পান করবে তাকে কোড়া লাগাও, দ্বিতীয় বার পান করলে পুনরায় বেত্রাঘাত কর, আবার পান করলে আবারও কোড়া লাগাও, অতঃপর চতুর্থবার পান করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দাও।"

অধিকন্তু নবী করীম (সা) মদ্যপানের অপরাধে একাধিকবার বেত্রদণ্ড প্রদান করেছেন। তদুপরি পরবর্তীকালে খোলাফায়ে রাশেদীন এবং মুসলমানগণ একই অপরাধে বেত্রাঘাতের শাস্তি প্রদান করেছেন। সুতরাং এরই ভিত্তিতে মদ্যপানের অপরাধে হত্যার সাজা রহিত হয়ে গেছে বলে আলিমগণ অভিমত ব্যক্ত করে থাকেন। কিন্তু কারো কারো মতে এ সাজা 'মুহকাম' তথা স্থায়ী বিধান। পক্ষান্তরে কারো কারো মতে হত্যার মাধ্যমে দণ্ড দান করা ছিল একান্ত 'তা'যীর' অর্থাৎ শাসনজনিত সমাধান। সুতরাং প্রয়োজনবোধে ইমাম, রাষ্ট্রপতি কিংবা বিচারপতি এ দণ্ড বিধানেরও অধিকারী।

মহানবী (সা) থেকে প্রমাণ রয়েছে যে, তিনি শরাব পানের অপরাধে চল্লিশটি বেত্রাঘাত এবং জুতার দ্বারা প্রহার করেছেন। অনুরূপ সিদ্দীকে আকবর (রা) এ অপরাধে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছেন। অপরপক্ষে হযরত উমর (রা) আপন

খেলাফতকালে কোড়া মেরেছেন। কিন্তু হযরত আলী (রা) কখনো চল্লিশ (অবস্থাভেদে) আবার কখনো আশি কোড়ার হুকুম দিয়েছেন। কোন কোন আলিম বলেছেন, চল্লিশটি বেত্রাঘাত করা ওয়াজিব। কিন্তু মানুষ যদি মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং চল্লিশ বেত্রাঘাতে সাবধান না হয়, তবে, এর অধিক বেত্র দণ্ড ইমাম কিংবা বিচারপতির রায়ের উপর নির্ভরশীল। অথবা অনুরূপ অন্য কোন কারণ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় চল্লিশের অধিক আশি ঘা বেত মারবে। আর যদি পানকারীদের সংখ্যা অল্প হয় অথবা ঘটনাক্রমে কেউ কখনো কদাচিৎ পান করে ফেলেছে তবে, এক্ষেত্রে চল্লিশ কোড়াই যথেষ্ট। বস্তুতঃ এ মতই অধিকতর বাস্তবমুখী ও যুক্তিসঙ্গত। ইমাম শাফি'ঈও (রহ) এ মতের সমর্থক। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম আহমদও (রহ) এ মতই পোষণ করেন।

হযরত উমার (রা)-এর খেলাফতকালে মদ্যপানের অভিযোগ অধিকতর পরিমাণে আসতে থাকায় তিনি এর শাস্তির মাত্রাও বাড়িয়েছেন। এ জন্যে কাউকে দেশান্তরিত করেছেন আর কারো মাথা মুড়িয়ে অপমান করেছেন। সুতরাং এগুলো ছিল তাঁর শাসনমূলক অতিরিক্ত সাজা। শরাবীকে চল্লিশটি করে দু'বার বেত্রাঘাত করার পরও যদি 'তা'যীর' (অতিরিক্ত সাজা) করার প্রয়োজন পড়ে তবে তার খোরাক বন্ধ করে দিয়ে তাকে দেশান্তরিত করাই উত্তম।*

কোন কোন নায়েব বা প্রতিনিধি মদের প্রশংসায় কবিতা, ছন্দ রচনা করেছেন– এ মর্মে সংবাদ পাওয়ার পর হযরত উমর (রা) তাকে পদচ্যুত করেছেন।

---

* টীকা : হযরত আবূ শাহ্জান সকফী (রহ) এক কালে মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিলেন। হযরত উমর (রা) শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তাঁকে বেত্রাঘাত করেন; কিন্তু তিনি বিরত হননি। পুনরায় পান করেন; হযরত ফারুক আযম (রা)ও একই নিয়মে তাঁর উপর দ্বিতীয়বার শাস্তি প্রয়োগ করেন। কিন্তু তাতেও কোন কাজ হল না; বার বার অভ্যাস মত তিনি শরাব পান করতে থাকেন আর কোড়ার আঘাত সইতে থাকেন। অবশেষে হযরত উমর (রা) তাঁকে কয়েদ এবং দেশান্তর করে রাখার নির্দেশ দান করেন। এ পর্যায়ে তাঁকে হযরত সা'আদ (রা)-এর নিকট সোপর্দ করেন যে, যেখানেই তুমি থাকবে অথবা যাবে তাকে সঙ্গে রাখবে। তদুপরি বেড়ি লাগিয়ে তাকে পৃথকভাবে বসিয়ে রাখবে। হযরত সা'আদ (রা) আবূ শাহ্জানকে নিজের সঙ্গে নিয়ে তার পায়ে বেড়ি লাগিয়ে দিলেন। এখন যেখানেই তিনি যান তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যান। এমনিভাবে এক পর্যায়ে বিভিন্ন মনযিল অতিক্রম করে তিনি সুদূর ইরানের কাদেসিয়ার রণক্ষেত্রে উপনীত হন।

কাদেসিয়ার এ ভয়াবহ সময় হযরত সা'আদ (রা) ছিলেন মুসলিম বাহিনীর প্রধান সেনাপতি। এ ঘোরতর লড়াইয়ে শত্রুপক্ষ প্রাধান্য বিস্তার করে মুসলিম বাহিনীর উপর বিরাট চাপ সৃষ্টি করে, যার ফলে মুসলিম সেনাদল তিনশ ষাট মাইল পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়। এ পশ্চাদপসরণের আড়ালে নতুন প্রেরণায় বলীয়ান হয়ে ইসলামী বাহিনী চূড়ান্ত বিজয়ের লক্ষ্যে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে। সেনাপতি হযরত সা'আদ (রা) ইতিপূর্বে সামান্য জখম হওয়ার কারণে মূল রণাঙ্গনে

নবী করীম (সা) যে মদ 'হারাম' ঘোষণা করেছেন এবং সে মদ পান করলে কোড়া লাগিয়েছেন তা হলো যদ্দ্বারা নেশা হয় আর আক্ল-বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায়, এর উপাদান যাই থাকুক এবং যে কোন জিনিস দ্বারাই তা প্রস্তুত করা হোক না কেন। যেমন আঙ্গুর, খেজুর, আঞ্জীর ইত্যাদি। অথবা তরকারী বা সবজি থেকে। যথা, গম, যব ইত্যাদি। কিংবা মধু ইত্যাদি জাতীয় তরল পদার্থ থেকে তৈরী করা হোক। কিংবা পশুর দুগ্ধ দ্বারা তৈরী করা হোক।

সকল প্রকার মদ নিষেধের অন্তর্ভুক্ত। অধিকন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর শরাব হারামকারী কুরআনের আয়াত যখন নাযিল হয়, তখন মদীনা শরীফে আঙ্গুরের নাম গন্ধও বর্তমান ছিল না।

সিরিয়া কিংবা অন্যান্য দেশ থেকে আঙ্গুর আমদানী করা হতো। তৎকালীন আরবে সাধারণতঃ খেজুর কিংবা খেজুর ভিজানো পানি থেকে শরাব প্রস্তুত করা হত। কিন্তু এ সম্পর্কে নবী করীম (সা)-এর সহীহ্ হাদীস খোলাফায়ে রাশেদীন এবং সাহাবা কিরামগণ থেকে যা প্রমাণিত রয়েছে, তাহলো নিশা জাতীয় প্রত্যেক জিনিসই হারাম। মহানবী (সা) নেশা জাতীয় এমন প্রতিটি বস্তু হারাম ঘোষণা

উপস্থিত থাকতে পারেননি। অবশ্য একটি ভবনের ছাদে বসে তিনি যুদ্ধের গতিবিধি লক্ষ্য করতে থাকেন। এরি মধ্যে এক পর্যায়ে লড়াই প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে। শত্রুপক্ষের প্রচণ্ড আক্রমণের মুকাবিলায় টিকতে না পেরে মুসলমানগণের পশ্চাদপসরণ লক্ষ্য করে পরিতাপের সুরে তিনি বার বার- لاَ حَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمِ.

"শক্তি সঞ্চালনী এ দু'আটি উচ্চারণ করতে থাকেন।" ঘটনাক্রমে হযরত আবূ মাহ্জান (রা) এ সংকটজনক পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারেন। কেননা হযরত সা'আদ (রা) যে বাড়ীতে বাস করছিলেন তার নীচ তলায় শিকল বেঁধে তাঁকে আটক রাখা হয়েছিল। মুসলমানদের এ শোচনীয় অবস্থা দৃষ্টে তিনি অধীর আবেগে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে সে কবিতাটি বারংবার আবৃত্তি করতে থাকেন। তাহলো- كَفٰى حُزْنًا اَنْ تَطْرُدَ الْخَيْلَ بِالْقِنَا ـ وَاتْرُكُ مَشْدُوْدًا عَلَىَّ وَثَاقِيَا.

"আজ আমার অন্তহীন দুঃখ-বেদনা এবং সীমাহীন জ্বালা-যন্ত্রণার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, দুশমনের মুকাবিলায় রণক্ষেত্রে অন্যরা ঘোড়া দৌড়াচ্ছে আর আমি শিকল বাঁধা পায়ে হাহুতাশ করে মরছি।" এমনি ছড়া ছন্দ আবৃত্তির আড়ালে তিনি চোখের পানি ফেলতে থাকেন। কিন্তু কি করবেন কোন উপায় নাই। মর্ম জ্বালায় টিকতে না পেরে অবশেষে হযরত সা'আদ (রা)-এর স্ত্রীর নিকট আবেদন করলেন- হে পুণ্যবতী মহিলা! হে হাফসা তনয়া! আল্লাহর নামে আমায় মুক্ত করে দিন আর পায়ের শিকল খুলে দিন। কেননা মুলসমানরা লড়ে যাচ্ছে অথচ আমি জিহাদের ফজীলত ও এর পুণ্য সুফল থেকে বঞ্চিত। মুসলমামনদের উপর কঠিন সংকট আপতিত আর আমি শৃংখলাবদ্ধ অবস্থায় সময় কাটাচ্ছি। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি- যুদ্ধের মদয়ান থেকে যদি নিরাপদে ফিরে আসতে পারি তবে পুনরায় নিজ হাতে আপন পায়ের শিকল জড়িয়ে

করেছেন, যা সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির বিলুপ্তি ঘটায় এবং জ্ঞান বা চিন্তা শক্তি বিনষ্ট করে দেয়। বস্তুতঃ সাহাবায়ে কিরাম স্বভাবতঃ সুমিষ্ট 'নবীযে তমর' (খেজুর ভিজানো পানি) পান করতেন যার প্রস্তুত প্রণালী ছিল খেজুর কিংবা অঙ্গুর পানিতে ভিজিয়ে রাখা হত এবং নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর প্রয়োজন মত তা পান করতেন। কেননা হিজাযের পানি সাধারণতঃ লবনাক্ত এবং সুপেয় পানি এখানকার জনজীবনে ছিল এক দুর্লভ বস্তু। কিন্তু নবীয পান করা ততক্ষণ পর্যন্তই জায়েয, যতক্ষণ পর্যন্ত তাতে নিশা বা মাদকতার আমেজ না ঘটে। সকল মুসলিম মনীষী এবং গোটা মুসলিম উম্মাহর এটাই সর্ববাদীসম্মত অভিমত। কেননা তাতে নিশা হয় না। আঙ্গুরের শিরা যেমন নিশা ধরার পূর্ব পর্যন্ত পান করা জায়েয। নবী করীম (সা) কাষ্ঠ নির্মিত পাত্র অথবা কালাই করা ধাতব ভাণ্ডে নবীয তৈরী করতে নিষেধ করেছেন। বরং তিনি এমন কাঁচা পাত্রে নবীয তৈরী করার হুকুম দিয়েছেন যার মুখ আটকিয়ে রাখা যায়। এর অন্তর্নিহিত কারণ হল, নিশাদার হলে পর এসব কাঁচা পাত্র ফেটে যায়। যার ফলে সহজেই বুঝা যায় যে, রক্ষিত নবীয নিশাদার হল কি না। পক্ষান্তরে কালাই করা ধাতব পাত্রে নবীযে নিশা আসার পর ফাটে না কিংবা বাহ্য দৃষ্টিতে তাতে কোনরূপ চিহ্নও ফুটে উঠে না।

নেব। আর বর্তমানের ন্যায় এমনিভাবে আমাকে শিকল পরিয়ে দেবেন। অতঃপর হযরত সা'আদ (রা)-এর স্ত্রী স্বামীর অসন্তুষ্টির পরোয়া না করে আবু মাহ্জানের পায়ের বেড়ী খুলে দেন।

সদ্যমুক্ত আবূ মাহ্জান আবেদন করলেন– হে পুণ্যবতী নারী! সওয়ারীর উদ্দেশ্যে আমার জন্য একটি ঘোড়ার বন্দোবস্ত করে দিন। সুতরাং হযরত সা'আদ-পত্নী স্বামীর বিনা অনুমতিতেই হযরত সা'আদ (রা)-এর 'আবলক (স্বেত-কৃষ্ণ) ঘোড়া' লৌহ বর্ম, বর্শা এবং তাঁর তরবারী এনে হযরত আবূ মাহ্জান (রা)-এর হাতে সোপর্দ করে দিলেন। হযরত আবূ মাহ্জান (রা) তৎক্ষণাৎ অশ্বে আরোহণ করে অশ্ব ছুটিয়ে চোখের পলকে রণাঙ্গনে পৌছে গেলেন এবং যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। হযরত আবূ মাহ্জান বীর বিক্রয়ে শত্রু পক্ষের রক্ষাবুহ্য ছিন্ন করে প্রচণ্ড আক্রমণে তাদের কচু কাটা করতে শুরু করলেন। তাঁর বীরত্বপূর্ণ, অপ্রতিরোধ্য আঘাতের ফলে শত্রু বাহিনী ছত্র ভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং শোচনীয় পরাজয়ের মুখ তাদের দেখতে হয়। এতক্ষণে উপস্থিত সকলে পরস্পর বলাবলি করতে থাকে– মুসলমানদের সাহায্যে আল্লাহ্ তায়ালা আকাশ থেকে ফিরিশতা নাযিল করেছেন এবং তিনি অলৌকিক কার্য করে যাচ্ছেন। এদিকে সেনাপতি হযরত সা'আদ (রা)ও এক অসাধারণ যুদ্ধের বীরত্ব পূর্ণ খেলা প্রত্যক্ষ করে বলতে থাকেন–

اَلصَّبْرُ اَلصَّبْرُ بِلِقَاءِ وَالظَّفْرُ ظَفْرِ اَبِىْ مَحْجَنْ وَاَبُوْ مَحْجَنْ فِى الْقَيْدِ ـ

"অশ্বের তীব্রগতি এবং বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়া দৃষ্টে মনে হয় এটি আমারই আবলাক ঘোড়া আর সাফল্য ও বিজয়ের প্রতি লক্ষ্য করলে মনে হয় এ যেন আবূ মাহ্জানেরই বিজয়। অথচ আবূ মাহ্জান শৃংখলাবদ্ধ অবস্থা এবং বন্দীদশায় দিন গুনছে।"

পরিশেষে এ যুদ্ধে মুসলমানদের অভাবনীয় বিজয় লাভ হয়। পক্ষান্তরে শত্রু পক্ষের শোচনীয়

সুতরাং পানকারীর ধোকায় পড়া কিংবা ভুল করার কোন আশংকা বিদ্যমান থাকে না। অবশ্য অপর এক রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (সা) পরবর্তীকালে কালাইকৃত ধাতব পাত্রে নবীয তৈরীর অনুমতি দান করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমান–

نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْاِنْتِبَاذِ فِى الْاَوْعِيَةِ فَانْتَبِذُوْا وَلَاتَشْرَبُوا الْمُسْكِرَ.

"আমি তোমাদেরকে কালাইকৃত ধাতবপাত্রে নবীয তৈরী করতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু (এখন) তোমরা তাতে তৈরী কর, অবশ্য নেশাদার হয়ে গেলে তোমরা তা পান করো না।"

এ সম্পর্কে সাহাবী এবং পরবর্তী যুগের আলিমগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। পূর্ববর্তী হুকুম বাতিল হওয়ার সম্পর্কে যারা অবহিত ছিলেন না কিংবা যাদের নিকট এ জাতীয় পাত্রে নবীয তৈরী করা প্রমাণিত নয়, তাঁদের মত হল এ জাতীয় পাত্রে নবীয তৈরী করা নিষিদ্ধ।

পরাজয় ঘটে– যা ইসলামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এদিকে আবূ মাহ্জান (রা) রণক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তন করে কথানুযায়ী পায়ে শিকল বেঁধে যথাস্থানে বসে পড়েন। কিন্তু হযরত আবূ মাহ্জানের কৃতিত্ব এবং ঐতিহাসিক ঘটনা গোপন থাকার বিষয় নয়। হযরত সা'আদ (রা) এতক্ষণে বাড়ীর ছাদ থেকে নীচে নেমে আপন স্ত্রী বিনতে হাফসাকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন– মুসলমানগণ নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে ছিল কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালা আকাশ থেকে ফিরিশতা নাযিল করায় তাদের যে পরাজয়' বিজয়ে রূপ লাভ করে। কিন্তু তার ঘোড়াটি ছিল আমারই ঘোড়ার ন্যায়। আর বর্শা, বর্মও ছিল আমার অস্ত্রগুলোরই অনুরূপ। ময়দানে নেমেই সে এমনভাবে শত্রু নিধন করে যার ফলে শত্রু বাহিনীতে মাতম শুরু হয় এবং তারা ছত্র ভঙ্গ হয়ে পড়ে। অতঃপর সে ফিরিশতা কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে যায়।

হযরত সা'আদ (রা)-র স্ত্রী বিনম্র বদনে আবেদন করলেন– আপনি কি চিনতে পারছেন সে কে ছিল? ইনি সেই বীর পুরুষ যাকে আবূ মাহ্জান বলা হয় আর সে শৃংখলাবস্থায় আপনার ঘরে দিন গুনছে। মুসলমানদের পরাজয় সংবাদ শুনে কসম খেয়ে আমাকে বলতে থাকে– "আমায় মুক্ত করে জিহাদের ময়দানে যুদ্ধ করতে দিন। জীবিত থাকলে ফিরে এসে আপন পায়ে নিজ হাতে শিকল পরে নেব। তার কথায় আস্থা রেখে আমি তার বন্ধন খুলে দেই। অতঃপর সে আপনার ঘোড়াটি প্রার্থনা করলে আমি তাকে আপনার ঘোড়া প্রদান করি। আর আপনার তরবারী বর্শা, বল্লম ইত্যাদি অস্ত্র শস্ত্রের আবেদন করলেন, সেই সবই আমি তার হাতে অর্পণ করি। যাবতীয় অস্ত্র হাতিয়ার সহ সে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অতঃপর মুসলমানদের জয় লাভের পর ফিরে এসে সে নিজ পায়ে শিকল বেঁধে যথাস্থানে বসে যায়। সেনাপতি হযরত সা'আদ (রা) আবূ মাহ্জান (রা)-র সাহসিকতা, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের বাস্তব ঘটনা শুনে চিৎকার দিয়ে উঠেন। ক্রন্দনরত অবস্থায় বলতে থাকেন– আবূ মাহ্জানের ন্যায় বীর বাহু খলীফার নির্দেশে সর্বক্ষণ শিকল বেঁধে আটক পড়ে থাকবে এটা কেমন

অপরপক্ষে যারা মনে করতেন, পূর্ব হুকুম বাতিল হয়ে গেছে, তারা এসব পাত্রে নবীয তৈরী করার অনুমতি দিতেন।

অপরদিকে ফকীহগণের এক দল যখন জানতে পারলেন যে, কোন কোন সাহাবী নবীয পান করতেন– তখন তাঁরা মনে করলেন যে, নেশাযুক্ত নবীয পান করতেন। কাজেই তাঁরা বিভিন্ন প্রকারের শরবত বা পানীয় পান করার অনুমতি দান করেন। কিন্তু তা যেন আঙ্গুর ও খেজুর ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুত না হয়। পক্ষান্তরে নেশাযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত নবীযে তমর' ও কিসমিসের শিরা বা রস পান করার অনুমতি দান করেন।

কিন্তু বিশুদ্ধ ও সঠিক পন্থা এটাই– যা গোটা মুসলিম উম্মাহ্ তথা জমহুরের সর্ববাদী সম্মত মত, আর তা হলো নেশাদার জ্ঞান লোপকারী প্রত্যেক জিনিসই 'খমর' তথা মদ হিসেবে গণ্য। আর তা পানকারীর উপর হদ্দ জারী করতে হবে, চাই এক কৌটাই পান করুক কিংবা ঔষধ হিসাবেই পান করে থাকুক। কেননা নবী করীম (সা) 'খমর' ব্যতীত অন্য কোন ঔষধ যদি না পাওয়া যায় তবে? প্রশ্নের জবাবে ইরশাদ ফরমান–

اِنَّهَا دَاءٌ وَلَيْسَتْ بِدَوَاءٍ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ اُمَّتِىْ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا ـ

কথা? তৎক্ষণাৎ তিনি হযরত আবূ মাহ্জান (রা) সকল বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করে আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা)-র খিদমতে পত্র প্রেরণ করেন। হযরত উমর (রা) পত্র পাঠে বিস্তারিত বিষয় অবহিত হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে হযরত আবূ মাহ্জান (রা)-র নামে চিঠি লিখেন–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ عُمَرَ اِلٰى اَبِىْ مَحْجَنْ اللّٰهِ ـ اَللّٰهُ يَا اَبَا مَحْجَنْ ـ

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহর বান্দা উমরের পক্ষ হতে আবূ মাহ্জান বরাবরে। আল্লাহ (তোমায় আরও তাওফীক দিন) হে আবূ মাহ্জান!"

সেনাপতি হযরত সা'আদ (রা) অবাক হয়ে বলতে থাকেন : আল্লাহর কসম! এমন ব্যক্তিকে কখনো আমি প্রহার করবো না। দ্বিতীয়তঃ আর কখনো শিকল বেঁধে রাখাটাও সমীচীন নয়। তোমরা লক্ষ্য করে থাকবে, মুসলমানরা কি দারুণ সংকটে পরিবেষ্টিত ছিল, ইসলাম ও কুফরের মধ্যে ছিল এক আপোষহীন সংগ্রাম। এমনি কঠিন পরীক্ষার চরম মুহূর্তে আবূ মাহ্জানের আত্মত্যাগ নিষ্ঠাপূর্ণ কৃতিত্ব ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। এমনি সপ্রশংসা উক্তির পর পরই হযরত আবূ মাহ্জানন (রা) বলে উঠেন– আল্লাহর কসম! জীবনে আর কখনো শরাব পানের নামও নেব না, এখন থেকে জীবনের তাওবা করছি। বাকি জীবনের জন্য, আমি মদ বা শরাব স্পর্শ না করার প্রতিজ্ঞা এবং তওবা করছি। পরবর্তী কালে আল্লাহ্ তায়ালা হযরত আবু মাহ্জান (রা)-কে আপন তাওবায় আমরণ সুদৃঢ় অটল থাকার তৌফিক দান করেছিলেন।

"এটাতো রোগ– ঔষধ নয় এবং নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ আমার উম্মতের রোগ মুক্তি হারাম বস্তুতে নিহিত রাখেননি।"

মদ্যপানের সাক্ষী পাওয়া গেলে অথবা মদ্যপায়ী নিজে স্বীকার করলে শরাব-খোরের উপর হদ্দ জারী করা ওয়াজিব। কিন্তু মুখ থেকে মদ বা শরাবের দুর্গন্ধ বের হয় কিংবা মানুষ তাকে বমি করতে দেখেছে অথবা মদ্যপানের অন্য কোন নিদর্শন তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, তাহলে এমতাবস্থায় বলা হয়েছে যে, তার উপর হদ্দ জারী করা যাবে না। কেননা, এটা নেশাবিহীন শরাব অথবা সে অজ্ঞাতসারে পান করেছে কিংবা বলপূর্বক তাকে পান করানো হয়েছে ইত্যাদি সম্ভাবনা এসব ক্ষেত্রে বিদ্যমান রয়েছে। বরং শরাব নেশাযুক্ত হলে তাকে কোড়া লাগাতে হবে। খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবা কিরাম বা হযরত উসমান, হযরত আলী এবং হযরত ইবনে মাসউদ (রা) প্রমুখ এ মতের সমর্থনকারী। সুন্নতে নববীও এরই প্রতি ইঙ্গিত বহন করে, মানুষের বাস্তব আমলও অনুরূপ। অধিকন্তু ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ (রহ)-এর মযহাবও এটাই এবং তাঁরা এর বিস্তারিত ব্যাখ্যাও দান করেছেন।

আঙ্গুর এবং খেজুর পাক করে যে শরাব তৈরী করা হয় সেটাও হারাম আর এর পানকারীকে বেত্রদণ্ড দিতে হবে। এটা খমর বা মদের চেয়েও অধিক নিকৃষ্টতর। কেননা, এ দ্বারা জ্ঞান ও মন-মেযাজ উভয়ই নষ্ট হয়। এমনকি এর প্রভাবে সুস্থ মানুষ ক্লৈবত্বের শিকার হয় এবং চরিত্রে সৃষ্টি হয় দায়ূছী স্বভাব। দ্বিতীয়তঃ শরাব বা মদ অধিক অনিষ্টকারী ও খবীস এ জন্যে যে, এর ফলে লোক সমাজে কলহ বিবাদ, মারামারী হানাহানির ন্যায় মারাত্মক সামাজিক তিক্ততার সৃষ্টি হয় এবং চারিত্রিক ঘৃণ্য ব্যাধি জন্ম নেয়। অধিকন্তু এটা যেমন বান্দাকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখে, তদ্রূপ নামায থেকে ঐ ব্যক্তিকে দূরে সরিয়ে নেয়।

পরবর্তী যুগের কোন কোন ফকীহ মদ্যপানের অপরাধে হদ্দ জারী করা থেকে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। তাঁদের মতে হদ্দের চেয়ে নিম্নতর সাজা অর্থাৎ তা'যীর করতে হবে। কেননা এর দ্বারা জ্ঞান ও চরিত্রে বিকৃতির সম্ভাবনা বিদ্যমান, যা ভাং পানের সমতুল্য। অপরদিকে মুতাকাদ্দিমীন (প্রাথমিক যুগের) ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ওলামাগণ থেকে এ সম্পর্কিত কোন সিদ্ধান্ত বা মীমাংসার প্রমাণ পাওয়া যায় না। অথচ এ ঘাস-পাতা এরূপ নয় বরং মানুষ মনের আনন্দে এগুলো খেয়ে থাকে এবং এমন আগ্রহ নিয়ে থাকে যে, পরিমাণে আরও বেশী বলে আরও খাবে যেমনটি শরাব ও খমরের বেলায় করে থাকে। এতে অধিকাংশ সময় আল্লাহর স্মরণে অনাসক্তি ইত্যাদি ত্রুটি এসে যায়। আর পরিমাণে বেশী হলে

নামাযেও ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দেয়। অধিকন্তু দায়ূছী, ক্লৈবত্ব' সৃষ্টি হয় এবং জ্ঞান-বুদ্ধি ও মন-মগজ বিনষ্ট হয়ে যায়।

কিন্তু এটা যদি গাঢ় ও কঠিন হয়, আনুষঙ্গিক খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং মদের প্রকারভুক্ত না হয়, এমতাবস্থায় এর নাপাক বা অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে তিন ধরনের অভিমত লক্ষ্য করা যায়।

(১) ইমাম আহমদ (রহ) ও অন্যান্যের মযহাব অনুযায়ী মদের ন্যায় এটিও নাপাক। এ মতই বিশুদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য।

(২) কারো কারো মতে জামেদ তথা কঠিন হওয়ার কারণে এটা নাপাক নয়।

(৩) কেউ কেউ কঠিন ও তরলের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। মোটকথা, এটাও আল্লাহ ও নবী করীম (সা) কর্তৃক হারাম কৃত জিনিসের শামিল।

কেননা, শাব্দিক ও আর্থিক উভয় দিক থেকেই এটা মদ, শরাব, খমর ও নেশাযুক্ত বস্তু।

হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মহানবী (সা)-এর খিদমতে আরয করেন, হে রাসূলুল্লাহ! আমাদের ইয়ামানে প্রস্তুত 'তুবা' ও 'মীযার' নামীয় দু'ধরনের মদ সম্পর্কে ফায়সালা দান করুন। 'তুবা' মধু থেকে তৈরী করা হয়। এগুলোর মধ্যে তেজী ভাব এলে এগুলো নেশার পর্যায়ে পৌঁছে, তখন এসবের হুকুম কি? মহানবী (সা) অল্প কথায় অধিক অর্থবোধক বাক্যের অধিকারী ছিলেন। সুতরাং উত্তরে তিনি বলেন–

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ - (رواه فى الصحيحين)

"প্রত্যেক নেশাদার বস্তুই হারাম।" (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত নবী করীম (সা) বলেছেন–

اِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا وَمِنَ الشَّعِيْرِ خَمْرًا وَمِنَ الزَّبِيْبِ خَمْرًا وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا وَمِنَ الْعَسَلِ وَاَنَا اَنْهٰى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ. (رواه ابو داود وغيره)

গম থেকে এক প্রকার শরাব প্রস্তুত করা হয়। আর যব, কিসমিস, খেজুর এবং মধু থেকেও প্রস্তুত করা হয়। আমি নেশা ও মাদকতা সৃষ্টিকারী প্রত্যেক বস্তু হারাম ঘোষণা করছি। (আবু দাউদ)

কিন্তু উক্ত রেওয়ায়েত বুখারী ও মুসলিমে হযরত উমর (রা)-র উক্তিরূপে চিহ্নিত। আর নবী (সা) করীম (সা)-এর মিম্বরে দাঁড়িয়ে তিনি মন্তব্য করেন–

اَلْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ ـ

"খমর সেটাই– যা জ্ঞান লোপ করে দেয়।"

অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত.....

كُلُّ مُسْكَرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ ـ

"নেশা সৃষ্টিকারী প্রতিটি বস্তুই খমর আর সর্বপ্রকার খমর হারাম।" ইমাম মুসলিম তাঁর বিশ্ব বিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ সহীহ মুসলিমে দুটি রেওয়ায়েতই বর্ণনা করেছেন।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন–

كُلُّ مُسْكَرٍ حَرَامٌ وَمَا اَسْكَرَ الْفَرْقُ مِنْهُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ.

"নেশা সৃষ্টিকারী প্রত্যেক বস্তুই হারাম। আর যে বস্তু এক মটকা পরিমাপ পান করলে নেশা ধরে, তার এক আঁজলা পরিমাণও হারাম।"

হাদীস বিশারদগণ বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন–

مَا اَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ ـ

"যে জিনিস অধিক পান করলে নেশা ধরে, তার কিঞ্চিৎ পরিমাণও হারাম।" হাদীসবিদগণ রেওয়ায়েতটি বিশুদ্ধ বলে স্বীকার করেছেন।

হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত– কোন ব্যক্তি মহানবী (সা)-কে প্রশ্ন করল : "আমাদের অঞ্চলে মীযর নামে এক প্রকার বীজ থেকে শরাব তৈরী করা হয়। এ সম্পর্কে আপনার হুকুম কি?" জবাবে তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন–

اَسْكَرٌ هُوَ؟

"উহা কি নেশা সৃষ্টি করে?"

লোকটি বললেন : জি-হাঁ।

হুযূর (সা) ইরশাদ করলেন–

كُلُّ مُسْكَرٍ حَرَامٌ عَلَى اللّٰهِ عَهْدًا لِمَنْ شَرِبَ الْمُسْكَرَ اَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِيْنَةِ الْخَبَالِ ـ

"নেশা সৃষ্টিকারী প্রত্যেক বস্তু হারাম। আর যে ব্যক্তি নেশা সৃষ্টিকারী পানীয় পান করবে– আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে 'তীনাতুল খাবাল' পান করাবার হুমকি রয়েছে।" সাহাবীগণ আরয করলেন–

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا طِيْنَةُ الْخَبَالِ؟

"হে রাসূলুল্লাহ! 'তীনাতুল খাবাল' কি জিনিস?" হুযূর (সা) ইরশাদ করেন–

عَرْقُ اَهْلِ النَّارِ - (مسلم)

দোযখীদের (দেহ থেকে নির্গত) ঘর্ম, অর্থাৎ তরল দুর্গন্ধময় পদার্থ।" (সহীহ মুসলিম)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত নবী করীম (সা) বলেছেন–

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ - (ابو داؤد)

"নেশা সৃষ্টিকারী জিনিস মাত্রই খমর আর প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারীই হারাম।" (আবূ দাঊদ)

মোটকথা ,এ সম্পর্কিত অগণিত হাদীস বর্ণিত রয়েছে। হুযূর আকরাম (সা)-এর কথা যেহেতু 'জাওয়ামিউল কালিম' (ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য), তাই সব কিছুকে সংরক্ষিত আকারে প্রকাশ করাই তাঁর বৈশিষ্ট্য। তাঁর উক্তি হলো, জ্ঞান বুদ্ধি লোপকারী এবং নেশা সৃষ্টিকারী প্রতিটি বস্তু হারাম। চাই সে খাদ্য হোক কিংবা পানীয়।[১] তাই, শরাব বা খমর নেশা সৃষ্টি করে বলেই হারাম। মুতাকাদ্দিমীন এর কোনো গুণাগুণ সম্পর্কে আলোচনা করেননি। কেননা হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দী কিংবা তার নিকটবর্তী কোনও এক সময় এর উৎপাদন শুরু হয়। যেমনি ভাবে বহু প্রকার মদ নবী করীম (সা)-এর পরবর্তী যুগে তৈরি হতো। কিন্তু তা সবই সেই অভিন্ন কারণ ও 'ব্যাপক কার্যবোধক' মহান বাক্যের আওতায় এসে যায়, যেগুলো কুরআন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

টীকা-১ : মানব দেহের জন্যে চরম ক্ষতিকারক মাদকদ্রব্য এদেশ সহ কত দেশের কত পরিবারের মেধাবী সুস্থ সন্তানদের জীবন বিনষ্ট করেছে, বাংলাদেশের সমাজ জীবনে এবং বিভিন্ন পরিবারে এর ভয়াবহ ও যন্ত্রণাদায়ক দৃষ্টান্ত থেকে অনুমেয়।

[ষোল]

অপবাদের শাস্তি

অপবাদ দেয়ার (কাযাফ) শাস্তি, চরিত্রবান ব্যক্তির উপর যিনার মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা এবং দোষারোপকারীকে বেত্রাঘাতের সাজা প্রদান–

যে সকল হদ্দ বা সাজা সম্পর্কে কুরআন হাদীসের প্রমাণাদি বিদ্যমান, অধিকন্তু যার উপর মুসলিম উম্মাহর 'ইজমা' তথা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, 'হদ্দে কযফ'ও সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত। কোনও চরিত্রবান ব্যক্তির (মুহসিন)- উপর কোন লোক যিনা কিংবা লাওয়াতাত (সমকামিতা)-এর মিথ্যা অভিযোগ আনলে, উক্ত দোষারোপকারী লোকটিকে বিচারক কর্তৃক আশিটি বেত্রদণ্ড প্রদান ওয়াজিব হয়ে যায়। এক্ষেত্রে 'মুহসিন' অর্থ মুক্ত স্বাধীন এবং নির্মল নিষ্কলংক চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি। পক্ষান্তরে যিনার শাস্তির ক্ষেত্রে উল্লেখিত 'মুহসিন' শব্দের তাৎপর্য হল, শরীয়ত পদ্ধতিতে বৈধ বিবাহের ভিত্তিতে আপন স্ত্রীর সাথে সহবাসকারী ব্যক্তি। (ইতিপূর্বে যার আলোচনা হয়েছে।)

[সতের]

যেসব অপরাধের সাজা অনির্ধারিত এবং শাসক ও বিচারকের ইচ্ছাধীন

যে সকল গুনাহ বা অপরাধের সাজা অনির্দিষ্ট অধিকন্তু কাফ্ফারারও কোন উল্লেখ নেই, সেগুলোর দণ্ড বা সাজা, শিক্ষামূলক শাস্তি বিচারক কিংবা শাসনকর্তার রায়ের উপর নির্ভরশীল। স্থান কাল পাত্র ভেদে এবং ক্ষেত্র বিশেষে এর যথাযোগ্য দণ্ড বিধানে তাদেরই ভূমিকা প্রসঙ্গে এই পরিচ্ছেদের আলোচনা।

যে সকল অপরাধের নির্দিষ্ট শাস্তি কিংবা কাফফারার কোন উল্লেখ নেই যেমন কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক কিংবা পরনারীকে চুমো খাওয়া, একমাত্র সহবাস ছাড়া মিলন পূর্ব আনুষঙ্গিক ক্রিয়া কলাপে লিপ্ত হওয়া; হারামবস্তু যথা প্রবাহিত রক্ত, মৃতজন্তুর গোশত ইত্যাদি খাওয়া, যিনা ব্যতীত মিথ্যা অপবাদ, অরক্ষিত বস্তু চুরি করা, 'নিসাব'[১] অপেক্ষা কম বস্তু চুরি করা, আমানতের খেয়ানত (বিশ্বাস ভঙ্গ) করা, যেমনটি করে থাকে বায়তুল মালের কোষাধ্যক্ষ এবং মুতাওয়াল্লী, ওয়াকফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী কিংবা পিতৃহীন ইয়াতীমের অভিভাবকরা অথবা যৌথ ব্যবসায়ের অংশীদাররা। দৃষ্টান্তস্বরূপ যেমন– বিশ্বাস ভঙ্গ, আচার-ব্যবহার এবং আদান-প্রদানে প্রতারণা করা, খাদ্যবস্তু, ভোগ্যপণ্য কিংবা কাপড়ে প্রবঞ্চনা করা, মাপে কম বেশ করা, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানে উৎসাহ দেয়া, ঘুষ খাওয়া, আল্লাহ্র হুকুমের বিপরীত হুকুম দেয়া, প্রজা কিংবা জনসাধারণের উপর অন্যায়-অত্যাচার অবিচার উৎপীড়ন করা, জাহেলী যুগের বাক্য উচ্চারণ কিংবা জাহেলী যুগের দাবী উঠানো, শরীয়তের নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়া ইত্যাদি। এ জাতীয় অপরাধীদের সাজা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও চরিত্র গঠন, সংশোধনমূলক শিক্ষণীয় দণ্ড বিধান করা, এই সবগুলো বিষয় বিচারক কিংবা শাসনকর্তার ইখতিয়ারভুক্ত। এসব ক্ষেত্রে অপরাধের মাত্রা অধিক কি অনধিক ইত্যাদি পরিস্থিতি যাচাই করে তাঁরা শাস্তি বিধান করবেন। অপরাধ প্রবণতা বেড়ে গেলে কিংবা স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে, শাস্তির পরিমাণ অধিক ও কঠোর হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অপরাধমূলক ঘটনাবলীর পরিমাণ ও মাত্রা স্বাভাবিক অবস্থার আওতায় থাকলে, শাস্তিও সে অনুপাতে হালকা বা লঘু হওয়া উচিত। মোটকথা, জনগণ ব্যাপকহারে

টীকা-১ : নিসাব বলা হয় ঐ পরিমাণ অর্থ-সম্পদ কেউ যার মালিক হলে, তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হয়।

অপরাধমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হতে থাকলে এবং অভ্যস্ত হয়ে পড়লে শাস্তিও কঠোর এবং গুরুদণ্ড হওয়া বাঞ্ছনীয়। পক্ষান্তরে ছোটখাট ও স্বল্প মাত্রার অপরাধে লঘুদণ্ডই বিধেয়।

বড় ছোট অপরাধের আনুপাতিক হারে সাজা নির্ধারিত হওয়া উচিত। যেমন, ঘটনাক্রমে একজন মহিলা কিংবা একটি বালককে অসৎ উদ্দেশ্যে উত্যক্তকারী অপরাধীর দণ্ড ঐ ব্যক্তির তুলনায় কম হওয়া উচিত, যে ব্যক্তি সদাসর্বদা নারী ও বালকদের অসৎ কাজে প্ররোচিত ও উত্যক্ত করে থাকে। এখন 'তাযীর' তথা শিক্ষা, শাসন ও দৃষ্টান্তমূলক সাজার পরিমাণ কি হবে? নির্দিষ্টভাবে তার কোন উল্লেখ নেই। তাযীরের মূল উদ্দেশ্য হলো কষ্ট ও পীড়া দেয়া। এখন কথা বা কাজের দ্বারা, বাক্যালাপ বন্ধ করে কিংবা তার সাথে পূর্বে যে ধরনের আচার-আচরণ করা হতো, সে ধরনের আচার ব্যবহার বন্ধ করে দিয়ে হোক কিংবা আদেশ-উপদেশের মাধ্যমে অথবা ভীতি প্রদর্শন এবং সাবধান ও হুশিয়ারী উচ্চারণের দ্বারা তাযীর সম্পন্ন করবে। মোটকথা, তাকে এমন কষ্ট দেয়া যার ফলে তাযীর বা শাসনের কাজ হয়ে যায়। অধিকন্তু কোন কোন সময় সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং সালাম কালাম কথা বার্তা বন্ধ করার দ্বারাও এ উদ্দেশ্য সাধন হতে পারে।

বস্তুত এর উদ্দেশ্য হল, অনুরূপ কার্যকলাপ থেকে তওবা না করা পর্যন্ত তাকে তাযীর করা উচিত। যেমন মহানবী (সা) জিহাদে শরীক না হওয়ার কারণে তিনজন সাহাবীর সাথে সালাম কালাম এবং কথা বার্তা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।[১]

টীকা-১ : উক্ত তিনজন সাহাবী হলেন– হযরত কা'ব ইবনে মালিক, হেলাল ইবনে উমাইয়্যা এবং মুরারাহ ইবনে রবী (রা)। এ তিন জনের তওবা কবূল হওয়া সম্পর্কে কুরআনে করীমে ইরশাদ হচ্ছে–

وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْا اَنْ لاَّ مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلاَّ اِلَيْهِ ـ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ـ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمِ. (سورة توبة : ١١٨)

"আর ঐ তিন জন যাদের ব্যাপারে ফয়সালা আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় মুলতবী রাখা হয়েছিল তাদেরও অবস্থা এই যে, আল্লাহর যমীন বিশাল-বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের উপর তা সংকীর্ণ ও সংকুচিত হয়ে যায় এবং নিজেদের জীবনের প্রতিও তারা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। অধিকন্তু তাদের বদ্ধমূল ধারণা সৃষ্টি হয় যে, আল্লাহর পাকড়াও থেকে মুক্তির ব্যাপারে তিনি ছাড়া তাদের দ্বিতীয় কোন আশ্রয়স্থল নেই। অতঃপর আল্লাহ তাদের তওবা কবূল করেন যেন তারা তওবায় অটল থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় তওবা গ্রহণকারী এবং পরম দয়ালু।" (সূরা তাওবা : ১১৮)

মহানবী (সা) এ তিনজন সাহাবীর সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করে কার্যতঃ তাদেরকে বয়কট করার

আর তত্ত্বাবধায়ক, হাকিম কিংবা শাসনকর্তার দ্বারা যদি এমন কোন অপরাধ সংগঠিত হয়, যার উপর কোন হদ্দ নির্ধারিত নেই, তবে খলীফা তথা সরকার প্রধান কর্তৃক তাকে পদচ্যুত করে দিতে হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) এবং সাহাবীগণ (রা) করেছিলেন। ক্ষেত্র বিশেষে আবার সাময়িক খিদমত থেকে বাধ্যতামূলক অবসর দিয়ে তাযীর করা উচিত। কেউ হয়ত মুসলমানদের সামরিক ও দেশরক্ষা বাহিনীতে কার্যরত ছিল যে, সে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, সামনা-সামনি তরবারী চলছে, এমতাবস্থায় মুসলিম সেনাবাহিনীর কেউ পলায়ন করল অথচ যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা কবীরা গুনাহ।' সুতরাং এ পরিপ্রেক্ষিতে তার বেতন-ভাতা, খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেয়াটাও এক প্রকার তা'যীর বা শাসন।

এমনিভাবে আমীর, বিচারক কিংবা শাসনকর্তা যদি এমন কোন কাজে লিপ্ত হয়, সামজে যা ঘৃণিত ও অপছন্দনীয় হিসাবে চিহ্নিত, তাহলে এমতাবস্থায় তাকে পদচ্যুত কিংবা ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে।' তার জন্যে এটাই তাযীর' হিসাবে পরিগণিত হবে।

জন্য সকলের প্রতি নির্দেশ দেন। তাদের সাথে সালাম কালাম, কথা বার্তা বন্ধ করে দেন। এমনকি পরিবারস্থ লোকজন পর্যন্ত তাদের সাথে চলা-ফেরা আলাপ-আলোচনা বন্ধ করে দেয়। ফলে তাদের অবস্থা দাঁড়ায় এই, যা উল্লেখিত আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

এ ব্যাপারটা ঘটেছিল হিজরী দশম সালে সংঘটিত 'তবুক যুদ্ধের সময়। তবুক যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের জন্য কঠিন পরীক্ষার বিষয়। কেননা একদিকে প্রচণ্ড গরমের মৌসুম, সফর ছিল অতি দূর দূরান্তের। সহায় সম্বল বলতে কিছুই ছিল না। তদুপরি মদীনাবাসীদের গোটা বছরের খাদ্যের ব্যবস্থা খেজুর কাটার পুরা মৌসুম। ফলে সবাই চিন্তিত ছিল যে, এ পরিস্থিতিতে যুদ্ধ যাত্রা কিভাবে সম্ভব?

সুতরাং এ যুদ্ধে মদীনাবাসীরা পাঁচ দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। (১) মহানবী (সা) মুহাজির এবং অনাসারগণ। যে কোন পরিস্থিতিতে তাঁরা যুদ্ধ যাত্রার দৃঢ় সংকল্পে সর্বোতভাবে প্রস্তুত হয়ে যান। (২) মুহাজির ও আনসারদের সে সকল লোক, প্রথমতঃ যুদ্ধ যাত্রায় দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে। কিন্তু পরিশেষে যুদ্ধে যোগদানের উদ্দেশ্যে তাঁরা প্রস্তুত হয়ে যান এবং রওনা দেন। (৩) এ দলে মাত্র তিনজন ছিলেন। অবহেলা ও অলসতার দরুন যারা যুদ্ধ যাত্রা থেকে বিরত থাকেন। নবী করীম (সা) যুদ্ধ থেকে মদীনা প্রত্যাবর্তনের পর এরাও হুযূর (সা)-এর খিদমতে হাজির হন। তাদেরকে জিহাদে শরীক না হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে তারা সত্য সত্য ঘটনাই ব্যক্ত করেন যে, আমাদেরই অপরাধ, বিনা কারণে আমরা জিহাদে গমন করা থেকে বিরত ছিলাম। আদালতে নববী থেকে এ তিনজনের সাথে সামাজিক বয়কটের নির্দেশ আসে। হুযূর (সা) তাদেরকে বলেন, ওহীর অপেক্ষা করতে থাক। আল্লাহর পক্ষ থেকে যা হুকুম হবে, তার উপরই আমল করা হবে। (৪) চতুর্থ দল ছিল মুনাফিকদের। সূরা 'তওবায়' তাদের কঠোর ভাষায় তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। (৫) ঐ সকল লোক, যারা কোন ওযর বা অক্ষমতার কারণে ঐ যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি।

এমনিতর কখনো অপরাধীকে জেলখানায় বন্দী করে তাযীর করতে হবে। ক্ষেত্র ও পাত্রভেদে অপরাধীর' মুখে চুন কালী মাখিয়ে' উল্টোমুখী গাধায় সওয়ার করে' বাজারে-বন্দরে, তথা লোকালয়ে ঘুরিয়ে তাকে জনসমক্ষে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে তাযীর করতে হবে। যেমন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, মিথ্যা সাক্ষ্য দানকারীকে তিনি এ ধরনের তাযীর করেছিলেন। মিথ্যাবাদী মিথ্যা কথার দ্বারা নিজের মুখে সে নিজেই কালি মেখেছে। কাজেই কর্মফলস্বরূপ তার মুখমণ্ডল কাল করে দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ সরল সোজা কথাকে যেহেতু সে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে, সেহেতু তাকেও গাধার পিঠে উল্টোমুখী সওয়ার করে সাজা দেয়া হয়েছে।

তাযীরের ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব দশটি দণ্ড দিতে হবে এর অধিক নয়। কিন্তু উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞের মতে তাযীর এ পরিমাণ হওয়া উচিত, যাতে হদ্দের সীমা পর্যন্ত না পৌঁছে। অতঃপর তাযীর সম্পর্কেও তাদের মধ্যে দু'ধরনের মত পরিলক্ষিত হয়। কারো কারো মতে সীমা পর্যন্ত পৌঁছানো চাই। আযাদ ব্যক্তির হদ্দ হচ্ছে ন্যূনতম চল্লিশ কোড়া কিংবা আশি কোড়া। কাজেই তাযীরে উক্ত সংখ্যক কোড়া লাগানো ঠিক নয়। বস্তুত গোলামের তাযীর গোলামের নিম্নতম পরিমাণের সমান না হওয়া সংগত। যেমন, গোলামের হদ্দের পরিমাণ বিশ কিংবা চল্লিশ কোড়া। কাজেই তাযীর এর সমসংখ্যক হওয়া উচিত নয়।

পক্ষান্তরে কেউ বলেছেন, অপরাধী ব্যক্তি স্বাধীন হোক বা গোলাম, তাযীর গোলামের হদ্দের পরিমাণ হওয়া সমীচীন নয়। এ ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষ বলেন–

এ আয়াতে আল্লাহর ফযল ও করুণার উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেকেরই নিজ নিজ অবস্থা অনুযায়ী আল্লাহর ফযল, রহমত ও করুণার অংশ দেয়া হয়েছে। নবী করীম (সা) মুহাজির ও আনসারদের উপর আল্লাহ তা'আলার দান-'ফযল' এই হয়েছে যে, যুদ্ধ যাত্রা সম্পর্কে আদৌ তাঁরা দ্বিধান্বিত হন নাই। বরং তাঁরা ছিলেন দৃঢ় সংকল্প এবং অটুট অনড় ইচ্ছার অধিকারী। আর যারা ছিলেন দ্বিধাগ্রস্ত, তাঁদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ হয়েছে এই যে, শেষ পর্যন্ত তাঁরা পয়গম্বর (সা)-এর সঙ্গীরূপে যুদ্ধে গমন করেন। অধিকন্তু কা'ব (রা), হেলাল (রা) এবং মুররাহ (রা) এ তিন জনের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ হলো যে, তাঁরা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেন। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের তওবা কবূল করেন।

মোটকথা, সামাজিক বয়কটের ফলে অপরাধী যদি শিক্ষা গ্রহণ করে এবং অপরাধ করা থেকে বিরত থাকে তবে, এটাও (আদালতে) কার্যকর বলে বিবেচিত হতে পারে।

অতএব সার কথা হল– যে সমস্ত অপরাধের হদ্দ বা সাজা নির্ধারিত নেই অথচ তাকে তাযীর করা উদ্দেশ্য, এ ক্ষেত্রে ইমাম, শাসনকর্তা বা বিচারপতির কর্তব্য হলো অপরাধীর অবস্থানুযায়ী তাযীর করা বা সাজা দেয়া এবং তাকে অপরাধ থেকে নিবৃত্ত রাখা।

স্বাধীনদের তথা তাযীর তাদের হদ্দের সমপরিমাণ হওয়া উচিত। যে প্রকার এবং যে জাতীয় তাযীর করা হবে, তা যেন হদ্দের চেয়ে মাত্রাধিক না হয়ে যায়। যেমন, কোন চোর যদি অরক্ষিত কোন স্থানের মাল চুরি করে তবে শাস্তিস্বরূপ তার হাত কাটা হবে না, অন্যভাবে তাযীর করতে হবে। সে তাযীর যদিও 'হদ্দে কযফ' পর্যন্ত পৌঁছে যায়। প্রয়োজন হলে তাকে 'হদ্দে কযফে'র চেয়ে অধিক পরিমাণে বেত্রদণ্ড দিতে হবে। যেমন, কোন ব্যক্তি যিনা তো করেনি কিন্তু তার আনুষঙ্গিক কাজগুলো করেছে, চুমো খেয়েছে, তাকে নিয়ে শয্যায় শুয়েছে অথবা যিনার এ জাতীয় অন্য কোন আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকাণ্ড করেছে। সুতরাং এর তাযীর একশ কোড়া হতে পারবে না। অবশ্য কযফের চেয়ে অধিক হওয়াও বাঞ্ছনীয়। যেমন, বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রা)-এর যামানায় এক ব্যক্তি নকশী করা একটি আংটি তৈরী করেছিল। বাইতুল মাল থেকে কিছু মাল চুরি করে সে তাতে লাগিয়েছিল। এটা প্রমাণিত হওয়ার পর হযরত ওমর (রা) প্রথম দিন তাকে একশ কোড়া লাগান, দ্বিতীয় দিন একধম এবং তৃতীয় দিনও তাকে একশত কোড়া লাগানো হয়। খোলাফায়ে রাশেদীন থেকে বর্ণিত আছে– একদা রাত্রিকালে কোনও এক ব্যক্তিকে জনৈকা পরনারীসহ একই লেপের নীচে শয্যাশায়ী অবস্থায় পাওয়া যায়। অতঃপর এর দণ্ডস্বরূপ উভয়কে একশ করে কোড়া লাগানো হয়েছিল।

হযরত নবী করীম (সা) থেকে বর্ণিত– কোন ব্যক্তি আপন স্ত্রীর বাঁদীর সাথে যদি সহবাস করে, তবে তাকে রজম বা প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। এটা ইমাম আহমদ (রহ)-এর অভিমত। আর প্রথমের দুটি ধারা ইমাম শাফিঈ (রহ)-এর মযহাব অনুযায়ী। ইমাম মালিক (রহ) এবং অন্যান্য থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, কোন কোন অপরাধ এমনও রয়েছে, যার সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন 'হদ্দ'-এর উল্লেখ নেই। কিন্তু তার তাযীর বা সাজা প্রাণদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। ইমাম আহমদ (রহ)-এর কোন কোন শাগরিদও এ মতের অনুসারী। যেমন, কোন মুসলমান যদি কাফির ও দুশমনের পক্ষে গুপ্তচর বৃত্তিতে লিপ্ত হয়, যার ফলে মুসলমানদের জান মালের ক্ষতির আশংকা দেখা যায়, এমতাবস্থায় ইমাম আহমদ (রহ) কোন মত ব্যক্ত না করে নীরবতা অবলম্বন করেন, কিন্তু ইমাম মালিক (রহ) এবং ইবনে 'উকায়লীর ন্যায় কোন কোন হাম্বলী ইমামের মতে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া উচিত। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (রহ), ইমাম শাফিঈ (রহ) এবং আবুয়ালীর ন্যায় অপর কোন হাম্বলী ইমামের মতানুসারে তাকে মৃত্যুদণ্ড দান সমীচীন নয়।

কোন ব্যক্তি যদি কুরআন হাদীসের পরিপন্থী কোন বিদ'আত ও শরীয়ত বিরোধী প্রথা চালু করে কিংবা এর প্রতি মানুষকে আহ্বান জানায় ও তার অনুকূলে প্রচারণা

চালায় তবে তাকে আদালত মৃত্যু দিতে পারবে। ইমাম মালিক (রহ)-র বহু শিষ্য-শাগরিদও এ মতের সমর্থনকারী। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক (রহ) ও অন্য ইমামগণ 'কাদরিয়্যাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দানের হুকুম দিয়েছেন। তাঁদের এ হুকুম কাদরিয়্যাদের 'মুরতাদ' (ইসলাম ত্যাগী) হওয়ার ভিত্তিতে নয়, বরং এদের দ্বারা 'ফাসাদ ফিল আরদ' অর্থাৎ রাষ্ট্র ও সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করার কারণে দেয়া হয়েছে।

এমনিভাবে কেউ কেউ যাদুকরদেরও মৃত্যুদণ্ড দানে মত ব্যক্ত করেছেন। আর অধিকাংশ আলিমও একই মত পোষণ করেন। এ পর্যায়ে হযরত 'জুন্দুব' (রা) থেকে মওকূফ' ও 'মরফু' উভয় সূত্রে রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে।[১]

حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ -

"যাদুকরের হদ্দ বা সাজা হল তরবারীর আঘাতে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা।" (তিরমিযী)

টীকা-১ : হযরত 'জুন্দুব' (রা)-র ঘটনা আবুল ফারাজ ইসফাহানী রচিত আল আগানী গ্রন্থে সনদসহ (রেওয়ায়েত সূত্র) বর্ণনা করা হয়েছে। ঘটনার বিবরণে উল্লেখ করা হয়েছে–

ওলীদ ইবনে ওকবার দরবারে একবার কোন এক যাদুকর উপস্থিত হয়। যাদুমন্ত্র বলে সে গাভীর উদরে অনায়াসে প্রবেশ করত এবং বেরিয়ে আসত। ঘটনাক্রমে হযরত জুন্দুব (রা) সেখানে উপস্থিত হয়ে ব্যাপারটি লক্ষ্য করেন। সবার অলক্ষ্যে উঠে গিয়ে ঘর থেকে তিনি তরবারী হাতে ফিরে আসেন। খেলার এক পর্যায়ে যাদুকর গাভীর পেটে ঢুকতেই তিনি তরবারীর এক প্রচণ্ড আঘাতে যাদুকরসহ গাভীটি দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেন। আর মুখে তিলাওয়াত করতে থাকেন –

اَفَتَأْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ -

"তোমরা কি জেনে শুনে যাদু চর্চায় এসেছ?" (সূরা আম্বিয়া : ৩)

পরিস্থিতির নাজুকতা অনুধাবন করে উপস্থিত সকলেই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। ইরাক শাসক ওলীদের নির্দেশে জুন্দুবকে গ্রেফতার করে জেলখানায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। আর বিস্তারিত ঘটনা লিপিবদ্ধ করে খলীফা উসমান (রা)-র নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়। ঘটনাক্রমে সে কারাগারে ছিল খৃষ্টান দারোগা। হযরত জুন্দুব (রা) গভীর রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়ছেন এবং দিনের বেলা রোযা রাখছেন। এ অবস্থা দেখে খৃষ্টান কারারক্ষী মনে মনে বলতে থাকে– "আল্লাহর কসম! যে জাতির অপরাধ-প্রবণ ও প্রতারক দুষ্ট লোকদের অবস্থা এই, সে জাতি সে ধর্ম অবশ্যই সত্য ও নির্মল।" অন্য একজনের উপর কারাগারের দায়িত্ব অর্পণ করে সে নিজে 'কুফা' চলে যায়। এখানে লোকদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে থাকে এবং স্থানীয় লোকদের নিকট এখনকার সবচেয়ে সৎ ও পুণ্যবান ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে থাকে। তারা জবাব দিল সে ব্যক্তি হচ্ছে 'আশআছ বিন কায়স।' সে তাঁর বাড়ীতে অতিথি হলো। আর লক্ষ্য করল যে, তিনি রাতে ঘুমান এবং সকালে আহার করেন। অতঃপর কুফবাসীদেরকে পুনরায় জিজ্ঞেস করল 'এখানে সব চেয়ে উত্তম

হযরত ওমর (রা), হযরত উসমান (রা), হযরত হাফসা (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবন ওমর (রা) এবং অন্যান্য সাহাবীগণের মতে যাদুকরের সাজা হলো তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া। অবশ্য এর কারণ সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন আলিমের মতে যাদুকর সেও কাফির হয়ে যাওয়ার কারণে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। আর কেউ বলেছেন, যাদুকর ঠিকই হত্যার যোগ্য তবে, তা ফাসাদ ফিল আরদ' فَسَادٌ فِى الْأَرْضِ সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টির কারণে। কিন্তু জমহূর উলামা তথা অধিকাংশ আলিম এর মতে, শরীয়তী হদ্দের ভিত্তিতেই সে হত্যা যোগ্য অপরাধী।

এমনিভাবে যে সকল অপরাধের শাস্তিতে প্রাণদণ্ড প্রদান ওয়াজিব হয়ে পড়ে, সে জাতীয় অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটলে 'তাযীরস্বরূপ ইমাম আবূ হানীফা (রহ) প্রাণদণ্ডের অনুকূলে মত ব্যক্ত করেন। যেমন, কোন ব্যক্তি যদি বারংবার 'লাওয়াতাত' বা পুং মৈথুন করতে থাকে অথবা কেউ মানুষকে ধোকা দিয়ে, প্রবঞ্চনার আশ্রয়ে অর্থ কড়ি হাতিয়ে নেয়, তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দান ওয়াজিব।

ব্যক্তি কে?' উত্তরে তারা বলল– জারীর ইবনে আবদুল্লাহ'। উক্ত খৃষ্টান তাঁকেও হযরত 'আশআছ ইবন কায়স-এর অনুরূপ দেখতে পেল। অতঃপর কেবলামুখী হয়ে সে ঘোষণা করতে থাকে–

رَبِّىْ رَبُّ جُنْدُبٍ وَدِيْنِىْ دِيْنُ جُنْدُبٍ -

'জুন্দুবের যিনি প্রভু– আমারও তিনি প্রভু-পালনকর্তা আর জুন্দুবের দ্বীনই আমার দ্বীন।' এ মন্তব্য করার পরক্ষণেই তিনি কালিমা তাইয়্যেবা পাঠ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। 'সুনানে কুবরাতে ইমাম 'বায়হাকী' সামান্য পরিবর্তনসহ ঘটনাটি এভাবে উল্লেখ করেন : ওলীদ ইবন উকবা তখন ইরাকের শাসনকর্তা। তাঁর নিকট একজন যাদুকর উপস্থিত হয়ে নিজের মন্ত্রবলে সে খেলা দেখাতে শুরু করে । সে এক ব্যক্তির গর্দান উড়িয়ে দেয়। অতঃপর নিহত ব্যক্তির নাম করে সজোরে চিৎকার দেয়। এতে নিজে নিজেই তার ছিন্ন মস্তক এসে দেহের সাথে জোড়া লেগে যায় এবং সজীব হয়ে উঠে। এ দৃশ্য দেখে উপস্থিত জনতা বিস্মিত ও আশ্চর্য কণ্ঠে বলে উঠে سُبْحَانَ اللّٰهِ يُحْيِ الْمَوْتَ "সুবহানাল্লাহ! এ তো মৃতকে জীবন দান করে দেখছি।" এহেন অবস্থা দেখে এর পরবর্তী দিন মুহাজিরদের মধ্য থেকে এক জন তরবারী হাতে ঘটনাস্থলে হাজির হন। যাদুকর পূর্ব দিনের ন্যায় যথারীতি তার ভেল্কীবাজী শুরু করলে তিনি জনতার মধ্য থেকে এগিয়ে আসেন এবং তরবারীর একই আঘাতে দেহ থেকে তার মস্তক বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। আর মন্তব্য করতে থাকেন– "সে যদি সত্য সত্যই মৃতের জীবন দানে সক্ষম হয়ে থাকে, তবে নিজে নিজেই জীবিত হয়ে উঠুক।" ওলীদ তখন দীনার নামক কারারক্ষীর প্রতি তাঁকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করার হুকুম দেন। মোটকথা, যাদু বিদ্যা ইসলাম বিরোধী কাজ। কেননা এদ্বারা মানুষ ধোকায় পড়ে যায়। সুতরাং সত্য ও দ্বীনের মাপকাঠি একমাত্র আল্লাহর কিতাব এবং সুন্নতে রাসূল (সা), যা কিছু এ দুয়ের সাথে মিল খাবে তা সত্য। পক্ষান্তরে এর বিপরীত সব কিছুই গোমরাহী বলে প্রতিপন্ন হবে। এ কারণেই ইসলামী আইন বিশেষক আলিমগণ যাদুকরের প্রাণদণ্ডের অনুকূলে মত দিয়েছেন। এখানে কারাগারে প্রেরণের ঘটনাটি আইন হাতে তুলে নেয়ার।

এমনিভাবে কারো সম্পর্কে যদি এটা প্রমাণিত হয় যে, হত্যা করা ব্যতীত তার অনিষ্টকারী কার্যকলাপ এবং ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নেই, এমতাবস্থায় তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে।

ইমাম মুসলিম তাঁর বিশ্ব বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ সহীহ মুসলিমে হযরত 'আরফাজা আল আশজাঈ' (রহ)-র রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুনেছি :

مَنْ اَتَاكُمْ ـ وَاَمْرُكُمْ عَلٰى رَجُلٍ وَّاحِدٍ يُرِيْدُ اَنْ يَّشُقَّ عَصَاكُمْ اَوْ يُفَرِّقَ فِى جَمَاعَتِكُمْ فَاقْتُلُوْهُ ـ (مسلم)

"যে ব্যক্তি তোমাদের সমাজে বিভে-বিশৃংখলা এবং অনৈক্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে আগমন করে, তবে সে মৃত্যুদণ্ড পাবার যোগ্য।"

অপর এক হাদীসে রয়েছে :

سَيَكُوْنُ هُنَاتَ وَهُنَاتَ فَمَنْ اَرَادَ اَنْ يُفَرِّقَ اَمْرَ هٰذِهِ الاُمَّةِ وَهِيَ جَمِيْعُ فَاضْرِبُوْهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ ـ

"একের পর এক ফিৎনা সৃষ্টি হতে থাকবে তখন, যদি কোন ব্যক্তি এ জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির দুরভিসন্ধি করে আর তোমাদের ঐক্য-সংহতি নষ্ট করার প্রয়াস চালায়, সে যেই হোক না কেন (তার বিচার করে) তরবারীর আঘাতে তাকে প্রাণদণ্ড দিতে হবে।"

শরাব পানের ব্যাপারেও অনুরূপ কথাই বলা হযেছে যে, কয়েক বারের তাযীর সত্ত্বেও যদি নিবৃত না হয়, তখন চতুর্থবার তাকে প্রাণদণ্ড দিতে হবে। এ মতের সমর্থনে মুসনাদ গ্রন্থে ইমাম আহমদ কর্তৃক দাইলাম আল হিময়ারী (রা)-কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হযরত দাইলাম (রা) প্রশ্ন করেন, হে রাসূলুল্লাহ! আমি এমন এলাকা থেকে আগমন করেছি, যেখানে মদের সাহায্যে বড় বড় কার্য সমাধা করা হয়। এর দ্বারা চিকিৎসা করা হয়। আমরা গম থেকে শরাব প্রস্তুত করি, মদ দ্বারা আমরা উল্লেখযোগ্য শক্তি লাভ করি। এ ব্যবসাতে আমরা বেশ সাফল্যও লাভ করে থাকি। অধিকন্তু আমাদের অঞ্চলে তীব্র শীত পড়ে থাকে। এর দ্বারা শরীর গরম রাখা হয়। হুযূর (সা) বলেন–

"তাতে নেশা ধরে?" আমি বললাম হাঁ। তিনি বললেন– "এ থেকে বেঁচে

থেকো"। আমি পুনরায় আরয করলাম– "হুযূর! মানুষ এটা কিছুতেই বর্জন করবে না।"

এবার নবীজি ইরশাদ ফরমান– فَاِنْ لَمْ يَتْرُكُوْهُ فَاقْتُلُوْهُ ـ

"যদি তারা তা বর্জন না করে, তবে তাদের (এ সমাজ বিরোধী খোদাদ্রোহীদের) মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে।"

বস্তুতঃ এ নির্দেশের মূল কারণ হল, এ দ্বারা সমাজে ফিৎনা-ফাসাদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। (মানবদেহের ক্ষতিসহ অন্যান্য ক্ষতিতো আছেই।) দ্বিতীয়ত, এটা হচ্ছে ক্ষতিকর আক্রমণকারীর অনুরূপ। তাই আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে হিংস্র আক্রমণকারীকে হত্যা যেমন বৈধ ও জরুরী, তদ্রূপ মাদক দ্রব্যের ব্যাপক ক্ষতির প্রেক্ষিতে এর হুকুমও একই পর্যায়ের। সাজা দুই প্রকার : এ ব্যাপারে সবাই একমত। (১) অতীত অপরাধ কর্মের সাজা, যা সে ইহজগতেই ভোগ করে যায় এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে মুক্তি লাভ করে। যেমন, শরাবখোর ও মিথ্যা অপবাদ দানকারীকে কোড়া লাগানো। বিদ্রোহী এবং চোরের হাত কাটা ইত্যাদি। (২) নিজের উপর ওয়াজিব হক আদায় না করা । অনবরত গুনাহ করতে থাকা। এমন অপরাধীকে শাস্তি দানের উদ্দেশ্য হল– তার নিকট যা প্রাপ্য তা আদায় করা আর ভবিষ্যতে সে যাতে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, সে ব্যাপারে তাকে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণে বাধ্য করা। যেমন ইসলাম ত্যাগকারী মুরতাদ। প্রথমতঃ তওবা এবং ইসলাম গ্রহণের জন্য তাকে আহ্বান জানাতে হবে। ডাকে সাড়া দিয়ে তওবার মাধ্যমে সে যদি মুসলমান হয়ে যায়, তবে তো উত্তম, অন্যথায় তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। আর যেমন নামায, রোযা বর্জনকারী এবং যে ব্যক্তি পরের হক আদায় করে না কিংবা নষ্ট করে, এসব ক্ষেত্রে হক ও ওয়াজিবসমূহ আদায় করার জন্য তাকে সুযোগ দিবে। আর ব্যতিক্রম অবস্থায় তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সুতরাং দ্বিতীয় প্রকারের অপরাধে প্রথম প্রকারের চেয়ে কঠোর হস্তে তাযীর করতে হবে। তাই নামায, রোযা বর্জনকারীকে তার উপর আবর্তিত ওয়াজিবগুলো আদায় না করা পর্যন্ত, বার বার প্রহার কার্য করে তাকে শাসন করতে হবে।

আর এ বিষয়ে বুখারী ও মুসলিমের হাদীস নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো। মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন–

لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ اَسْوَاطٍ اِلاَّ فِىْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ ـ

"আল্লাহর নির্ধারিত হদ্দ ব্যতীত দশটির অতিরিক্ত কোড়া লাগানো যাবে না।" এর ব্যাখ্যায় আলিমগণের একাংশের অভিমত হলো, উক্ত হাদীসের মর্ম হলো আল্লাহর নির্ধারিত হদ্দসমূহ আল্লাহর হকের জন্য হারাম করা হয়েছে। কেননা কুরআন হাদীসে উল্লেখিত হদ্দের অর্থ হলো হালাল-হারামের মধ্যবর্তী সীমারেখা। অর্থাৎ হালালের শেষ সীমা এবং হারামের প্রথম সীমার মধ্যখানে অবস্থিত সীমারেখা। হালালের শেষ সীমা সম্পর্কে আল্লাহ ফরমান–

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلاَ تَعْتَدُوْهَا ـ

"এ হলো আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমারেখা। তাই তোমরা এগুলো অতিক্রম করবে না।" পক্ষান্তরে হারামের প্রারম্ভিক সীমা সম্পর্কে আল্লাহর বাণী হলো–

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلاَ تَقْرَبُوْهَا ـ

"এগুলো হলো আল্লাহ্র ঘোষিত সীমা চিহ্ন। সুতরাং এর নিকটেও তোমরা যাবে না।"

এখন কথা হল, উক্ত সাজাকে হদ্দ কেন বলা হয়? এর উত্তরে বলা যায় যে, এটা একটা নতুন পরিভাষা। এর তাৎপর্য ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

উল্লেখিত হাদীসের উদ্দেশ্য হল– কেউ নিজের প্রাপ্য আদায় করার জন্য– সমস্যাটা যদি আঘাত ও মারপিটের ঘটনা পর্যন্ত গড়ায়, তা হলে দশটির অধিক আঘাত করা তার জন্য বৈধ নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, যেমন কারো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়ে গেল, ফলে কোন এক পক্ষ থেকে অন্যায়-বাড়াবাড়ি পরিলক্ষিত হলো, এহেন পরিস্থিতিতে মজলূমের অধিকার আদায়কল্পে অন্যায়কারীকে দণ্ডিত করা জরুরী। তবে বেত্রদণ্ডের ক্ষেত্রে দশের অধিক নয়।

[আঠার]

যে ধরনের কোড়া দ্বারা অপরাধীকে শাস্তি দেবে এবং যেসব অঙ্গে কোড়া মারা যাবে না

শরীয়তের বিচারে অপরাধিকে যে কোড়া লাগানোর নির্দেশ রয়েছে, তা মধ্যম মানের হতে হবে। কেননা মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন,

خَيْرُ الْاُمُوْرِ اَوْسَطُهَا "অর্থাৎ মধ্যমপন্থা অবলম্বন করাই উত্তম।"

হযরত আলী (রা) বলেন– আঘাত খুব শক্তও হানা যাবে না, আবার একেবারে লঘুও নয়। বেতটি অতি বড়ও নয় আবার একেবারে ছোটও হওয়া উচিত নয়। কাষ্ঠখণ্ডের দ্বারা প্রহার করা যাবে না, কাঁটাযুক্ত জিনিস দিয়েও না। এ ক্ষেত্রে দোররা যথেষ্ট নয়, বরং দোররা ব্যবহার করতে হবে তা'যীর তথা শিক্ষামূলক শাস্তিতে। 'হদ্দে শরীয়া'র ক্ষেত্রে কোড়া দ্বারাই দণ্ড দিতে হবে।

হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রা) কাউকে আদব শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে দোররা ব্যবহার করতেন। কিন্তু 'হদ্দে শারঈ' কার্যকর করার কালে কোড়া আনিয়ে নিতেন। কোড়া মারার সময় অপরাধীর পরিধেয় সকল বস্ত্র খুলে নেয়া যাবে না, বরং সে পরিমাণ বস্ত্রই খোলা যাবে, যা প্রহারের তীব্রতা রোধ করে। লক্ষ্য রাখতে হবে, প্রহারের ক্রিয়া যেন রগ কিংবা অন্ত্রে না পৌছে। বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বাঁধা যাবে না। অপরাধীর মুখমণ্ডলেও আঘাত করা যাবে না। আসল উদ্দেশ্য হল, তাকে শিক্ষা দেয়া, তার প্রাণ সংহার করা নয়। প্রহার এ পরিমাণ করতে হবে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন টের পায়, ব্যথায় জর্জরিত হয়। উদাহরণতঃ পিঠ, কাঁধ এবং রানের উপর প্রহার করতে হবে।

শাস্তি ও শাস্তি প্রাপ্তদের শ্রেণী বিভাগ

আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের (সা) নাফরমানীর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদত্ত সাজাও দুই প্রকার। (১) এক, দুই কিংবা ততোধিক ব্যক্তির উপর এই সাজা প্রয়োগ করা হয়। ইতিপূর্বে যার বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। (২) এই সাজা যা একটি শক্তিশালী দল বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়। মৃত্যুদণ্ড ছাড়া যাদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীন 'জিহাদ' অর্থাৎ আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (সা)-এর দুশমনদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধ এর আওতায়।

দীনের তাবলীগ ও প্রচার ব্যাপক হওয়া সত্ত্বেও যারা ইসলাম তো কবূল করেই না বরং ইসলামের বিরুদ্ধে আগ্রাসী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, তাদের মুকাবিলায় জিহাদ করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত দীনের বিরুদ্ধে ফিৎনা ফাসাদ নির্মূল না হবে এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত ও বিজয়ী না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত শত প্রতিকূলতার মাঝেও এ জিহাদ[১] অব্যাহত রাখতে হবে।'

ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় মহানবী (সা)-এর প্রতি কেবল ইসলামী দাওয়াত পৌঁছানোরই আদেশ ছিল। তখনও জিহাদের অনুমতি দেয়া হয়নি। এক পর্যায়ে বাধ্য হয়ে যখন তিনি মদীনার দিকে হিজরত করলেন এবং সেখানেও ইসলামের দুশমনরা তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেল, তখনই আল্লাহ তায়ালা মহানবী (সা) ও সাহাবীগণকে আত্মরক্ষামূলক পরিস্থিতিতে জিহাদের অনুমতি দান করেন।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী হলো–

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ - الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ - اِلاَّ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ - وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوَاتٌ وَّمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا وَّلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ - اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ - اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى

১. টীকা.: জিহাদ অর্থ আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনের সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো। প্রতি রক্ষার প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ এর প্রান্তিক অবস্থা মাত্র।

الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ - وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ. (سورة الحج : ٤١-٣٩)

"যেসব মুসলমানের সাথে কাফিররা যুদ্ধ করে, এখন তাদেরকেও কাফিরদের সাথে আত্মরক্ষাকল্পে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হলো। এ জন্য যে, তাদের উপর নিপীড়ন চলছে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম ও শক্তিশালী। এরা সেসব নির্যাতিত ও মযলূম, যাদেরকে অন্যায়ভাবে দেশ থেকে শুধু এ অপরাধে বহিষ্কার করা হয়েছে যে, তাদের ঘোষণা হলো, "একমাত্র আল্লাহই আমাদের প্রভু– পরওয়ারদিগার। আর আল্লাহ যদি মানুষের এক দলকে অন্য দল দ্বারা দমন করার ব্যবস্থা না করতেন তাহলে (খৃষ্টানদের) গীর্জাসমূহ, (ইহুদীদের) উপাসনালয়সমূহ এবং (মুসলমানদের) মসজিদসমূহ যেগুলোতে অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করা হয়, কবেই এগুলো বিনাশ করে দেয়া হতো। আর যেসব লোক আল্লাহর (দীনের) সাহায্য করবে, আল্লাহও নিশ্চয়ই তাদের সাহায্য করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ অধিক শক্তিধর এবং পরাক্রমশালী।

(মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত) আমি যদি তাদেরকে কোনো ভূখণ্ডে শাসন কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত করি তখন তারা সমাজে নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করবে। আর সকল কাজের ফলাফল দানের অধিকার একমাত্র আল্লাহর এখতিয়ারে নিহিত।" (সূরা হজ্জ : ৩৯-৪১)

এরপর মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরয ঘোষণা করে আয়াত নাযিল হয়–

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ - وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ - وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ. (سورة البقرة : ٢١٦)

"(হে মুসলমানগণ!) তোমাদের উপর জিহাদ ফরয করা হলো, যদিও সেটা তোমাদের নিকট অপ্রিয়। আর (জেনে রেখো,) কোন জিনিস হয়তো তোমাদের অপ্রিয় অথচ পরিণামে সেটাই তোমাদের জন্য মঙ্গলকর, পক্ষান্তরে কোন বস্তু হয়তো তোমাদের অতিপ্রিয়' কিন্তু মূলত: সেটা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। বস্তুতঃ আল্লাহ্ই পরিণাম সম্পর্কে জানেন তোমরা সেটা জান না।" (সূরা বাকারা ঃ ২১৬)

অতঃপর মাদানী সূরাগুলোর মধ্যে জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করা হয়েছে আর জিহাদ ফরয করা হয় আর নিন্দা করা হয়েছে জিহাদ বর্জনকারীদের।

অধিকন্তু জিহাদ তরককারীকে মনের রোগী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ ঘোষণা করেন–

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبُّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ـ وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ. (سورة التوبة : ٢٤)

"হে নবী! আপনি মুসলমানদেরকে বলুন যে, যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন তোমাদের উপার্জিত ধন-সম্পদ খোয়াবার, ব্যবসা-বাণিজ্যের বাজার যা মন্দা হয়ে যাওয়ার শংকাবোধ করো আর নিজেদের যেসব বাসগৃহে বসবাস করতে তোমরা ভালবাস– এই প্রত্যেকটি বস্তু যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করার চাইতে অধিক প্রিয় অনুভূত হয়, তবে তোমরা অপেক্ষায় থাকো, আল্লাহর যা কিছু করার তিনি তাই বাস্তবায়িত করবেন। আর আল্লাহ তাঁর হুকুম অমান্যকারী লোকদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।" (সূরা তাওবা : ২৪)

আল্লাহ আরো বলেন–

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰۤئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ. (سورة الحجرات : ١٥)

"খাঁটি মুমিনতো একমাত্র তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে, অতঃপর নির্দ্বিধায় আল্লাহর পথে জান ও মাল দিয়ে জিহাদ[১] করবে, বস্তুতঃ তারাই সত্যবাদী, খাঁটি মুসলমান।" (সূরা হুজুরাত : ১৫)

১. টীকা : জিহাদের শাব্দিক অর্থ লক্ষ্য অর্জনের জন্যে সম্ভাব্য সকল চেষ্টা করা। ইসলামের পরিভাষায় আল্লাহর দ্বীন ইসলামী নীতি আদর্শকে ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য সম্ভাব্য সকল চেষ্টা করা, চরমভাবে এ পথে কেউ বাধা দিলে আত্মরক্ষাকল্পে প্রতিরোধ যুদ্ধ করা এর প্রান্তিক অর্থ। –অনুবাদক

তিনি আরো বলেন–

فَاِذَا اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِىِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَاَوْلٰى لَهُمْ . طَاعَةٌ وَّقَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ ـ فَاِذَا عَزَمَ الاَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوْا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ـ فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ. (سورة محمد : ٢٢-٢٠)

"অতঃপর যদি দ্ব্যর্থহীন কোনো সূরা অবতীর্ণ হয় এবং তাতে যুদ্ধের কোনো নির্দেশ থাকে, তখন হে নবী! অন্তরে নিফাকের রোগগ্রস্ত লোকদেরকে আপনি দেখতে পাবেন যে, তারা আপনার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকায় যেন, কারো উপর মৃত্যুকালীন ভীতি নেমে এসেছে। তাদের জন্য বড়ই আফসোস! তাদের মুখেতো আনুগত্যের স্বীকারোক্তি ও ভাল ভাল কথা ধ্বনিত হয়। কিন্তু যখন চূড়ান্ত নির্দেশ দেয়া হলো, তখন তারা যদি আল্লাহর নিকট তাদের ওয়াদার ব্যাপারে সত্যবাদী হতো তাহলে এদের জন্য মঙ্গলজনক হতো। সুতরাং যদি তোমরা বিমুখ হয়ে যাও তবে কি তাহলে তোমরা যমীনের বুকে ফাসাদ সৃষ্টি করার নিকটবর্তী অথবা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী হয়ে যাবে?" (সূরা মুহাম্মদ : ২০-২২)

কুরআন পাকে এ জাতীয় বহু আয়াত বিদ্যমান রয়েছে। এমনিভাবে জিহাদ ও মুজাহিদীনদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং গুরুত্ব সূরা আস্ সাফ এর মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ্ আরো ইরশাদ করেছেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ـ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ يَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ـ ذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ـ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ. (سورة صف : ١٣-١٠)

"হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসায়ের সন্ধান দেবো, যা তোমাদেরকে আখিরাতের কষ্টদায়ক 'আযাব থেকে মুক্তি দান করবে? তা এই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং জান-মালের দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করা। এটাই তোমাদের জন্য মঙ্গল ও কল্যাণকর, যদি তোমরা প্রজ্ঞা ও বিবেকবান হয়ে থাক। (এসব কাজ করলেই) আল্লাহ তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করবেন আর তোমাদেরকে 'আদন' জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, তদুপরি স্থায়ী জান্নাতের নয়নাভিরাম বাসগৃহে তোমাদের (প্রবেশ করাবেন), এটাই হল পরম সাফল্য। অধিকন্তু তোমাদের প্রাণপ্রিয় অপর একটি নিয়ামতও (দেয়া হবে সেটা হলো), আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি সাহায্য ও নিকটবর্তী বিজয়। (হে নবী!) মুমিনদেরকে আপনি এর সংবাদ শুনিয়ে দিন।" (সূরা সাফ : ১০-১৩)

আল কুরআনে আরো ইরশাদ হয়েছে :

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ لَا يَسْتَوُنَ عِنْدَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ ـ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ـ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ ـ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ـ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ـ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيْمٌ. (سورة توبة : ٢٢-١٩)

"তোমরা কি হাজীদেরকে পানি পান করানো এবং মসজিদে হারাম তথা কাবা শরীফ আবাদ রাখাকে সে ব্যক্তির সমতুল্য মনে করেছ, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ও কিয়ামত দিবসে উপর ঈমান এনেছে, আর আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে? এরা আল্লাহর নিকট আদৌ সমমানের হতে পারেনা। আর আল্লাহ কখনো জালিমদেরকে হিদায়েত দান করেন না। যারা ঈমান আনে, হিজরত করে এবং নিজের জান-মালের দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, আল্লাহর নিকট তারা অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। অধিকন্তু এরাই পরিপূর্ণ সফলকাম। তাদের পালনকর্তা তাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে দয়া, সন্তুষ্টি এবং এমন উদ্যানসমূহের সুসংবাদ দান

করেছেন, যেখানে তাদের জন্য চিরস্থায়ী নিয়ামত বিদ্যমান থাকবে, আর সেখানে তারা অনন্তকাল বসবাস করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট রয়েছে বিরাট প্রতিদান।" (সূরা তাওবা : ১৯-২২)

মহান আল্লাহ আরও ইরশাদ করেছেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗٓ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ـ يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ـ ذَالِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ ـ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ. (سورة المائدة : ٥٤)

"হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের মধ্যে কেউ যদি নিজের দীন থেকে ফিরে যায়, তবে আল্লাহ্ অতি শীঘ্রই এমন এক জাতি সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন। পক্ষান্তরে তারাও আল্লাহকে ভালবাসবেন। মুসলমানদের সাথে তাদের ব্যবহার হবে কোমল, কাফিরদের সাথে কঠোর, আল্লাহর পথে তারা জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দাবাদের ভয়ে তারা ভীত হবে না। এটা হচ্ছে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন, আর আল্লাহ সীমাহীন উপায় উপাদানের মালিক এবং তিনি মহাজ্ঞানী।" (সূরা মায়েদা : ৫৪)

এ সম্পর্কে আল্লাহ আরো বলেন–

ذَالِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَاءٌ وَّلَا نَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَئُوْنَ مَوْطَاً يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ ـ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ. وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ. (سورة التوبة : ١٢١-١٢٠)

"এটা এজন্য যে, আল্লাহর পথে তাদের (জিহাদকারীদের) পিপাসা, পরিশ্রম, ক্ষুধার কষ্ট পৌঁছেছে, কাফিরদের ক্রোধ উদ্রেক করে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা

এবং শত্রু পক্ষের নিকট থেকে কিছু প্রাপ্য হওয়া উহাদের সৎ কর্মরূপে গণ্য হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ নিষ্ঠাবান সৎ লোকদের সৎ কর্মের প্রতিদান নষ্ট করেন না। আর তারা ছোট বড় যা কিছু আল্লাহর পথে ব্যয় করে এবং (যুদ্ধকালীন) যেসব ময়দান উপত্যকা অতিক্রম করে, এসবই তাদের নামে লিখা হয়। এদ্বারা আল্লাহ্ তাদের কৃত কাজের উত্তমতর বিনিময় দান করবেন।" (সূরা তাওবা : ১২০-১২১)

অতঃপর এ সকল সামাজিক কার্যকলাপের ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তা উল্লেখ করে জিহাদের হুকুম দেয়া হয়েছে। কুরআন-হাদীসের বহু স্থানে জিহাদের উল্লেখ করা হয়েছে। অধিকন্তু এ পর্যায়ে এও বলা হয়েছে– জিহাদ সর্বোত্তম কর্ম। এরি ভিত্তিতে আলিমগণের সর্বসম্মত ফতওয়া হাজ্জ, উমরা এবং নফল রোযার চাইতেও জিহাদ উত্তম। কুরআন-হাদীসেও এর প্রমাণ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন–

رَأْسُ الْاَمْرِ الْاِسْلَامُ وَعُمُوْدُهُ الصَّلٰوةُ وَذَرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ -

"ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ, নামায তার খুঁটি আর জিহাদ ইসলামের সর্বোৎকৃষ্ট আমল।"

তিনি আরো বলেন–

اِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَمِاْةُ دَرَجَةٌ مَا بَيْنَ الدَّرَجَةِ وَالدَّرَجَةِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَعَدَّهَا اللّٰهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِىْ سَبِيْلِهِ - (متفق عليه)

"জান্নাতে একশ'টি স্তর রয়েছে, দুই স্তরের মাঝখানে আকাশ-পাতাল পরিমাণ ব্যবধান। আর এ স্তরগুলো আল্লাহ্ তায়ালা আল্লাহর পথে জিহাদকারীগণের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।" (বুখারী, মুসলিম)

তিনি আরো বলেন–

رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِّنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَاِنْ مَاتَ اُجْرِىَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِىْ كَانَ يَعْمَلُهُ وَاُجْرِىَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَاَمِنَ الْفَتَّانَ -

(رواه مسلم)

"আল্লাহর পথে একদিন, এক রাত্রি অবস্থান এক মাস রোযা (নফল) রাখা এবং এক মাস ব্যাপী রাত্রি জাগা অপেক্ষা উত্তম। এমতাবস্থায় যদি সে মারা যায়, তবে

সে নিজ আমলের প্রতিদান পেতে থাকবে, তার রিযিক জারি করে দেয়া হবে এবং ফিৎনা-ফাসাদ থেকে সে নিরাপত্তা লাভ করবে।" (মুসলিম)

এ সম্পর্কে মহানবী (সা) আরো বলেছেন–

لاَ تَمَسُّهَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرِسُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

"যে চোখ আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে এবং যে চোখ আল্লাহর পথে সীমান্ত প্রহরায় সদা নিয়োজিত থাকে, জাহান্নামের আগুন তাকে কখনো স্পর্শ করবে না।" (ইমাম তিরমিযীর মতে হাদীসটি 'হাসান')

মুসনাদ আহমদে বর্ণিত হয়েছে–

حَرْسُ لَيْلَةٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ لَيْلَةٍ يُقَامُ لَيْلُهَا وَيُصَامُ نَهَارُهَا - (مسند احمد)

"আল্লাহর রাস্তায় এক রাত পাহারার কাজে থাকা, ইবাদতে এক হাজার রাত জাগরণ এবং সহস্র রোযার চাইতেও উত্তম।"

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে–

اِنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَخْبِرْنِيْ بِشَيْءٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - قَالَ تَسْتَطِيْعُهُ - قَالَ اَخْبِرْنِيْ - قَالَ هَلْ تَسْتَطِيْعُ اِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ اَنْ تَصُوْمَ لاَ تَفْطُرَ وَتَقُوْمَ لاَ تَفْتُرَ - قَالَ لاَ - قَالَ فَذَالِكَ الَّذِيْ يَعْدِلُ الْجِهَادَ. (بخارى ومسلم)

"জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল– "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এমন জিনিস বলে দিন যা আল্লাহর পথে জিহাদ করর সমতুল্য হয়," তিনি বললেন ঃ তুমি সক্ষম হবে না। সে বলল ঃ 'তবু, আপনি বলুন'। তিনি বললেন ঃ তোমার পক্ষে কি এটা সম্ভব হবে যে, মুজাহিদ যখন জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়, তখন থেকে তুমি রোযা রাখা শুরু করবে, অতঃপর ইফতার করবে না আর রাত্রি বেলা তাহাজ্জুদ শুরু করবে কিন্তু বিরত হবে না? সে বলল ঃ 'না'। তিনি বললেন ঃ এ ইবাদতই জিহাদের সমতুল্য হতে পারে।"

এ সম্পর্কে সুনানের রেওয়ায়েত রয়েছে। যেমন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ سِيَاحَةً وَسِيَاحَةُ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ـ

"প্রত্যেক উম্মতই ভ্রমণ করে থাকে, আমার উম্মতের ভ্রমণ হল (প্রয়োজনে) আল্লাহর পথে জিহাদ অভিযানে বের হওয়া।"

জিহাদের আলোচনা অতি দীর্ঘ ও ব্যাপক আকার করা হয়েছে। জিহাদের তাৎপর্য, জিহাদের আমল, জিহাদের প্রতিদান ও সাওয়াব এবং এর ফল, ফযীলত ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে এত অধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, অন্য কোন বিষয় ও আমল সম্পর্কে সে পরিমাণ হাদীস বর্ণিত হয়নি। চিন্তা করলে বিষয়টি স্পষ্ট। কারণ, জিহাদের উপকারিতা ও সুফল দীন দুনিয়ায় স্বয়ং মুজাহিদ এবং অন্যান্য সকলের জন্য ব্যাপক। প্রকাশ্য ও গোপন, যাহেরী ও বাতেনী যাবতীয় ইবাদত বন্দেগী এর আওতাভুক্ত। কেননা (ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠায় এবং ঈমানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার প্রশ্নে) আল্লাহর মহব্বত, ইখলাস এবং তাওয়াক্কুল এসবই আল্লাহর পথে জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। নিজের জান-মাল আল্লাহর নিকট সমর্পণ করে দেয়া, ধৈর্য, পরহেযগারী, আল্লাহর যিকির এবং যাবতীয় নেক আমলই এর মধ্যে শামিল রয়েছে। জিহাদ ব্যতীত এমন কোন আমল পরিলক্ষিত হয় না, যার মধ্যে এসব আমলের একত্রে সমাবেশ ঘটেছে।

যে ব্যক্তি, যে জাতি জিহাদে আত্মনিয়োগ করে, দু'ধরনের কল্যাণ দ্বারা তারা লাভবান হয়। (১) আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। (২) অথবা শহীদ সাজে সজ্জিত হয়ে বেহেশতে প্রবেশ। মানুষের জন্য জীবন মরণের সমস্যাটি বড় জটিল। জিহাদের মধ্যে দীন দুনিয়ার সৌভাগ্য নিহিত। কাজেই এর মাধ্যমে এ কঠিন সমস্যাটির অতি সহজ সমাধান রয়েছে। পক্ষান্তরে জিহাদ বর্জন করার পরিণতিতে দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হতে হয় কিংবা তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোন কোন লোক কঠোর সাধনা এবং দ্বীন-দুনিয়ার কামিয়াবীর উদ্দেশ্যে কষ্টসাধ্য আমলের আশ্রয় নেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাতে লাভ অতি সামান্যই হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে, জিহাদ এমন একটি আমল বা কাজ, যা অন্য সব কষ্টকর আমলের তুলনায় অধিকতর ফলদায়ক। সময় সময় লক্ষ্য করা যায় যে, মানুষ নিজের আত্মিক সংশোধন এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে জান হাতে নিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখী হয়ে কঠোর সাধনায় লিপ্ত হয়। কিন্তু বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে শহীদের মৃত্যুই অপর সকল প্রকার মৃত্যুর চেয়ে সহজ ও উত্তম।

জিহাদকে শরীয়ত সিদ্ধ করাই হলো যুদ্ধ ও সংঘর্ষের মূল উদ্দেশ্য আর জিহাদের মূল কথা হল দ্বীন (তথা মানুষের পুরো জীবনের সকল কর্মকাণ্ড ও চিন্তা-মনন) একমাত্র আল্লাহর বিধান মাফিক হয়ে যাওয়া। কালিমাতুল্লাহ সর্বক্ষেত্রে সার্বিকভাবে প্রাধান্য লাভ করা। সুতরাং যারা জিহাদের বিরোধিতা করে, নিষেধ করে, প্রতিরোধ সৃষ্টি করে কিংবা এর বিপক্ষে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, গোটা উম্মতের ঐক্যমত (ইজমা-এ-উম্মাহ্)-অনুসারে সরকারী কর্তৃত্বাধীন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং তাদের নির্মূল করাটাই হলো সকলের রায়। কিন্তু যারা প্রতিরোধ গড়ে তোলে না, মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে জড়িত হয় না, যেমন নারী, শিশু, ধর্মীয় নেতা, বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ, অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, লেংড়া প্রমুখ জমহুর ইসলামী বিশেষজ্ঞদের সর্বসম্মত অভিমত হলো, রনাঙ্গনে তাদের হত্যা করা যাবে না। হত্যাযোগ্য কেবল সে সকল ব্যক্তি, যারা কথায় ও কাজে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ ও যুদ্ধে লিপ্ত হয়। অবশ্য কেউ কেউ তার বিপরীত মত ব্যক্ত করেছে। তাদের এ মতের সপক্ষে দলীল হলো, যেহেতু বিদ্রোহীরা কাফির, কাজেই তাদেরকে যুদ্ধের মাধ্যমে দমন ও প্রয়োজনে ইসলামী আদালতের বিচারে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। আর নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করবে। প্রথমোক্ত মতই সঠিক ও বিশুদ্ধ। কেননা মূলতঃ জিহাদ এটাই। এ পরিপ্রেক্ষিতেই নির্দেশ এসেছে যে, আমরা যখন দীনের দাওয়াত পেশ করি, ইসলাম প্রচার করি এবং সত্য দ্বীনের প্রচার-প্রসার দ্বারা শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে থাকি, তখন তারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, আমাদেরকে বারণ করে এবং তাবলীগ ও প্রচার কার্যে বাধা সৃষ্টি করে।

সুতরাং মহান আল্লাহর বাণী হলো :

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوْا - اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ.

“(হে মুসলমানগণ! ন্যায় সত্য প্রতিষ্ঠায়) যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও আল্লাহর রাস্তায় তাদের সাথে যুদ্ধ কর। কিন্তু ইসলামী সমরনীতি লঙ্ঘন করে বাড়াবাড়ি ও সীমা অতিক্রম করো না। আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদেরকে আদৌ পছন্দ করেন না।”

‘সুনানে’ বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা) এক স্থানে কতিপয় লোকের ভীড় দেখতে পান। সেখানে একটি নারীর মৃতদেহ পড়েছিল। এমতাবস্থায় তিনি বললেন :

مَاكَانَتْ هٰذِهِ لِتُقَاتِلَ "এ মহিলাটিতো কাউকে হত্যা করার মত ছিল না।"

অপর এক ঘটনায় মহানবী (সা) এক ব্যক্তিকে বললেন–

اِلْحَقْ خَالِدًا فَقُلْ لَهُ لاَ تَقْتُلُوْا ذُرِّيَّةً وَلاَ عَسِيْفًا ـ

"যাও খালেদের সাথে গিয়ে দেখা করে তাকে বলো– ছোট শিশু, মজদুর ও গোলামদেরকে যেন হত্যা না করে।"

একই সুনান গ্রন্থে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) বলেছেন–

لاَ تَقْتُلُوْا شَيْخًا فَانِيًا وَلاَ طِفْلاً صَغِيْرًا وَلاَ امْرَأَةً ـ

"অতিবৃদ্ধ, ছোট শিশু এবং নারীদেরকে হত্যা করো না।"

যুলুমের অবসানে সৃষ্টজগতের কল্যাণার্থেই জিহাদ বৈধ করা হয়েছে। ইসলামে (ন্যায়-নীতি শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাধা দানকারীদের) মৃত্যুদণ্ড দানের নির্দেশের পশ্চাতে মানব তথা সৃষ্টজগতের সার্বিক কল্যাণই উদ্দেশ্য। কেননা আল্লাহ বলেন–

اَلْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ـ

"ফিৎনা, দাঙ্গাহাঙ্গামা হত্যা অপেক্ষা জঘন্যতম অপরাধ।" অবশ্য হত্যা করাও শাস্তিযোগ্য অপরাধ, কিন্তু কুফরী এবং কাফিরের সৃষ্ট ফিৎনা-ফাসাদ তার চাইতেও বড় অপরাধ। কাজেই, দীনের প্রচার এবং ইসলামের ন্যায় বিধান প্রতিষ্ঠার কাজে যে ব্যক্তি বাধা দেয় না, প্রতিরোধ সৃষ্টি করে না, তার কুফরী কেবল তার নিজের জন্যই ক্ষতিকর, মুসলমানদের বেলায় নয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ফকীহগণ বলেছেন, কুরআন ও হাদীস বিরোধী কোন বিদআত সৃষ্টি করা, এর প্রতি মানুষকে আহ্বান করা, সেই বিদআতের প্রচার-প্রসার দান, দ্বীনের প্রত্যক্ষ অপমান ও প্রকাশ্য বিরোধিতারই নামান্তর। কাজেই বিদআতের উদ্ভাবক ও প্রচারক উভয়কেই সাজা দিতে হবে। তবে কেউ যদি সক্রিয় না হয়ে এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ বা নীরব থাকে, তাদের সাজা দেয়া যাবে না।

হাদীসে বর্ণিত রয়েছে–

اِنَّ الْخَطِيْئَةَ اِذَا اُخْفِيَتْ لَمْ تُضَرَّ اِلاَّ صَاحِبَهَا وَلٰكِنْ اِذَا اُظْهِرَتْ فَلَمْ تُنْكَرْ ضَرَّتِ الْعَامَّةَ ـ

"গুনাহ যদি গোপনে করা হয়, তবে কেবল সংশ্লিষ্ট গুনাহগারই ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে, কিন্তু যখন প্রকাশ্যে গুনাহ করা হয়, আর তাতে বাধা দেয়া না হয়, তবে তা ব্যাপকহারে জনগণকে ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকে।"

এ জন্যই শরীয়ত কাফিরদের সাথে জিহাদ করাকে ওয়াজিব করেছে। কিন্তু অক্ষম ও অসহায় লোকদের সাথে জিহাদ করা ওয়াজিব করা হয়নি। বরং কেউ যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে গোপনে যুদ্ধ অথবা এ সংক্রান্ত ব্যাপারে পরামর্শ দেয়, নৌযান কিংবা জাহাজের নৌ পথ দেখিয়ে দেয়, যুদ্ধের অন্য কোন কাজ করে, মুসলমানদেরকে ভুল পথ দেখায় অথবা কোন কৌশল বাৎলে দেয়, এরূপ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত কঠোর ব্যবস্থার বদলে নরম পন্থা অবলম্বন করা ইসলামী রাষ্ট্রের নেতা তথা ইমাম, ওয়ালী অথবা শাসন কর্তার জন্য অপরিহার্য। জ্ঞান বুদ্ধির মাধ্যমে এ থেকে বেঁচে থাকার পথ গ্রহণ করবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিপক্ষ নেতাকে এ কাজ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেবে। মোট কথা অপরাধের ধরন প্রকৃতির প্রেক্ষিতে সংশোধন অযোগ্য অবস্থাতে প্রয়োজনে কোর্ট তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করবে। অথবা দয়াপরবশ হয়ে ছেড়ে দেবে, কিংবা জামিনে মুক্তি দান করবে কিংবা যা ভাল মনে করবে তাই করবে। এটাই অধিকাংশ ফকীহ্ বা ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞের অভিমত, কুরআন, হাদীস দ্বারাও এটি প্রমাণিত।

অবশ্য কোন কোন ফকীহ্ ইহসান বা দয়া কিংবা ফিদিয়া নিয়ে ছেড়ে দেয়াকে মনসূখ ও বাতিল বলে থাকেন। কিতাবী ও মজূসী (অগ্নিউপাসক) সম্পর্কে শরীয়তের বিধান হল, তারা পরিপূর্ণভাবে ইসলাম গ্রহণ না করা অথবা জিযিয়া না দেয়া পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। উক্ত দু'জাতি ব্যতীত অন্যসব লোকের নিকট থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা সম্পর্কে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। কিন্তু সাধারণ ফকীহগণ অন্যদের কাছ থেকে জিযিয়া আদায় করার পক্ষপাতি নন।

ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত যে দল বা সম্প্রদায় যাদেরকে মুসলমান বলা হয়, শরীয়তের জাহেরী এবং মুতাওয়াতির (অব্যাহত) হুকুম পালনে তারা অপরকে নিষেধ করে কিংবা নিজে অমান্য করে, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ওয়াজিব। এটা মুসলমানদের সর্বসম্মত অভিমত। অধিকন্তু দ্বীন পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত প্রতিরোধকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যাহত রাখা ফরয। উদাহরণতঃ যেমন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং সকল সাহাবী যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। যদিও প্রথমাবস্থায় কেউ কেউ দ্বিমত প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে তারাও একমত হয়ে যান। হযরত উমর (রা) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর সামনে উক্তি করে বসেন–

كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهَ وَاَنْ

مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَاِذَا قَالُوْهَا فَقَدْ عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَائَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ ـ

"আপনি মানুষের সাথে কিভাবে জিহাদ করবেন? অথচ মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন : প্রতিপক্ষ মানুষের সাথে আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যতক্ষণ তারা সাক্ষ্য না দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রাসূল। তারা যখন এ সাক্ষ্য প্রদান করবে, তখনই তাদের জান-মাল নিরাপদ হয়ে যাবে। অবশ্য কারো কোন হক পাওনা থাকলে সেটার বিচার স্বতন্ত্র আর তাদের হিসাব আল্লাহর হাতে ন্যস্ত।" হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এই যুক্তির জবাবে বললেন—

فَاِنَّ الزَّكٰوةَ مِنْ حَقِّهَا وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِىْ عِنَاقًا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلٰى مَنْعِهَا ـ

"যাকাত সে তো কালিমারই হক। আল্লাহর কসম! তারা যদি সে টুকরাটিও সরকারকে দিতে অস্বীকার করে, যা তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সমীপে প্রদান করতো, তবু তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কাজ অব্যাহত থাকবে।"

পরবর্তীকালে হযরত উমার (রা) বলতেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধের ব্যাপারে হযরত আবু বকর (রা)-এর অন্তর খুলে দিয়েছিলেন। এখন আমি উত্তমরূপে উপলব্ধি করছি যে, তিনি ছিলেন সত্যের উপর।

মহানবী (সা) থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি চরমপন্থী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদের হুকুম দিয়েছেন। সুতরাং বুখারী ও মুসলিমে আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা) বলেছেন—

سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ اَحْدَثُ الْاِنْسَانِ ـ سُفَهَاءُ الْاَحْلَامِ ـ يَقُوْلُوْنَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ لاَ يُجَاوِزُ اِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَاَيْنَمَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ فَاِنَّ فِىْ قَتْلِهِمْ اَجْرًا لِّمَنْ قَاتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ (بخارى ـ مسلم)

"শেষ যামানায় এক দল লোক বাহির হবে যারা হবে, বয়সে যুবক এবং স্বপ্নবিলাসী নির্বোধ। তারা সৃষ্টি জগতের উত্তম ব্যক্তির কথা বর্ণনা করবে বটে কিন্তু ঈমান তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না, ভিতরে প্রবেশ করবে না। ধনুক থেকে তীর যেমন ছুটে বের হয়ে যায়, দ্বীনও তাদের কাছ থেকে তেমনি দ্রুত বেরিয়ে যাবে। সুতরাং (ক্ষণভঙ্গুর ঈমানের ঐ সকল লোক যখন ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্ব বিনাশে সশস্ত্র হামলায় এগিয়ে আসবে,) তাদের সাথে যেখানেই মুখোমুখী সংঘাতের ঘটনা ঘটবে সেখানেই সংঘবদ্ধভাবে লড়াই করবে এবং রণাঙ্গনের যেখানে পাবে মৃত্যুর ঘাটে পৌছিয়ে দেবে। যে ব্যক্তি তাদেরকে হত্যা করবে কিয়ামতের দিন সে সাওয়াবের অধিকারী হবে।"

সহীহ মুসলিমে হযরত আলী (রা) এর বর্ণনায় অপর হাদীসে আছে, তিনি বলেন– আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি–

يَخْرُجُ قَوْمٌ مِّنْ اُمَّتِىْ يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْاٰنَ لَيْسَ قَرَائَتُكُمْ اِلٰى قَرَاءَتِهِمْ بِشَيْءٍ وَلاَ صِيَامُكُمْ اِلٰى صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ - يَقْرَؤُنَ الْقُرْاٰنَ يَحْسَبُوْنَهُ اَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ لاَتُجَاوِزُ قَرَاءَتُهُمْ تَرَاقِيْهِمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْاِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. (مسلم)

"আমার উম্মতের মধ্য থেকে এমন একদল লোক সৃষ্টি হবে, তারা কুরআন পাঠ করবে, তাদের কিরাআতের তুলনায় তোমাদের কিরাআত কিছুই নয়, তেমনি তাদের রোযার সাথেও তোমাদের রোযার কোন তুলনা চলে না। তারা কুরআন পাঠ করবে আর ধারণা করবে যে, কুরআন তাদের সপক্ষে দলীলস্বরূপ, অথচ প্রকৃতপক্ষে কুরআন তাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে। তাদের কুরআন পাঠ কণ্ঠনালীর ভিতরে প্রবেশ করবে না। ইসলামের গণ্ডি থেকে তারা এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন ধনুক থেকে তীর বের হয়ে যায়।"

অতএব যে সেনাদলের নিকট মহানবী (সা) প্রদত্ত এ সিদ্ধান্ত পৌছবে, তারা অবশ্যই এর তাৎপর্য উপলব্ধি করে সে অনুযায়ী আমল করবে।

আবু সাঈদ (রা) উপরোক্ত হাদীসের সাথে অতিরিক্ত আরেক রেওয়ায়েত যুক্ত করে বর্ণনা করেছেন–

يَقْتُلُوْنَ اَهْلَ الْاِيْمَانِ - وَيَدْعُوْنَ اَهْلَ الْاَوْثَانِ لَئِنْ اَدْرَكْتُهُمْ لَاَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ - (بخارى)

"তারা মুসলমানদের কতল করবে এবং (একাজে শরীক হতে) মূর্তিপূজকদেরও আহ্বান করবে। আমি তাদের সাক্ষাৎ পেলে (অভিশপ্ত) আদ সম্প্রদায়ের ন্যায় আমি তাদের কতল করতাম।" (বুখারী, মুসলিম)

মুসলিমের অপর এক রেওয়ায়েতে আছে,

تَكُوْنُ اُمَّتِىْ فِرْقَتَيْنِ فَتَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمَا مَارِقَةٌ يَّلِىْ قَتْلَهُمْ اَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ.

"আমার উম্মত দুই দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। উভয় দলের মধ্য থেকে ধর্মত্যাগী এক দল প্রস্তুত হবে, তখন সত্য পন্থীরা তাদের নির্মূল করে ফেলবে।"

এরা হল সেই লোক, ইরাকী এবং সিরীয়দের মধ্যে কোন্দল ও বিভেদ সৃষ্টি করার কারণে হযরত আলী (রা) যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। সাহাবীগণ তাদেরকে 'হারুরিয়া' নামে চিহ্নিত করেছিলেন।

নবী করীম (সা) এ উভয় দলকে নিজ উম্মত থেকে খারিজ এবং হযরত আলী (রা)-এর সঙ্গীগণকে হকের উপর কায়েম সত্যপন্থী বলে উল্লেখ করেছেন। উক্ত مَارِقِيْن ধর্মত্যাগীদের ছাড়া হুযূর (সা) এসময় (বাহ্যিক কালিমা পড়ুয়া) অন্য কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উৎসাহ প্রদান করেননি। বরং যুদ্ধ ও জিহাদ করার হুকুম তাদের বিরুদ্ধেই দান করেছিলেন– যারা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে ইসলামী জামাআত ছেড়ে দিয়েছিল এবং মুসলমানদের জান-মাল নিজেদের জন্য হালাল ও বৈধ করে নিয়েছিল।

কাজেই কুরআন হাদীস এবং "ইজমায়ে উম্মতে"র দ্বারা প্রমাণিত যে, ইসলামী শরীয়তের সীমার বাইরে চলে যাওয়া ঐ সকল মুসলমান, যদিও তারা মুখে কালিমা শাহাদাত لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه এর স্বীকারোক্তি ঘোষণা দিক, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বৈধ।

ফকীহগণ বলেন : কোন একটি বিরাট সংঘবদ্ধ দল যদি সুন্নাতে মুয়াক্কাদার বিরোধিতা ও তা অস্বীকার করে এবং পরিত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়, যেমন ফজরের সুন্নাত অস্বীকার করে তবে, উভয় মতানুযায়ী রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিবে। আর যদি ওয়াজিব এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হারামকে

অস্বীকার করে তবে, সর্বসম্মত মত হলো তাদের বিরুদ্ধেও রাষ্ট্রীয় শক্তি প্রয়োগ করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ সংঘবদ্ধ দল নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইসলামের বিধানগুলো যথারীতি পালন করে এবং মুহাররামাত যেমন আপন ভগ্নিকে বিয়ে করা, অপবিত্র জিনিস খাওয়া ও মুসলমানদেরকে এসবের হুকুম করা থেকে বিরত না থাকে। এমন সব লোকদের বিরুদ্ধে সরকারীভাবে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া ওয়াজিব। অবশ্য এ নিয়ে ওয়াজিব তখনই হবে যখন নবী করীম (সা) এর দাওয়াত ও বাণী তাদের নিকট যথাযথ পৌঁছে যায়।

কিন্তু তারা যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রথমে নিজেরা যুদ্ধ শুরু করে তখন তাদের বিরুদ্ধে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া এবং বীর বিক্রমে তাদের মুকাবিলা করা সাধারণভাবে প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয। আর মুকাবিলা এমনভাবে করতে হবে তারা যেভাবে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে এবং যেভাবে জুলুমকারীদের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করতে হয়। যথা, অত্যাচারী ডাকাত দলের বিরুদ্ধে। বরং তাদের চাইতেও ফরয হল সেসব লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, যারা যাকাত আদায় করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং শরীয়তের হুকুমের বিরোধিতা করে ও খারেজীদের ন্যায় ফিৎনার সৃষ্টি করে।

উল্লেখ্য, যুদ্ধের প্রশ্নে, আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করাটাই হল উত্তম এবং এটা 'ফরযে কিফায়া'। কতিপয় মুসলমান জিহাদে অংশগ্রহণ করলে সকলের পক্ষ থেকে জিহাদের ফরয আদায় হয়ে যাবে। তবে সক্রিয় অংশগ্রহণকারীদের ফযীলত ও মর্যাদা অধিক। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُوْلِى الضَّرَرِ .....الخ

"যে সকল মুসলমান বিনা ওযরে বা কারণ ব্যতীত জিহাদে শরীক হওয়া থেকে বিরত থাকে, তারা কখনো (মর্যদায় স্বত:স্ফূর্ত অংশ-গ্রহণকারীদের)সমান হতে পারে না।" (সূরা নিসা : ৯৫)

শত্রু যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে আকস্মিক আক্রমণ করে বসে, এমতাবস্থায় প্রতিটি মুসলমানের উপর সাধারণভাবে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা ফরয। এ আক্রমণ প্রতিহত করা আক্রান্ত মুসলমানদের উপর ফরয হওয়ার কারণ হলো বিপণ্ন মুসলমানদের সাহায্যে এগিয়ে আসা ফরয। যেমন আল্লাহ বলেন—

وَاِنْ يَنْصُرُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ -

"দীনের ব্যাপারে যদি তারা তোমাদের সাহায্য কামনা করে তবে তোমাদের জন্য তাদের সাহায্য করা অবশ্য কর্তব্য। তবে সে কাওম বা গোত্রের বিরুদ্ধে নয়, যাদের সাথে তোমাদের পারস্পরিক চুক্তি রয়েছে।"

একই প্রসঙ্গে নবী করীম (সা) বলেন, اَلْمُسْلِمُ يَنْصُرُ الْمُسْلِمَ "এক মুসলমান অপর মুসলমানকে সাহায্য করবে।"

বস্তুতঃ মুসলমানদের সাহায্য করতেই হবে, এতে পারিশ্রমিক কিংবা ভাতাস্বরূপ কিছু পাওয়া যাক আর না যাক। অবশ্য সরকারীভাবে বেতন দেয়াটা উত্তম। এক্ষেত্রে ইসলামী সরকারকে সকল মুসলমানের নিজ সামর্থ্যানুযায়ী জান-মাল দ্বারা সাহায্য করা কর্তব্য। আর এ সাহায্য তাদের উপর ফরয। যার যতটুকু সামর্থ্য রয়েছে, কম হোক কিংবা বেশী, পদব্রজে যেতে হোক অথবা সওয়ার হয়ে, সর্বাবস্থায় সাহায্য সহায়তা দান করা ফরয। যেমন, খন্দক যুদ্ধের সময় কাফিররা আক্রমণ করার পর প্রত্যেক মুসলমানের উপর নিজ নিজ অবস্থানুযায়ী জিহাদ ফরয হয়ে গিয়েছিল।

কোন মুসলমানের জন্যই এ যুদ্ধ যাত্রা থেকে অব্যাহতি লাভের আদৌ কোন অনুমতি ছিল না। যেমনটি ছিল না ইসলামের প্রাথমিক যুগে। আল্লাহ তা'আলা এ পরিস্থিতিতে মুসলমানদের দু'দলে বিভক্ত করে বর্ণনা করেছেন। (১) কায়ে'দ তথা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি এমন লোক (২) আর খারেজ তথা জিহাদে যোগদানকারী বেযুদ্ধা ও যোদ্ধা। এ পরিস্থিতিতেও যুদ্ধে না যাবার অনুমতি প্রার্থনা করে যারা নবী করীম (সা) এর নিকট আবেদন করেছিল, তাদের ব্যাপারে তিরস্কারমূলক আয়াত নাযিল করে আল্লাহ বলেন-

يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِىَ بِعَوْرَةٍ - اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلاَّ فِرَارًا -

"রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট তাদের একজন এই বলে বাড়ী ফিরার অনুমতি চেয়েছিল যে, আমাদের ঘর-বাড়ী অরক্ষিত অথচ বাস্তবে সেগুলো অরক্ষিত ছিল না। পলায়ন করাই আসলে তাদের উদ্দেশ্য ছিল।"

এ যুদ্ধ ছিল নিজেদের দীন, ইজ্জত-আব্রু, জান-মাল ইত্যাদির নিরাপত্তার জন্য একান্ত আত্মরক্ষামূলক। বাধ্য হয়েই এ যুদ্ধ পরিচালনা করতে হয়। পক্ষান্তরে পূর্বে উল্লেখিত যুদ্ধ ছিল ইসলামের সম্প্রসারণ এবং দীনের প্রাধান্য সৃষ্টির লক্ষ্যে; শত্রুদের উপর নিজেদের প্রভাব সৃষ্টি করা তাদের ভীত সন্ত্রস্ত করে রাখা এবং দুশমন যেন কখনো মাথা তুলতে না পারে সে জন্য। তবুক যুদ্ধ তারই বাস্তব প্রমাণ।

কাজেই এ আক্রমণমূলক ব্যবস্থা হলো সেই শক্তিশালী বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে

দমনমূলক পন্থা হিসাবে। কিন্তু বিদ্রোহী শক্তি যদি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ শক্তিশালী না হয় বরং দুর্বল আর মাত্র বিচ্ছিন্নভাবে দু-একটা ঘটনা ঘটায়, তবে তাদের বিরুদ্ধে এ ব্যবস্থা প্রযোজ্য নয়। যদি তারা শক্তিশালী হয় এবং মুসলিম জনপদ ও বস্তিতেও তাদের প্রকাশ ঘটে থাকে, আমীর বা শাসনকর্তার দায়িত্ব হলো, এ জাতীয় লোকদের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব ইত্যাদি আমল-ইবাদতে অভ্যস্ত করে তোলা এবং ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি ও দ্বীনের প্রয়োজনীয় মাসলা-মাসায়েল শিক্ষা দেয়া, এসবের উপর আমল করতে বাধ্য করা। অধিকন্তু চাল-চলন, আচর ব্যবহারে আমানত পূর্ণ করা, অঙ্গীকার ও ওয়াদাপূর্ণ করা ইত্যাদি গুণাবলী অর্জনে বাধ্য করাও রাষ্ট্রীয় ইমামের কর্তব্য।

সুতরাং যারা নামায পড়ে না, মহিলারা সাধারণতঃ নামাযে অসলতা করে থাকে, তাদেরকে নামাযের জন্য কড়া নির্দেশ দিতে হবে। এতদসত্ত্বেও যারা নামায পড়বে না তাদেরকে সাজা দিতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নামায পড়তে শুরু করে। এটাই হল মুসলিম ফেক্হী আইন বিশেষজ্ঞদের 'ইজমা' বা সর্বসম্মত রায়। এছাড়া আরেক মত হলো, বেনামাযী প্রথমতঃ তওবা করবে, পরে তাকে নামায পড়ার হুকুম দিতে হবে। যদি এতে কাজ হয়, সে নামায পড়তে শুরু করলে তো উত্তম, নতুবা তাকে মৃত্যুদন্ড দিতে হবে। প্রশ্ন হলো, কোন্ অপরাধের ভিত্তিতে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে? "নামায না পড়াতে সে 'কাফির' হয়ে গেল"– এ কারণে? নাকি সে মুরতাদ ও ফাসেক হয়ে যায়– সে কারণে?

এর উত্তরে ইমাম আহমদ প্রমুখদের মযহাব অনুযায়ী দু'ধরনের মত লক্ষ্য করা যায়। এক মত অনুযায়ী সে কাফের হয়ে যায় এবং দ্বিতীয় মত অনুসারে ফাসেক। এ কারণে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। অধিকাংশ 'সলাফে' তথা পূর্বসূরী বিশেষজ্ঞদের মতে, সে কাফের হয়ে যায়' কাজেই তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া কর্তব্য। কোনো মুসলিম নাগরিকের জন্য এ দণ্ড তখন, যখন সে "নামায পড়া ফরয" এটা মেনে নিয়ে এবং মুখে স্বীকার করেও বাস্তবে নামায পড়ে না। কিন্তু সে ব্যক্তি যদি নামায ফরয হওয়াকেই অস্বীকার করে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে সে কাফের।

কাজেই অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে মেয়েদেরকে সাত বছর বয়স হতেই নামাযের জন্য হুকুম দেয়া অভিভাবকের উপর ওয়াজিব। আর দশ বছর পূর্ণ হলে প্রহার ও বেত্রাঘাত করে হলেও নামাযে অভ্যস্থ করতে হবে। হুযুর (সা) বলেছেন–

وَمُرُوْهُمْ بِالصَّلٰوةِ بِسَبْعٍ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا بِعَشْرٍ - وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ -

"সন্তান সাত বছরে পৌঁছুলে তাকে নামাযের হুকুম করো আর দশ বছর পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও যদি নামায না পড়ে, তবে তাকে প্রহার কর এবং শয্যা পৃথক করে দাও।"

এমনিভাবে সন্তানদেরকে নামাযের প্রয়োজনীয় মাসআলাসমূহ, পাক পবিত্রতা এবং জরুরী মাসআলাও শিক্ষা দেয়া কর্তব্য। নামাযের আনুষঙ্গিক বিষয়গুলোর মধ্যে মসজিদ আবাদ করা, মসজিদের ইমাম নির্দিষ্ট করা ইত্যাদিও শামিল। তাদেরকে হুকুম দিতে হবে যে, রাসূলুল্লাহর (সা)-এর ন্যায় নামায পড়তে হবে ও পড়াতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন- صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ ـ

"আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখ ঠিক সেভাবে তোমরা নামায পড়।" (বুখারী)

একবার তিনি সাহাবীগণকে মিম্বরের নিকট নিয়ে গিয়ে নামায পড়ালেন, অতঃপর ইরশাদ করলেন-

اِنَّمَا فَعَلْتُ هٰذَا لِتَاْتَمُّوْا بِىْ وَلِتَعْلَمُوْا صَلٰوتِىْ ـ

"এ ব্যবস্থা আমি এজন্য করেছি যে, তোমরা যেন আমার অনুসরণ করো এবং আমার নামায পড়ার নিয়ম পদ্ধতি শিখে নাও।"

জনগণের নামাযের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রাখাও ইমামের দায়িত্ব। যেন তাদের নামাযে কোন ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি না থাকে। ইমামত করাকালীন অবস্থায় ইমাম পরিপূর্ণরূপে নামায পড়াবেন, এটা তার দায়িত্ব। একাকী নামায পড়ার ন্যায় পড়াবে না। কেননা একাকী নামাযে ওযরের কারণে নামায সংক্ষিপ্ত হতে পারে। ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং এর প্রতিকারের ব্যবস্থা করা ইমামের বিশেষ দায়িত্ব।

হাজ্জের ইমামের বেলায়ও একই হুকুম যে, হাজীদের সকল সমস্যা ও প্রয়োজনের প্রতি তিনি নজর রাখবেন, তাদেরকে হাজ্জের প্রয়োজনীয় মাসআলা শিক্ষা দানের সুবন্দোবস্ত করবেন। নামাযসহ একই নীতি সেনাপতির বেলায়ও প্রযোজ্য। তার অধীনস্থ সৈনিকদের সুযোগ সুবিধা ও সমস্যার প্রতি তিনি নজর রাখবেন। এক্ষেত্রে একটি বাস্তব দৃষ্টান্তের প্রতি লক্ষ্য করলে বিষয়টা আরো পরিষ্কার হয়ে উঠে। যেমন, উকীল তার মুয়াক্কিলের মাল-সম্পদ, আর ক্রয়-বিক্রয়ের ভারপ্রাপ্ত ওলী (ম্যানেজার) তার মালিকের মালের দেখা-শোনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারক করে থাকে। এই উদ্দেশ্যে তারা সর্বাপেক্ষা কার্যকর ও ফলপ্রসূ পন্থাই অবলম্বন করে থাকে। এমনকি দৈবাৎ নিজের মাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও নিজ স্বার্থ উপেক্ষা করে মুয়াক্কিল ও মালিকের মাল-সামগ্রী ও স্বার্থ রক্ষা করে থাকে।

অধীনস্থের প্রতি কর্তৃত্বশালীর ঐ দায়িত্বের তুলনায় এটাতো আরো গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনী ব্যাপার। ফকীহগণ ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার করেছেন যে, দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দ তথা দেশের শাসকগোষ্ঠী যখন জনগণের দীনের সংশোধন করতে থাকবে, তখন উভয়পক্ষেরই দ্বীন-দুনিয়া রক্ষা পাবে। শাসক-শাসিত, রাজা-প্রজা সকলেই সাফল্যের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে যাবে। অন্যথায় সমস্যা গুরুতর হয়ে দাঁড়াবে এবং নেতাদের পক্ষে শাসন করা কঠিন ও অসম্ভব হয়ে পড়বে। শাসিত, প্রজা তথা জনগণের জন্য মঙ্গল কামনা, আন্তরিকতা, সৎ উদ্দেশ্য পোষণে দুনিয়ার কল্যাণ ও দ্বীনের বিকাশ উভয়টিই হলো এসবের সারকথা। আর ভরসা রাখবে একমাত্র আল্লাহর উপর। কেননা 'ইখলাস' ও 'তাওয়াক্কুল' এমনি দু'টি গুণ, যার উপর শাসিত, শাসক- জনতা, ধনী-দরিদ্র সকলের সাফল্য ও কল্যাণ নির্ভরশীল। তাই হুকুম হয়েছে– আমরা যেন নামাযে পড়তে থাকি : اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ "আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি। একমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য চাই"। এ বাক্য দু'টি সম্পর্কে বলা হয়েছে– সকল আসমানী কিতাবের সার নির্যাস এ দু'টি বাক্যে নিহিত রয়েছে। সুতরাং হুযূর (সা) বলেন– বান্দা যখন : مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ـ

("বিচার দিনের মালিক, আমরা তোমারই ইবাদত করি, একমাত্র তোমারই কাছে সাহায্য চাই") পড়ে, তখন বান্দার কাঁধের উপর স্থাপিত মস্তক কেঁপে ওঠে। কুরআনের বহু স্থানে একই অর্থের আয়াত রয়েছে। যেমন : فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ "একমাত্র তাঁরই ইবাদত কর, তাঁরই উপর ভরসা রাখ।" (সূরা হূদ : ১২৩)

আরো বলা হয়েছে :বলো عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ "আমিতো তাঁরই উপর ভরসা রাখি এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবো।" (সূরা হূদ : ৮৮)

মহানবী (সা) কুরবানীর পশু যবাই করার সময় বলতেন اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَاِلَيْكَ "হে আল্লাহ! এটি তোমারই পক্ষ হতে আমাকে প্রদত্ত এবং একমাত্র তোমারই জন্যে নিবেদিত।"

যেভাবে সরকার ও জনগণ আল্লাহর সাহায্য পায়

তিন জিনিসের মাধ্যমে শাসনকর্তা ও জনগণের প্রতি আল্লাহর সাহায্য অধিক পরিমাণে ধাবিত হয়ে আসে : (১) ইখলাস (নিষ্ঠা) (২) তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর ভরসা) এবং (৩) দু'আ। নামাযের মধ্যে অন্তরের হিফাযত, আর (গুনাহ থেকে) দেহকে বাঁচিয়ে রাখার দ্বারাই এসব গুণাবলী অর্জিত হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ দান খয়রাত, সাদকা, যাকাত, আর্থিক সাহায্য দ্বারা মানুষের উপকার করা, যাকে বলা হয়, 'ইহসান', এটাও আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার একটি মাধ্যম।

তৃতীয়তঃ কারো দ্বারা কোন কষ্ট বা আঘাত পেয়ে থাকলে ধৈর্যধারণ করা। সবরের সাথে কাজ করে যাওয়া। এ জন্যেই বলা হয়েছে : وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ "সবর ও নামাযের দ্বারা আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা কর।" (সূরা বাকারা : ৪৫)

আরো বলা হয়েছে :

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ - اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ - ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذَّاكِرِيْنَ - وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ -

"(বিশেষ করে) দিনের দুই অংশ তথা সকাল সন্ধ্যা এবং রাতের প্রথমাংশে নামায আদায় করো। (অবহেলা করবে না) কেননা, সৎকাজ গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়। যারা আল্লাহকে স্মরণ করে থাকে তাদের জন্য এটা স্মারকস্বরূপ। ইবাদতের কষ্ট সহ্য কর। নিশ্চয় আল্লাহ নেককার লোকদের প্রাপ্য বিনিময় নষ্ট করেন না।"

তিনি আরো বলেন–

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا - (سورة طه : ١٣٠)

"তাদের কথাবার্তা শুনে (বিচলিত না হয়ে) সহ্য করো। আর সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে স্বীয় পালনকর্তার প্রশংসা সহকারে তাসবীহ পাঠ করো, তাঁর স্তুতি কীর্তন করো।" (সূরা তোয়া-হা : ১৩০)

এ সম্পর্কে কুরআনে আরো ইরশাদ হচ্ছে–

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ - فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِيْنَ - (سورة الحجر : ٩٨-٩٧)

"তাদের কথাবার্তার বিষয়াদি আমার উত্তমরূপে জানা। যার ফলে তুমি মনক্ষুণ্ন হও। সুতরাং তুমি তোমার রবের প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করো এবং তাঁর সামনে সিজদারত হয়ে যাও।" (সূরা হিজর : ৯৭-৯৮)

কুরআনের বহু স্থানে নামায ও যাকাতের উল্লেখ এক সাথে করা হয়েছে। বস্তুতঃ

নামায, যাকাত ও সবরের দ্বারা শাসক শাসিত, ধনী-দরিদ্র সমবেতভাবে সকলেরই আত্মশুদ্ধি হাসিল হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তি যখন এ অর্থটা পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়, আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহের মহিমা বুঝতে পারে, বুঝে শুনে নামায পড়ে ও আল্লাহর যিকরে মশগুল হয়ে আল্লাহর দরবারে দু'আর হাত বাড়ায়, পবিত্র কিতাব কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করে, ইখলাস ও তাওয়াক্কুলসহ নামায আদায় করে, যাকাত, সাদকা দ্বারা জনসেবা করে, আর্ত বিপন্নের সাহায্যে এগিয়ে আসে, বিপদগ্রস্ত অভাবী লোকের সাহায্য করে এবং অভাবগ্রস্তের প্রয়োজন পূরণ করে, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তার পথ প্রশস্ত হয়ে যায়। বুখারী, মুসলিমে নবী করীম (সা) থেকে বর্ণিত হয়েছে : كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ "প্রত্যেক সৎকাজ 'সাদকা'র অন্তর্ভুক্ত।"

معروف শব্দের ভিতর সর্বপ্রকার ইহসান বা সৎকাজ শামিল। হাসিমুখে কথা বলা কালিমা তায়্যিবা এবং ভাল কথা বলা– এসবই ইহসানের পর্যায়ভুক্ত। (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আলী ইবনে হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন–

مَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اِلاَّ يُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيس بَيْنَهُ تَعَالٰى وَبَيْنَهُ حَاجِبٌ وَتَرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ اَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرٰى اِلاَّ شَيْئًا قَدَّمَهُ وَيَنْظُرُ اَشْاَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرٰى اِلاَّ شَيْئًا قَدَّمَهُ فَيَنْظُرُ اَمَامَهُ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ - فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَّقِى النَّارَ وَلَوْ بِشِقٍّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ - فَاِنْ لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ -

"তোমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের সাথেই তার রব এমতাবস্থায় কথা বলবেন যে, আল্লাহ এবং তার মাঝখানে কোন দারোয়ান কিংবা কোন দোভাষী উপস্থিত থাকবে না। সে ডান দিকে তাকাবে আর তাই দেখতে পাবে, যা সে পূর্বে পাঠিয়েছে, বাম দিকে তাকাবে তো ঐসব কাজই তার দৃষ্টিগোচর হবে, যা সে পূর্বে পাঠিয়েছে। অতঃপর সম্মুখ পানে লক্ষ্য করবে তো আগুন ছাড়া কিছুই নজরে পড়বে না। কাজেই তোমাদের মধ্য থেকে যদি কেউ খেজুরের একটি টুকরো দান করে হলেও আগুন থেকে বাঁচতে চায়, তবে সে যেন তাই করে। কারো এতটুকু সামর্থ্যও না থাকলে তার উচিত, একটি উত্তম কথা দ্বারা হলেও আগুন থেকে

মুক্তি লাভে তৎপর হওয়া।" সুনানের এক রেওয়ায়েত অনুসারে নবী করীম (সা) বলেছেন–

لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَلَوْ اَنْ تَلْقَى اَخَاكَ وَوَجْهُكَ اِلَيْهِ مُنْبَسِطٌ وَلَوْ اَنْ تَفْرُغَ مِنْ دَلْوِكَ فِيْ اِنَاءِ الْمُسْتَسْقِيْ -

"সৎকাজকে তোমরা তুচ্ছ মনে করো না, যদিও সেটা তোমার ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ আকারে হোক। আর যদিও তুমি স্বীয় পাত্র থেকে এমনি পিপাসার্তের পাত্রে পানি ঢেলে থাকো।"

সুনানে আরো বর্ণিত রয়েছে হুযূর (সা) বলেন–

اَنَّ اَثْقَلَ مَا يُوْضَعُ فِى الْمِيْزَانِ اَلْخُلُقُ الْحُسْنُ -

"মীযানে তথা নেকীবদীর পাল্লায় ওজনকৃত জিনিসের মধ্যে সব চাইতে ভারী বস্তু হবে উত্তম চরিত্র।" একই মর্মে অপর এক হাদীসে নবী করীম (সা) হযরত উম্মে সালামাকে সম্বোধন করে বলেছেন–

يَا اُمَّ سَلَمَةَ ذَهَبَ حُسْنُ الْخُلُقِ بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ -

"হে উম্মে সালমা! দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণ মহত্তম চরিত্রই নিয়ে গেছে।"

অপরের দেয়া কষ্ট ও আঘাত সহ্য করা, ক্রোধ দমন করা, মানুষকে ক্ষমা করে দেয়া, মনের কুপ্রবৃত্তি ও কাম রিপুর বিরোধিতা করা, অন্যায় কার্যকলাপ এবং অহংকার বর্জন করা ইত্যাদি সদগুণাবলী সবরের পর্যায়ভুক্ত। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ বলেন–

وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ اِنَّهُ لَيَئُوْسٌ كَفُوْرٌ - وَلَئِنْ اَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّيْ - اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ - اِلاَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ - اُولٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ. (سورة الهود : ١١-٩)

"আর যদি আমি মানুষকে আমার রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই, অতঃপর তার কাছ থেকে আমি তা ছিনিয়ে নেই, তখন সে নিরাশ, অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে। আর যদি তাকে আমি আপতিত বিপদাপদের পর কোনরূপ সুখের স্বাদ গ্রহণ করাই, তখন সে অবশ্যই বলতে থাকে, আমার সব বিপদ কেটে গেছে। তখন সে

অতিশয় উল্লাস প্রকাশকারী অহংকারী। কিন্তু যারা সবর করে ও সৎকাজ করে (তারা এর ব্যতিক্রম); তাদের জন্য রয়েছে বিশেষ ক্ষমা এবং বৃহৎ প্রতিদান।" (সূরা হুদ : ৯-১১)

অপর এক আয়াতে মহানবী (সা) কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে–

وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ - اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ - وَمَا يُلَقَّاهَا اِلاَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقَّاهَا اِلاَّ ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ - وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ -

"হে নবী! ভাল ও মন্দ সমান নহে। আপনি অন্যায় ও মন্দ প্রবণতা দমনে যা অতি উত্তম আচরণ বা পন্থা, তা দ্বারা সেইপ্রবণতা দূর করো। ফলে আপনি দেখতে পাবেন আপনার সাথে যার শত্রুতা ছিল সে প্রাণের বন্ধুতে পরিণত হয়েছে। এ গুণ কেবল তাদের ভাগ্যেই জুটে থাকে যারা ধৈর্যধারণ করে। আর ভাগ্যবানেরাই কেবল এ মর্যাদা লাভ করতে পারে। অধিকন্তু শয়তানের পক্ষ থেকে আপনি কোনরূপ প্ররোচনা অনুভব করলে, আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করুন। তিনি সবকিছু শুনেন ও জানেন।" (সূরা হা-মীম-সাজদা : ৩৪-৩৬)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন–

وَجَزَاؤُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا - فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِيْنَ.

"মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দই হয়ে থাকে। অতঃপর যারা ক্ষমা করে দেয় এবং সংশোধন করে নেয়, তার বিনিময় ও পুরস্কার আল্লাহরই যিম্মায়। আল্লাহ জালিম লোকদেরকে আদৌ পছন্দ করেন না।" (সূরা শূরা : ৪০)

হাসান বসরী (র) বলেন–

اِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَادِيُ مُنَادٍ مِّنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ اَلاَ لِيَقُمْ مَنْ وَجَبَ اَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ فَلاَ يَقُوْمُ اِلاَّ مَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ -

"কিয়ামতের দিন আরশের নীচ থেকে ফেরেশতাগণ আহ্বান করবেন, ঐ সকল লোক দাঁড়িয়ে থাকুন, যাদের সাওয়াব ও পুরস্কার, আল্লাহর যিম্মায় পাওনা

রয়ে গেছে। তখন একমাত্র ক্ষমাকারী ও সংশোধনকারীই এ ডাকে সাড়া দিয়ে দাঁড়াতে পারবে।"

প্রজা ও জনসাধারণের সাথে সদ্ব্যবহার ও নম্র ব্যবহার করার অর্থ এই নয় যে, তারা যৌক্তিক-অযৌক্তিক যা চাইবে তাই দিতে হবে এবং যে কোন দাবীই তাদের মিটাতে হবে। আর অন্যায় অপরাধ যাই করুক নির্বিচারে ক্ষমা করে তাদের রেহাই দিতে হবে। কেননা এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন–

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ـ

"সত্য যদি কখনো ঐ লোকদের খেয়াল-খুশির পিছনে চলতো, তবে আসমান, যমীন ও তার অধিবাসীদের ব্যবস্থাপনা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতো।" (মুমিনূন : ৭১)

সাহাবীগণকে সম্বোধন করে আল্লাহ বলেন–

وَاعْلَمُوْا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ـ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ ـ

"উত্তমরূপে জেনে রাখ, তোমাদের মাঝে আল্লাহর রাসূল বর্তমান, তিনি যদি বহু সংখ্যক ব্যাপারে তোমাদের কথা মেনে নেন, তবে তোমরা নিজেরাই সাংঘাতিক অসুবিধায় পড়ে যাবে।" (সূরা হুজুরাত : ৭-৮)

'ইহসান' বলা হয় দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের পক্ষে যা কল্যাণকর সে কাজ করা। যদিও তারা সেটা পছন্দ না করুক। জনগণের জন্য এ জিনিসটা উপকারী কিন্তু তারা সেটাকে ভাবে খারাপ। এর উপকারিতা তারা বুঝতে চায় না। এমতাবস্থায় আমীর বা শাসনকর্তার দায়িত্ব হলো নম্র ব্যবহার, মিষ্টি কথা দ্বারা বুঝিয়ে শুনিয়ে তাদেরকে রাজী ও সম্মত করে নেয়া। বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে নবী করীম (সা) বলেছেন–

مَا كَانَ الرِّفْقُ فِىْ شَىْءٍ اِلاَّ زَانَهُ ـ وَلاَ كَانَ الْعُنُفُ فِىْ شَىْءٍ اِلاَّ شَانَهُ ـ (بخارى، مسلم)

"কোন বিষয়ে নম্র ব্যবহার করা হলে প্রতিফলে তা মঙ্গল ও নম্রতাই বহন করে আনে। পক্ষান্তরে, কোন বিষয়ে কঠোর পন্থা অবলম্বন করা হলে, পরিণামে তা অমঙ্গল বয়ে আনে।" অপর এক হাদীসে রাসূল (সা) বলেছেন–

اِنَّ اللّٰهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِىْ عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِىْ عَلَى الْعُنُفِ ـ (بخارى، مسلم)

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ নম্র ও দয়ালু, নম্রতাই তাঁর পছন্দ। দয়ালু ও নম্রচারী ব্যক্তিকে তিনি যা দান করেন, রুক্ষ ও মায়াহীন কঠোর প্রকৃতির লোককে তিনি তা দান করেন না।"

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) বলেন, আমি একেকবার (বায়তুল মাল থেকে) তাদের অংশ পৃথক করে দিয়ে দেবার মনস্থ করি কিন্তু আমার ভয় হয় যে, তারা এটাকে অপছন্দ করে বসে, তাই আমি ধৈর্যধারণ করে যাই। অতঃপর যখনই আমার নিকট সুস্বাদু দুনিয়া জমা (পণ্য) হয়, তৎক্ষণাৎ আমি তাদের হক তাদেরকে আদায় করে দেই। তারা যদি তা পছন্দ না করে, তবে অন্য জিনিসে তাদের শান্ত করতে সচেষ্ট হই।

মহানবীর ও (সা) এমনি অবস্থা ছিল যে, কোন অভাবী তাঁর নিকট উপস্থিত হলে, তিনি তার অভাব মোচন করে দিতেন অথবা মিষ্ট ভাষায় তুষ্ট করে তাকে বিদায় দিতেন। একবার তাঁর আত্মীয়স্বজনগন তাদেরকে ওয়াক্ফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে বলে যে, উহা থেকে যেন তাদের জন্যে কিছু ভাতা নির্ধারিত করে দেয়া হয়। জবাবে তিনি বললেন–

اِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لاٰلِ مُحَمَّدٍ -

"মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের জন্য সাদকা হালাল নয়।" তিনি তাদেরকে সাদকা দান করতে সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি জানান। অবশ্য 'ফাই' তথা যুদ্ধলব্ধ মাল থেকে কিছু দান করে তাদেরকে বিদায় করেন। একবার হামযা (রা) এর কন্যার প্রতিপালনের ব্যাপারে হযরত আলী (রা), হযরত যায়দ (রা) এবং হযরত জাফর (রা) এ তিনজন সমভাবে দাবী জানালেন। প্রত্যেকেই আত্মীয়তার টানে এ দাবী করলেন। নবী করীম (সা) তাঁদের কারো পক্ষে রায় না দিয়ে হামযা (রা)-এর কন্যাটিকে প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে সরাসরি তার খালার হাতে অর্পণ করলেন। কেননা খালা মায়ের স্থলাভিষিক্ত। অতঃপর সকলকেই মিষ্ট ভাষণে তুষ্ট করে খুশী মনে বিদায় দিলেন। হযরত আলী (রা) কে বললেন–

اَنْتَ مِنِّىْ وَاَنَا مِنْكَ "তুমি আর আমি পরস্পর একাত্ম।" জাফর (রা)কে বললেন– اَشْبَهْتَ خَلْقِىْ وَخُلُقِىْ "তোমার মধ্যে আমার চরিত্রগত সাদৃশ্য বিদ্যমান রয়েছে।" আর যায়দ (রা)কে সম্বোধন করে ইরশাদ করলেন, اَنْتَ اَخُوْنَا وَمَوْلنَا "তুমি আমাদের ভাই ও বন্ধু।"

সুতরাং শাসনকর্তা, ক্ষমতাসীন ব্যক্তি এবং বিচারকগণ রাষ্ট্রীয় সম্পদ বণ্টন এবং

অন্যান্য হুকুমের ক্ষেত্রে এমনই হওয়া কর্তব্য। কেননা, শাসনকর্তা ও বিচারকের নিকট জনগণ সকল সময়ই এমন জিনিস প্রার্থনা ও আশা করতে থাকে, যা হয়তো তাদেরকে দান করা সম্ভব বা সমীচীন নয়। যেমন রাষ্ট্রীয় ব্যাপার, প্রশাসনিক ক্ষমতা, ধন-সম্পদ, সম্পদের লাভ এবং হদ্দ বা শরীয়তী শাস্তি হ্রাসের ব্যাপারে মানুষের সুপারিশ রক্ষা করা। অথচ তাদের এ দাবী পূর্ণ করা ক্ষমতার বাইরে। এমতাবস্থায় তাদেরকে অন্যভাবে ভিন্ন জিনিস দান করে খুশী রাখার চেষ্টা করা উচিত অথবা নম্রতা, ভদ্রতা, মিষ্টি ভাষা ও উত্তম ব্যবহার দ্বারা সন্তুষ্ট রাখা চাই। অযথা অবজ্ঞা অবহেলা বা কঠোর আচরণ ঠিক নয়। কেননা আবেদনকারীর প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করলে তার মনে অবশ্যই আঘাত অনুভব হয়ে থাকে। বিশেষতঃ ইসলামের স্বার্থে যাদের মন রক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজন মনে হবে, সে সব লোকের মনে আঘাত দেয়া সঙ্গত নয়। মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَاَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرْ -

"আবেদন বা যাঞ্চনাকারীকে ধমক দিয়ো না।" (সূরা আদ-দুহা : ১০)

কুরআনের অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন–

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا. اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا- وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُوْرًا. (سورة الاسراء : ٢٦-٢٧)

"আর আত্মীয়-স্বজন, গরীব, মুসাফির এঁদের প্রত্যেকের হক আদায় করতে থাক, কিন্তু অযথা ব্যয় করে (সম্পদ) উড়িয়ে দিয়ো না। নিশ্চয়ই অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের অকৃতজ্ঞ। আর যদি ওদের থেকে মুখ ফেরাতেই হয়, যখন তুমি নিজ পরওয়াদিগারের করুণার আশায় থাক, তা হলে এ সকল গরীব অভাবীর সাথে নরম সুরে কথা বলো।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৬-২৮)।

কারো আবেদনের বিপরীত হুকুম দেয়া তার মর্ম বেদনার কারণ বটে। তাই এরূপ ক্ষেত্রে কথা, কাজ এবং আচার-আচরণের দ্বারা দাবীদারকে তুষ্ট রাখাই হলো যথার্থ রাজনৈতিক শাসন ও দূরদর্শিতার পরিচয়। এর দৃষ্টান্ত হলো, চিকিৎসক কর্তৃক রোগীকে তিক্ত ঔষধ দেয়ার পর এর পরিবর্তে তাকে উত্তম বস্তু দান করার

মতো, যা তার পরিপূরক হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ) এবং তাঁর ভাই কে ফেরাউনের নিকট যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বললেন–

فَقُوْلاَ لَهٗ قَوْلاً لَيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ـ

"তার সাথে তোমরা নরম সুরে কথা বলবে, যাতে সে বুঝতে সক্ষম হয় অথবা আমার আযাবের ভয় করে।" (সূরা তোহা : ৪৪)

يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا وَبَشِّرُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا وَتَطَاوَعَا وَلاَ تَخْتَلِفَا ـ

"জনগণের সাথে নম্র ব্যবহার করবে, রূক্ষ ব্যবহার করবে না, তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখবে, অসন্তুষ্টির কারণ ঘটাবে না আর পরস্পর একে অপরের সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করবে, বিভেদ করবে না।"

একবার এক গ্রাম্য মূর্খ লোক মসজিদে প্রস্রাব করে দিল, সাহাবীগণ তাকে ধমকাতে লাগলেন, কিন্তু মহানবী (সা) বললেন–

لاَ تَزْرِمُوْهُ عَلَيْهِ بَوْلَهٗ ـ

"তোমরা এর প্রস্রাব বন্ধ করো না।" অতঃপর তিনি এক বালতি পানি আনিয়ে প্রস্রাবের উপর ঢেলে দিলেন আর সাহাবীগণকে বললেন–

اِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ ـ

"তোমাদেরকে নম্র বানিয়ে পাঠানো হয়েছে, কঠোর ও রূক্ষ করে পাঠানো হয়নি।" (উভয় হাদীস বুখারী-মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত)

এ জাতীয় শাসন মানুষের নিজের জন্য, পরিবারবর্গের জন্য এবং শাসকগোষ্ঠীর প্রজা ও জনগণের রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য প্রয়োজন। কেননা প্রিয় বস্তুর আশ্বাস এবং মৌলিক চাহিদা পূরণের পূর্ব পর্যন্ত মানব প্রকৃতি স্বভাবতঃ সত্য কথা গ্রহণ করার প্রতি আকৃষ্ট হয় না। কাজেই মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহার ও সদাচরণ করাও ইবাদতে ইলাহীর অন্তর্ভুক্ত। আর এসব আচার-আচরণ আল্লাহর ইবাদতে তখন গণ্য হবে, যদি উদ্দেশ্য সৎ হয়। তোমরা কি জান না যে, অন্ন বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি মানব জীবনের মৌলিক চাহিদা ও অত্যাবশ্যকীয় জীবন সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত। এমনকি নিরূপায় মানুষের জন্য (জীবন রক্ষা পরিমাণ) মৃত জীব খাওয়াও জায়েয। বরং ক্ষেত্র বিশেষে ওয়াজিবও বটে। এ ব্যাপারে আলিমগণের ফতোয়াও রয়েছে। কাজেই, উপায়হীন অবস্থায় যদি মুর্দার না খেয়ে কেউ মারা যায় তবে গুনাহগার দোযখবাসী হবে। জীবন রক্ষা ব্যতীত ইবাদত আদায় করা

সম্ভব নয়। আর যে বস্তু ছাড়া ফরয আদায় করা সম্ভব নয়, তা করাও ফরয। এ কারণেই অপরের তুলনায় মানুষের নিজ পরিবার-পরিজন ও স্বীয় প্রাণ রক্ষার্থে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে খাদ্যের যোগাড় অপরিহার্য। তাই সুনানে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : تَصَدَّقُوْا "তোমরা সাদকা দান কর।" এক ব্যক্তি আরয করলো ঃ হে রাসূলুল্লাহ (সা)! আমার নিকট একটি মাত্র দীনার রয়েছে। উত্তরে নবী করীম (সা) বললেন– تَصَدَّقْ عَلٰى نَفْسِكَ ـ

"নিজের জানের উপর সাদকা কর। সে বলল ঃ আমার নিকট আরো একটি দীনার রয়েছে।" হুযূর (সা) বললেন– تَصَدَّقْ بِهٖ عَلٰى زَوْجَتِكَ ـ

"এটা তোমার স্ত্রীর প্রয়োজনে ব্যয় কর।" লোকটি বললো : আমার নিকট তৃতীয় আরো একটি দীনার বর্তমান আছে। "হুযূর (সা) বললেন–

تَصَدَّقْ بِهٖ عَلٰى وَلَدِكَ ـ

"তোমার সন্তানের প্রয়োজনে তা ব্যয় কর।" সে বললো : আমার নিকট চতুর্থ একটি দীনারও রয়েছে। তিনি বললেন– تَصَدَّقْ بِهٖ عَلٰى خَادِمِكَ ـ

"এটা তোমার খাদিমের পিছনে খরচ কর। লোকটি বললো : আমার নিকট সঞ্চয় আরো একটি দীনার বর্তমান রয়েছে।" নবী করীম (সা) জবাবে বললেন – اَنْتَ اَبْصَرُ بِهٖ "এটা কোথায় ব্যয় করতে হবে তা তুমিই ভাল জান।" সহীহ মুসলিমে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা) বলেছেন–

دِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ فِيْ رَقَبَةٍ وَدِيْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهٖ عَلٰى مِسْكِيْنٍ وَدِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ عَلٰى اَهْلِكَ ـ اَعْظَمُهَا اَجْرًا الَّذِيْ اَنْفَقْتَهُ عَلٰى اَهْلِكَ ـ (رواه مسلم)

"আল্লাহর রাস্তায় তুমি একটি দীনার ব্যয় করলে, এক দীনার তুমি গোলাম আযাদ করার ব্যাপারে খরচ করলে, এক দীনার তুমি দরিদ্রকে দান করলে, আর এক দীনার তুমি পরিবার-পরিজনদের প্রয়োজনে ব্যয় করলে, এর মধ্যে পরিবার-পরিজনদের প্রয়োজনে যেটি খরচ করলে, সাওয়াবের দিক থেকে সেটিই হবে অধিক।" (মুসলিম)

আবূ উমামা (রা) থেকে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন–

اِبْنَ اٰدَمَ اِنَّكَ تَبْذِلُ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَّكَ وَاِنْ تُمْسِكْ شَرٌّ لَّكَ وَلاَ تُلاَمُ

عَلٰى كَفَافٍ - وَابْدَا بِمَنْ تَعُوْلُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى - (مسلم)

"হে বনী আদম! ধরে রাখার চাইতে অতিরিক্তি মাল খরচ করে দেয়াই তোমার জন্য মঙ্গলজনক। আর প্রয়োজন মত ব্যয় করা নিন্দনীয় নয়। যাদের ভরণ-পোষণের ভার তোমার উপর ন্যস্ত, প্রথমে তাদের জন্য খরচ কর। বস্তুতঃ উপরের হাত (দাতা) নীচের হাতের (গ্রহীতার) চেয়ে উত্তম।" (মুসলিম)

অধিকন্তু কুরআনের আয়াত রয়েছে যে,

وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ - قُلِ الْعَفْوَ -

"তারা তোমাকে প্রশ্ন করে যে, খরচ কি পরিমাণ করবে? তুমি তাদের বলে দাও, প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা তাই।" এর মর্মার্থও একই।

عَفْوٌ অর্থ অতিরিক্ত মাল। কেননা আপন সত্তা ও নিজ পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ করা ফরযে আইন। পক্ষান্তরে, 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' (আল্লাহর পথে জিহাদ) ইসলামী যুদ্ধে ব্যয় করা এবং গরীবদের দান করা 'ফরযে কেফায়া' অথবা মুস্তাহাব। অবশ্য সময় ও ক্ষেত্র বিশেষে 'ফরযে আইন'ও হয়ে দাঁড়ায়। তা তখনই হবে যদি অন্য কোন দানকারী বর্তমান না থাকে। কেননা ক্ষুধার্তকে অন্নদান করা 'ফরযে আইন'। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

لَوْ صَدَقَ السَّائِلُ لَمَا اَفْلَحَ مَنْ رَدَّهُ -

"যাঞ্ছাকারী যদি সত্যবাদী হয় তবে তাকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেয়াতে কোন কল্যাণ নেই।"

আবূ হাতেম অবূস্তী (র) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে এক বিস্তারিত ও দীর্ঘ রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, যাতে অনেক জ্ঞানগর্ভ বিষয় রয়েছে। "আলে দাউদ (আ)" এর প্রজ্ঞাময় একটি কথা এই যে, জ্ঞানী ও বিজ্ঞজনদের একটা কর্তব্য এটাও যে, তারা নিজেদের সময়কে চার ভাগে ভাগ করে নেবে। এক অংশে আল্লাহর দরবারে মুনাজাত, দু'আ ও যিকরে অতিবাহিত করবে, দ্বিতীয় অংশ নিজের আত্মসমালোচনায় কাটাবে, তৃতীয় অংশ বন্ধু-বান্ধবের সান্নিধ্যে ব্যয় করবে, যেন তারা তার দোষত্রুটি নির্দেশ করতে পারে, আর সময়ের চতুর্থ ভাগে নিজ প্রিয় বস্তু উপভোগের স্বাদ গ্রহণ করবে। কেননা এ অংশটি দ্বারা অপর অংশত্রয়ের সহায়তা লাভ হয়।

আলোচ্য রেওয়ায়েতের আলোকে প্রতিভাত হয়ে উঠে যে, শরীয়ত সিদ্ধ ও জায়েয চিত্ত বিনোদনে সময়ের একটা অংশ ব্যয় করা জরুরী। এর দ্বারা অন্যান্য মুহূর্তগুলোর শক্তিবৃদ্ধি ঘটে থাকে। এরি পরিপ্রেক্ষিতে ফুকাহা বা ইসলামী চিন্তাবিদগণ বলেছেন : মনমানসিকতার সংশোধন ও কল্যাণ সাধনই ন্যায়পরায়ণতা। এরি জন্য আবু দারদা (রা) বলতেন : কোন কোন সময় বাতিলের দ্বারাও আমি চিত্ত বিনোদন করে থাকি, যেন সত্য ও ন্যায়ের পথে তা আমার সাহায্য প্রাপ্তি ঘটে। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রিয় এবং উপভোগ্য বস্তু এ জন্যে সৃষ্টি করেছেন, যেন এ দ্বারা সৃষ্টির উপকার হয়। যেমন ক্রোধকে এজন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে যে, এ দ্বারা ক্ষতিকর জিনিস থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হয়। আর কুপ্রবৃত্তি ও ভোগ বাসনা সেটাই হারাম করা হয়েছে, যা মানব জীবনে ক্ষতিকর। কিন্তু যে ভোগ বিলাস সত্যের উপর চলার সহায়ক হয় সেটা আমলে সালেহ বা সৎকাজের মধ্যে গণ্য। এ কারণেই সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন– وَفِىْ بُضْعِ اَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ـ

"তোমাদের স্ত্রী সম্ভোগও সাদকাস্বরূপ। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন : হে আল্লাহর রাসূল (সা)! নিজেদের কামনা চরিতার্থ করাতেও কি সাওয়াব?" উত্তরে হুযূর (সা) বললেন–

اَرَاَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِىْ حَرَامٍ اَمَا كَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟

"তোমরা কি মনে কর, তা যদি হারাম পথে ব্যয় করা হতো তাতে কি গুনাহ হতো না?" সাহাবীগণ বললেন : কেন হবে না? অবশ্যই হবে। তিনি বললেন–

فَلِمْ تَحْسَبُوْنَ بِالْحَرَامِ وَلاَ تَحْسَبُوْنَ بِالْحَلاَلِ؟

"তাহলে তোমরা হারামের তো হিসাব লাগাও কিন্তু হালালের হিসাব করবে না।"

সাঈদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) এর রেওয়ায়েত সূত্রে সহীহাইনে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) তাঁকে বলেছেন–

اِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِىْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلاَّ ازْدَدْتَّ بِهَا دَرَجَةً وَرِفْعَةً حَتّٰى لِلُّقْمَةَ تَضَعُهَا فِىْ فَمِ امْرَاَتِكَ ـ (بخارى، مسلم)

"আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তুমি যা কিছু খরচ কর তাতে অবশ্যই মানমর্যাদা বৃদ্ধি পায়, এমনকি আপন স্ত্রীর মুখে তুমি যে লোকমা বা গ্রাস তুলে দাও এদ্বারাও তোমার সাওয়াব হাসিল হয়।" (বুখারী, মুসলিম)

এ সম্পর্কে বহু হাদীস রয়েছে। বস্তুতঃ মুমিন বান্দা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে যদি কার্য সম্পাদন করে তবে প্রতি মুহূর্তে বিপুল সাওয়াবের অধিকারী হতে পারে।

উপরন্তু জায়েয ও শরীয়ত সিদ্ধ সৎকাজের দ্বারা নিজেদের আত্মা ও রূহের সংশোধন করে কলুষমুক্ত করে গড়ে তুলতে পারে। পক্ষান্তরে মুনাফিকের কলুষিত মনের দুষ্ট প্রভাবে তার উদ্দেশ্যও কলঙ্কময় হয়ে পড়ে। অসৎ কর্মকাণ্ডের ফলেই মুনাফিক ব্যক্তির শাস্তি হয়ে থাকে। তার ইবাদত লৌকিকতায় পরিপূর্ণ হয়ে পড়ে। যার ফলে উপকারের স্থানে সেগুলো তার পক্ষে ক্ষতির হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা) বলেছেন–

اَلاَ اِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا.صَلُحَتْ صَلُحَ لَهَا سَائِرُ الْجَسَدِ
وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ لَهَا سَائِرُ الْجَسَدِ اَلاَ وَهِىَ الْقَلْبُ - (صحيح)

"তোমরা সতর্কতার সাথে জেনে রাখো, দেহের ভিতরে এমন এক খণ্ড মাংসপিণ্ড রয়েছে, যদি সেটা সুস্থ থাকে, তবে গোটা দেহ সুস্থ থাকে। পক্ষান্তরে সেটা যদি অসুস্থ ও মন্দ হয়, তবে সারা শরীর অসুস্থ ও দূষিত হয়ে যায়। জেনে রাখ, সেটা হল মানুষের কলব বা অন্তর।"

[বিশ]

ফরয-ওয়াজিবের উপর আমল ও হারাম থেকে রক্ষার জন্যেই শাস্তি

ফরয-ওয়াজিবের উপর আমল করার এবং হারাম বিষয় থেকে রক্ষার জন্যই শাস্তি দণ্ড নির্ধারিত করা হয়েছে। কাজেই এমন আকর্ষণীয় জিনিস তুলে ধরা চাই যা জনগণকে কল্যাণ ও আনুগত্যের দিকে উৎসাহিত করে। অপরদিকে মন্দের প্রতি উৎসাহ দানকারী বিষয় বস্তু থেকে জনগণকে বিরত রাখা প্রয়োজন।

হারাম থেকে বেঁচে থাকা এবং ওয়াজিবের উপর আমল করার জন্যই শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যের সহায়ক প্রতিটি বস্তুই শরীয়তসম্মত করা হয়েছে। সুতরাং এমন পন্থা অবলম্বন করা উচিত, যদ্বারা কল্যাণকর পথ ও আনুগত্যের প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি পায় এবং এর সহায়ক ও সাহায্যকারী বলে প্রমাণিত হয়। জনগণকে কল্যাণ ও আনুগত্যের দিকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে সম্ভাব্য সকল পন্থা অবলম্বন করাই বাঞ্ছনীয়। যথা, স্বীয় সন্তান ও পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করা আর রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা ও শাসনকর্তার পক্ষে জনগণের জন্য ব্যয় করা প্রয়োজন। কিন্তু তা এমন ধারায় ব্যয় করা চাই যাতে তাদের চেতনাবোধ উৎসাহিত ও উজ্জীবিত হয়। টাকা পয়সা ধন-সম্পদ কিংবা প্রশংসা দ্বারাই হোক অথবা বিকল্প কোন পন্থায় হোক। এ কারণেই উট-ঘোড়ার দৌড় প্রতিযোগিতা, তীর-বর্শা চালানো ইত্যাদিতে শক্তি ব্যয় ও শরীর অনুশীলন করাকে শরীয়তসম্মত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মহানবী (সা) নিজে এবং খোলাফায়ে রাশেদীন ঘোড় দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতেন। এমনকি বায়তুল মালের ঘোড়া পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় আনা হতো। মুয়াল্লাফাতুল কুলূবের অবস্থায়ও অনুরূপ যে, তাদের সাথেও নম্র ব্যবহার ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করা উচিত। এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে ঃ এক ব্যক্তি পার্থিব লাভের উদ্দেশ্যেই সকালবেলা ইসলাম গ্রহণ করে কিন্তু সন্ধ্যাবেলা সে এমন নিষ্ঠাবান ও খাঁটি মুসলমানে রূপান্তরিত হয়ে পড়ে যে, দুনিয়ার সকল বস্তু, সকল মানুষের তুলনায় একমাত্র ইসলাম তার প্রাণপ্রিয় বস্তুতে পরিণত হয়।

দুষ্কর্ম ও গুনাহর বেলায়ও অবস্থা একই। কাজেই সমাজে পাপ অপরাধ প্রবণতা ও অন্যায়ের শিকড় নির্মূল করে ফেলা রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের উচিত। অন্যায় অপরাধের

সকল রাস্তা, যাবতীয় ছিদ্র বন্ধ করে দেয়া একান্ত কর্তব্য। গুনাহ্ পাপের পথে উৎসাহ দানকারী সকল কার্যকলাপ পূর্ণ শক্তিতে রোধ করার সংগ্রাম চালু রাখা ততক্ষণ পর্যন্ত জরুরী যতক্ষণ না এর বিপরীত নিশ্চুপ বসে থাকা ও নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণের বৈধ ও যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ পরিলক্ষিত হয়। মহানবী (সা) এর বাণী থেকেই এর দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়। তিনি বলেছেন–

لاَ يَخْلُوَنَّ الرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ فَاِنَّ ثَالِثَهَا الشَّيْطٰنُ -

"কোন পর পুরুষ কোনো পর স্ত্রীলোকের সাথে নির্জন সান্নিধ্যে একত্রিত হবে না। কেননা শয়তান তাদের সঙ্গী হিসেবে তৃতীয় জন হয়ে যায়।"

তিনি আরো বলেন,

لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُسَافِرَ مَسِيْرَةَ يَوْمَيْنِ اِلاَّ مَعَهَا زَوْجٌ اَوْ ذُوْ حَرَمٍ -

"যে নারী আল্লাহ্ এবং আখিরাতের উপর বিশ্বাস রাখে, স্বামী কিংবা মাহ্‌রাম (যার সঙ্গে বিবাহ জায়েয নেই) ব্যতীত তার পক্ষে দু'দিনের দূরবর্তী স্থানে সফর করা জায়েয নেই।"

নবী করীম (সা) পরনারীর সাথে সাক্ষাৎ করা এবং তার সাথে একাকী সফর করা থেকে এ কারণেই নিষেধ করেছেন যেন, (সমাজ থেকে) অন্যায়, অপরাধ ও পাপাচারের মূলোৎপাটিত হয়ে যায়।

ইমাম শা'বী থেকে বর্ণিত আছে– 'আবদুল কায়স' গোত্রীয় প্রতিনিধি দল হুযূর (সা) এর দরবারে উপস্থিত হয়। একটি সুশ্রী সুদর্শন যুবকও তাদের দলে শামিল ছিল। তাকে দেখার পর তিনি যুবকটিকে তাঁর পেছনে বসার হুকুম দিলেন এবং বললেন : এ দৃষ্টিই ছিল হযরত দাউদ (আ) এর ভুলের কারণ।

ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) একবার জনৈকা মহিলার কবিতা আবৃত্তি শুনলেন, যার একটি শ্লোক ছিল–

هَلْ مِنْ سَبِيْلٍ اِلٰى خَمْرٍ فَاَشْرَبَهَا - هَلْ مِنْ سَبِيْلٍ اِلٰى نَصْرِ بْنِ حَجَّاجٍ ؟

"পান করার মত সুরা লাভের কোন উপায় কি আছে গো...? নসর ইবনে হাজ্জাজের সাক্ষাৎ লাভের কোন উপায় কি আমার হবে গো...?"

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) নসর ইবনে হাজ্জাজকে তৎক্ষণাৎ ডেকে পাঠালেন– সে একজন সুন্দর সুঠাম, অমলকান্তি যুবাপুরুষ। হযরত ওমর (রা) তার মাথা মুণ্ডন করেছিলেন। কিন্তু এতে তার চেহারায় উজ্জ্বল ও কমনীয়তা আরো বেড়ে গেল। অবশেষে তিনি তাকে দেশ ত্যাগের হুকুম দিলেন, যেন মদীনার রমণীকুল ফিতনায় পতিত না হয়।

অন্যত্র হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, কোন এক লোক সম্পর্কে তিনি জানতে পারলেন যে, তার সান্নিধ্যে বালকেরা উঠাবসা করে থাকে। ছেলেদেরকে তিনি তার নিকট বসতে এবং যাতায়াত করতে নিষেধ করে দিলেন।

হযরত ওমর (রা) এমন লোকের সান্নিধ্য ও সংসর্গে গমনকরতে নিষেধ করতেন যার ফলে নারী-পুরুষের ফিতনায় পতিত হওয়ার আশংকা হতো কিংবা এর কারণ ঘটত। এমন সব বালকের অভিভাবকের কর্তব্য হলো, বিনা দরকারে তাদেরকে বাইরে যেতে না দেয়া, সেজে গুজে থাকতে ও সুগন্ধি লাগাতে নিষেধ করা, সাধারণ গোসল খানায় যেতে না দেয়া, একান্ত যদি যেতেই হয়, তবে শরীরের কাপড় যেন না খোলে এবং গান বাদ্যের আসরে শরীক হওয়া থেকে তাদের বিরত রাখে। এসব ব্যাপারে তাদেরকে কঠোর শাসন ও তদারকীতে রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

এভাবে যে ব্যক্তি সম্পর্কে প্রকাশ্য অভিযোগ পাওয়া যায় যে, সে আকাম কুকাম ও পাপাচারে অগ্রণী, তাকে সুন্দর সুশ্রী গোলামের অধিকারী বা মালিক হতে বিরত রাখতে হবে আর এ ধরনের গোলাম থেকে তাকে পৃথক করে দিতে হবে। কেননা, ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, প্রসিদ্ধ ও প্রকাশ্য পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। আর তার সাক্ষ্য সম্পর্কে প্রতিপক্ষের প্রতিবাদ করার বৈধ অধিকার রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সম্মুখ দিয়ে এক ব্যক্তির জানাযা গমন করলে উপস্থিত লোকেরা তার প্রশংসা বাক্য উচ্চারণ করলো। তিনি বললেন ঃ وَجَبَتْ "ওয়াজিব হয়ে গেছে।" অতঃপর অপর একটি জানাযায় গমন করলে লোকেরা মন্তব্য করল– "এ ছিল অতিশয় মন্দ লোক।" তিনি বললেন ঃ وَجَبَتْ "ওয়াজিব হয়ে গেছে।" সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে রাসূলুল্লাহ। উভয়ের সম্পর্কে আপনি বললেন– وَجَبَتْ - এর কারণ কি এবং কি জিনিস ওয়াজিব হলো। তিনি ইরশাদ করলেন–

هٰذِهِ الْجَنَازَةُ اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهَا خَيْرًا فَقُلْتُ وَجَبَتْ لَهَا الْجَنَّةُ ـ وَهٰذِهِ الْجَنَازَةُ اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهَا شَرًّا وَجَبَتْ لَهَا النَّارُ ـ اَنْتُمْ شُهَدَاءُ لِلّٰهِ فِي الْاَرْضِ ـ

"প্রথম জানাযাটির তোমরা প্রশংসা করেছ, তাই আমি বলেছি তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় জানাযাটি সম্পর্কে তোমরা নিন্দাবাদ করেছ, কাজেই আমি বলেছি তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে। কেননা যমীনের বুকে তোমরা আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ।"

নবী করীম (সা) এর যমানায় জনৈকা দূরাচারী নারী প্রকাশ্যে পাপাচার করে বেড়াতো, তার সম্পর্কে তিনি বলতেন–

لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا اَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هٰذِهِ ـ

"সাক্ষী ছাড়াই কাউকে যদি আমি 'রজম' (প্রস্তরাঘাতে হত্যা) করতাম, তবে এ নারীটিকে আমি অবশ্যই রজম করতাম।" এর কারণ হলো, শরীয়তে সাক্ষী কিংবা স্বীকারোক্তি ব্যতীত 'হদ' কায়েম করার বিধান নাই। কিন্তু এমন চরিত্রের লোকের সাক্ষী ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে চাক্ষুষ দর্শনের কোন প্রয়োজন নাই বরং এর জন্য সাধারণ জনশ্রুতিই যথেষ্ট। আর জনশ্রুতি যদি অপেক্ষাকৃত কম হয় তবে, তার সঙ্গী-সাথী ও বন্ধু-বান্ধবের প্রতি লক্ষ্য করে প্রমাণ দাঁড় করাতে হবে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন–

اِعْتَبِرُوا النَّاسَ بِاَخْدَانِهِمْ ـ

"মানুষকে তার বন্ধু গুণে বিচার কর।"

অর্থাৎ দেখতে হবে যেই চরিত্রের লোকদের সাথে তার মেলামেশা উঠা-বসা, সে চরিত্র মানেই তার মূল্যায়ন করতে হবে। কোন্ চরিত্রের লোকেরা তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু? মন্দা চরিত্রের হলে এ থেকে বেঁচে থাকা প্রয়োজন, যেমন শত্রু থেকে আত্মরক্ষা করা দরকার। এ প্রসঙ্গে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন–

اِحْتَرِسُوا النَّاسَ بِسُوْءِ الظَّنِّ ـ

"মানুষের কু-ধারণা থেকে তোমরা বেঁচে থাক।"

এটা হযরত উমর (রা)-এর নির্দেশ। তবে কু-ধারণার ভিত্তিতে কোন প্রকার সাজা দণ্ড প্রদান জায়েয নেই।

অশ্লীলতা, হত্যাকাণ্ড, নিকটাত্মীয়, দুর্বল, পর সম্পদ জবর দখল থেকে দূরে থাকা

এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হলো, হদ ও অধিকার, বিনা কারণে কাউকে হত্যা করা, কিয়ামতের দিন সর্বাগ্রে অন্যায় হত্যার বিচার হবে, 'কিসাস' বা হত্যার প্রতিশোধ নেয়াতে নব জীবনের অবকাশ বিদ্যমান রয়েছে। অধিকন্তু কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির হত্যার কিংবা অধিকারের বিনিময়ে কারো প্রাণদণ্ড বিধান করা ইত্যাদি।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী হলো–

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلاَّ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا - وَلاَ تَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ مِّنْ اِمْلاَقٍ - نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ - وَلاَ تَقْرَبُو الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ - وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ ط ذَالِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ - وَلاَ تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلاَّ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهُ - وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ - لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا - ذَالِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ - وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ - ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ - (سورة الانعام : ١٥٣-١٥١)

"মানুষকে আপনি বলুন, তোমরা এদিকে আসো। আমি তোমাদেরকে সে জিনিস পড়ে শুনাই যা তোমাদের পরওয়ারদিগার তোমাদের উপর হারাম করেছেন। তাহলো এই যে, তাঁর সাথে কোন কিছুকেই শরীক করবে না, মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, দারিদ্র্যের ভয়ে নিজেদের সন্তান হত্যা করো না, (কেননা) আমিই তোমাদের আহার যোগাই এবং তাদেরও, আর গোপন কিংবা প্রকাশ্য

নির্লজ্জ কার্যকলাপের ধারে কাছেও যাবে না। আল্লাহ্ যাকে হারাম করেছেন এমন প্রাণ সংহার করবে না, অবশ্য ন্যায় পন্থায় (রাষ্ট্রীয় বিচার পদ্ধতিতে) হলে সেটা স্বতন্ত্র কথা। এ হলো সেসব কথা যা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন, যেন তোমরা উপলব্ধি করতে পার। অধিকন্তু ইয়াতীমের মালের নিকটেও তোমরা যাবে না। তবে হাঁ কল্যাণকর পন্থায় (যেতে পার), যতদিন না সে যৌবনে পদার্পণ করে আর ন্যায়-ইনসাফের ভিত্তিতে তোমরা সঠিক ও পরিপূর্ণরূপে ওজন করবে এবং মাপ দেবে, সাধ্যের বাইরে আমি কারো ওপর (দায়িত্বের বোঝা) অর্পণ করি না। যখন তোমরা কথা বল, তখন ন্যায় কথা বলবে, যদিও নিকটাত্মীয়ই হোক এবং আল্লাহর সঙ্গে কৃত ওয়াদা অঙ্গিকার পূর্ণ কর। এ হলো সেসব বিষয় আল্লাহ্ তা'আলা যেগুলোর হুকুম দিয়েছেন, যেন তোমরা এসব থেকে উপদেশ গ্রহণ কর। বস্তুতঃ এটাই হলো আমার সরল-সোজা পথ। কাজেই তোমরা এরি অনুসরণ কর, অন্যায় পথসমূহের অনুসরণ করবে না। অন্যথায় (এ অনুসরণ) তাঁর রাস্তা থেকে তোমাদেরকে ভিন্ন দিকে নিয়ে যাবে। এ হলো সেকথা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে যার নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা মুত্তাকী হয়ে যাও।" (সূরা আন'আম : ১৫১ - ১৫৩)

মহান আল্লাহ্ আরো ইরশাদ করেন–

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلاَّ خَطَأً..... اِلٰى قَوْلِهٖ ـ وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ـ (سورة النساء : ٩٣-٩٢)

"কোন মুসলমান অপর কোন মুসলমানকে হত্যা করা জায়েয নয়, কিন্তু তবে ভুলবশতঃ হলে সেটা স্বতন্ত্র। ..... আর যে ব্যক্তি জ্ঞাতসারে কোন মুসলানকে হত্যা করবে, তার প্রতিফল হল জাহান্নাম। যেখানে সে অনাদি-অনন্তকাল বাস করবে, আল্লাহ্ তা'আলার গযব এবং অভিশাপ তার উপর পতিত হবে। তদুপরি আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য বড় কঠিন আযাব তৈরী করে রেখেছেন।" (সূরা নিসা : ৯২-৯৩)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন :

مِنْ اَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ـ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ـ (سورة المائده : ٣٢)

"এ কারণেই বনী ইসরাঈলকে আমি এ মর্মে নির্দেশ দিয়েছি, যে ব্যক্তি খুনের বদলে কিংবা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির শাস্তিস্বরূপ নয়, বরং অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে, সে যেন গোটা মানবগোষ্ঠীকে হত্যা করলো। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কারো জীবন রক্ষা করলো, বস্তুতঃ সে যেন গোটা মানব জাতির জীবন বাঁচিয়ে দিল।" (সূরা মায়েদা :৩২)

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে, মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন–

اَوَّلُ مَا قَضٰى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِى الدِّمَاءِ ـ (بخارى ـ مسلم)

"কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম অন্যায় হত্যার বিচার করা হবে।" প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য হত্যা তিন প্রকার–

(১) **কতলে আমাদ (ইচ্ছাকৃত হত্যা)**; যাতে ভুল-ভ্রান্তি কিংবা ভুল সাদৃশ্য হওয়ার সম্ভাবনার কোন অবকাশ নেই। যার ব্যাখ্যা হলো, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, সাধারণতঃ যেভাবে হত্যা করা হয়ে থাকে যেমন তরবারী, খঞ্জর, ছুরি, হাতুড়ি, বেলচা, কোদাল, কুড়াল, ঢাল ইত্যাদির আঘাতে কিংবা গুলি ছুড়ে কাউকে হত্যা করা, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে কিংবা পানিতে ডুবিয়ে মারা অথবা কোনও উঁচু স্থান হতে নীচে ফেলে হত্যা করা, গলাটিপে, অণ্ডকোষে তীব্র চাপ সৃষ্টি করে অথবা মুখচেপে হত্যা করা কিংবা বিষপ্রয়োগে কারো প্রাণ হরণ করা। সুতরাং এ জাতীয় খুনের বদলে হদ জারী করতে হবে অর্থাৎ, হত্যাকারীর প্রাণ সংহার করতে হবে। কিন্তু নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ এ ক্ষেত্রে তিনটির যে কোন এক পন্থা অবলম্বনের পূর্ণ অধিকার পাবে– (১) চাই তাকে হত্যা করুক কিংবা (২) ক্ষমা করে দিক, অথবা (৩) দিয়্যাত তথা রক্তমূল্য গ্রহণ করতঃ ছেড়ে দিক। কিন্তু নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণের পক্ষে হত্যাকারী ব্যতিরেকে অপর কাউকে হত্যা করা জায়েয নয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী–

وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ ـ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِفْ فِى الْقَتْلِ ـ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا ـ (سورة بنى اسرائيل : ٣٣)

"আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন বৈধ কারণ ব্যতীত তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করো না। আর যে ব্যক্তি মজলুম ও অন্যায় পথে নিহত হয়, আমি তার ওয়ারিশকে অধিকার দিয়েছি। কাজেই (প্রতিশোধমূলক) হত্যার বেলায় সে যেন

অন্যায় বাড়াবাড়ি না করে। কেননা (প্রাপ্য প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে) তারই জিত, সে-ই সাহায্য প্রাপ্ত।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৩)

অত্র আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে, কেবল মাত্র হত্যাকারী। ভিন্ন ধরনের কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দান বৈধ নয়। হযরত আবূ শূরায়হ আল খূযাঈ (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন–

مَنْ أُصِيْبَ بِدَمٍ اَوْ خَبْلٍ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ اِحْدٰى ثَلَاثٍ فَاِنْ اَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوْا عَلٰى يَدَيْهِ اَنْ يَّقْتُلَ اَوْ يَعْفُوَ اَوْ يَاْخُذَ الدِّيَّةَ فَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِّنْ ذَالِكَ فَعَادَ فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا ـ

(اهل السنن وقال الترمذى حديث حسن صحيح)

"যদি কোন ব্যক্তি খুন হয় অথবা আশংকাজনক অবস্থায় তাকে পাওয়া যায় এবং পরে সে মারা যায়, এমতাবস্থায় উপায় মাত্র তিনটি, (১) হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড দান, (২) তাকে ক্ষমা করে দেয়া, (৩) রক্তমূল্য গ্রহণ করতঃ তাকে ছেড়ে দেয়া। এ তিন পন্থা ছাড়া কেউ যদি চতুর্থ কোন পথ অবলম্বন করে, তবে তার এহেন কাজ অত্যাচারের শামিল, তাই তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম, যেখানে সে চিরকাল বাস করবে।" (আহলে সুনান তিরমিযী)

ক্ষমা করা অথবা রক্তমূল্য গ্রহণ করার পর হত্যাকারীকে হত্যা দণ্ড দান অতি কঠিন গুনাহ। এমনকি প্রথম কতল করার চাইতেও জঘন্যতম অপরাধ। এ পর্যায়ে কোন কোন আলিম এও বলেছেন যে, 'হদে'র বিধান অনুসারে তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। কেননা নিহিত ব্যক্তির ওয়ারিশগণের কোন অধিকার নাই রক্ত মূল্য গ্রহণ করার পর তাকে হত্যা করার।"

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী হচ্ছে–

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ـ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ـ ذَالِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَّاُوْلِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ـ (سورة البقرة : ١٧٩-١٧٨)

"তোমাদের মধ্য হতে নিহত ব্যক্তির প্রাণের বদলে প্রাণদণ্ডের এমন বিধান দেয়া হয়েছে যে, আযাদ ব্যক্তির পরিবর্তে আযাদ, গোলামের বদলে গোলাম আর নারীর বদলে নারীর। অতঃপর নিহতের ভাইয়ের পক্ষ থেকে সে ব্যক্তির কেসাসের কোন অংশ ক্ষমা করে দেয়া হলে, শরীয়তের বিধান মোতাবেক তার নিকট ভদ্রভাবে তাগাদা করা চাই। অপরপক্ষে হত্যাকারী কর্তৃক নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদের সাথে উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে তা সঠিকভাবে আদায় করে দেয়া উচিত। এটা তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ হতে তোমাদের জন্য অতি সহজ পন্থা এবং বিশেষ দয়াস্বরূপ, এরপরও যদি কেউ সীমা অতিক্রম করে, তার জন্য রয়েছে ভীষণ কষ্টদায়ক আযাবের ব্যবস্থা। আর হে জ্ঞানীজন! কেসাসের মধ্যে রয়েছে "তোমাদের জীবনের নিরাপত্তা", যেন তোমরা (হত্যাকাণ্ড) থেকে বেঁচে থাক।" (সূরা বাকারা ঃ ১৭৮ - ১৭৯)

এর বিশ্লেষণে আলিমগণ বলেন, নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদের অন্তর থাকে ক্রোধ ও প্রতিশোধ স্পৃহায় পরিপূর্ণ। সম্ভব হলে তারা হত্যাকারী ও তার ওয়ারিশদের পর্যন্ত নিধন করতে উদ্যত-উন্মত্ত হয়ে যায়। কাজেই কোন কোন সময় অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, তারা কেবল হত্যাকারীকে খুন করেই নিবৃত্ত থাকে না, বরং ঘাতকের সাথে সাথে তার আত্মীয়-স্বজন এমনকি গোত্রপতি সর্দারদের পর্যন্ত হত্যা করে বসে। এটা অত্যন্ত ভয়াবহ অবস্থা। কেননা হত্যাকারী প্রথম জুলুম করেছিল বটে কিন্তু নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ খুনের বদলা নিতে গিয়ে এমন সব মাত্রাহীন জুলুম অত্যাচার করে বসে, যা প্রকৃত হত্যাকারীও করে নাই। অধিকন্তু তারা এমন সব কর্মকাণ্ড করে বসে, যা কিনা শরীয়ত বহির্ভূত এবং জাহেলী যুগে পল্লীবাসী কি নগরবাসী সকলেই সমবেতভাবে সে কার্জে শরীক হয়ে পড়তো, আর বংশানুক্রমে তা চলতে থাকতো। নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ হত্যাকারীর ওয়ারিশদিগকে হত্যা করার চেষ্টায় সর্বশক্তি নিয়োগ করতো। এদেরকে আবার বিপক্ষ দল হত্যা করে চলতো। এক পর্যায়ে উভয়পক্ষ নিজ নিজ মিত্র সংগ্রহ করতঃ দলবদ্ধ হয়ে মারামারি কাটাকাটি ও হানাহানির এক প্রাণান্তকর পরিবেশে স্থায়ী যুদ্ধে লিপ্ত হতো ও দীর্ঘকাল রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ জিইয়ে রাখত।

এমনভিাবে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার আবরণে গোত্রে গোত্রে হিংসা-প্রতিহিংসার অনির্বাণ শিখা আর শত্রুতার অনলপ্রবাহ অব্যাহত গতিতে বয়ে চলতো। এর মূল কারণ এটাই ছিল যে, তারা ন্যায়-ইনসাফের পথ পরিহার করে "কেসাস" তথা "খুনের বদলে খুন" এ নীতিতে বিশ্বাসী ছিল না এবং এটাকে তারা যথেষ্ট মনে করতো না। ফলে হত্যার আইনগত প্রতিশোধে শরীয়তসম্মত

পথে না গিয়ে, তারা ঘটনাকে ব্যাপক গণহত্যার রূপ দিয়ে বসত। অথচ মহান আল্লাহ আমাদের ওপর কেসাস ফরয করে দিয়েছেন, যার উদ্দেশ্য ছিল অন্যায় হত্যার ইনসাফভিত্তিক বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা এবং সমাজ থেকে অন্যায় অত্যাচার নির্মূল করা।

প্রসঙ্গতঃ এটাও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, "কেসাসের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জীবন।" কেননা কেসাসের ফলে হত্যাকারীর ওয়ারিশ অভিভাবকদের রক্তপাত বন্ধ হয়, প্রাণে বেঁচে যায়, ফিৎনা ফাসাদ দূরীভূত হয়।[১] অধিকন্তু কোন ব্যক্তি যদি কাউকে হত্যা করার গোপন ইচ্ছা পোষণ করেও থাকে কিন্তু সে যখন জানতে পারে যে, পরবর্তীকালে তার সাধের প্রাণটাও রক্ষা পাবার নয় এবং কেসাসস্বরূপ নিজেরও মৃত্যু ঘটবে তখন এহেন মারাত্মক ও প্রাণের ঝুঁকি নিতে অবশ্যই সে বিরত থাকবে।

আলী ইবনে আবু তালিব (রা) এবং আমর ইবনে শুয়াইব (র) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (সা) বলেছেন–

اَلْمُؤْمِنُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاءُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلٰى مَنْ سَوَاهُمْ وَيَسْعٰى بِذِمَّتِهِمْ اَدْنَاهُمْ اَلاَ لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُوْ عَهْدٍ فِىْ عَهْدِهٖ -

(احمد - ابو داود وغيرهما من اهل السنن)

"সকল মুসলমানের রক্ত সমান, এ ব্যাপারে সবাই একমত, যিম্মীদের সাথে সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের সকলেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। সাবধান! স্বীয় অঙ্গীকারে স্থির থাকা পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ কোন ব্যক্তিকে এবং কাফিরের মুকাবিলায় কোন মুসলমানকে যেন হত্যা করা না হয়।" (আহমদ, আবু দাউদ)

এ সম্পর্কে মহানবী (সা) ঘোষণা করেছেন ঃ ছোট বড় আশরাফ আতরাফ নির্বিশেষে সকল মুসলমানের রক্ত সমপর্যায়ের। আরবীকে অনারব আজমীর উপর, কুরায়শী হাশিমীকে গায়র কুরায়শী হাশিমীর উপর, আযাদ ব্যক্তিকে আযাদকৃত গোলামের উপর, আলিমকে মূর্খের উপর এবং রাজাকে প্রজার উপর তিনি কোন প্রাধান্য দান করেন নাই। এটা সকল মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ রায় এবং সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত। কিন্তু জাহেলী ধ্যান ধারণার বাহক এবং ইহুদী শাসকগোষ্ঠী এর বিপরীত পন্থা ও ভ্রান্ত নীতির ছত্রছায়ায় স্বার্থবাদী হুকুম জারি করার ফলে সারা আরব জাহান পরস্পর হানাহানি মারামারিতে মেতে উঠে।

---

১. টীকা : কেসাসের ফলে হত্যাকারী অধিক হত্যাকাণ্ড করার সুযোগ পায় না।

মদীনার পার্শ্ববর্তী জনপদে 'বনু নাযীর' ও 'বনু কুরাইযা' ইহুদীদের দুইটি গোত্রের আবাস ছিল। বনু কুরাইযার মুকাবিলায় বনু নাযীর গোত্রের অধিক পরিমাণে খুন হয়েছিল, যে কারণে তারা নবী করীম (সা)কে বিচারক সাব্যস্ত করেছিল। হদ্দে যিনার হুকুমের মধ্যে ইহুদীরা এ পর্যন্ত পরিবর্তন এনেছিল যে, রজমের পরিবর্তে তারা অপরাধীর গায়ে লোহার দাগ দিত। এরপর ইহুদীরা মুসলমানদের নিকট এসে বলতে থাকে, তোমাদের নবী যদি এ হুকুম প্রদান করেন, তবে এটা আমাদের জন্য দলীলস্বরূপ। অন্যথায় একথাই প্রমাণিত হবে যে, তোমরা তাওরাতের হুকুম বর্জন করেছ। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন–

يَآ اَيُّهَا الرَّسُوْلُ لاَ يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ... الى قوله -

فَاِنْ جَاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْئًا - وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ - اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ..... الى قوله -

فَلاَ تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِىْ وَلاَ تَشْتَرُوْا بِاٰيَاتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلاً - وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ - وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ - (سورة المائدة : ٤٥ -٤١)

"হে রাসূল! লোকদের কুফরী তৎপরতা যেন আপনাকে চিন্তিত ও মনঃক্ষুণ্ন না করে, যারা শুধু মুখে বলে আমরা ঈমান এনেছি, অথচ তাদের অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করেনি...।

কাজেই হে পয়গম্বর! মীমাংসার জন্য যদি তারা আপনার নিকট উপস্থিত হয়, তবে তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেয়া না দেয়া আপনার ইচ্ছাধীন, কিন্তু যদি তাদের ব্যাপারে মুখ ফিরিয়ে নেন বা বিরত থাকেন, তবে তারা আপনার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি আপনাকে ফয়সালা করতেই হয়, তবে ন্যায়ের

ভিত্তিতে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিন, কেননা নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ন্যায় ও ইনসাফকারীকে পছন্দ করেন।...

তোমরা মানুষকে ভয় করবে না, ভয় করবে তো আমাকে করবে, আর আমার আয়াতসমূহের বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করো না। যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব (এর বিধান মোতাবেক) হুকুম ফয়সালা করবে না, এরাই হলো কাফির। আর তাওরাতে আমি ইহুদীগণকে লিখিত হুকুম দিয়েছিলাম যে, জানের বদলে জান, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং জখমের বদলে একই পরিমাণ জখমের বিধান করতে হবে।" (সূরা মায়িদা ঃ ৪১ - ৪৫)

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন যে, সকল প্রাণ একই পর্যায়ভুক্ত, একের উপর অপরের প্রাধান্যের অবকাশ নেই। অথচ ইহুদীরা লেনদেন, আচার-আচরণে এ ধরনের ভেদ নীতির প্রকাশ ঘটিয়ে চলতো।

الى قوله - وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلاَ تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ - لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ...... الى قوله - اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ - وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ - (سورة المائدة : ٥٠-٤٨)

"হে নবী! আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব নাযিল করেছি যা এর পূর্বে নাযিলকৃত কিতাবসমূহের স্বীকৃতি দান করে এবং সেগুলোর হিফাযতকারীও। কাজেই মহান আল্লাহ তোমার উপর যা কিছু নাযির করেছেন এর ভিত্তিতেই তাদেরকে তুমি হুকুম দান কর, কিন্তু তোমার প্রতি নাযিলকৃত সত্য বর্জন করতঃ তাদের কুপ্রবৃত্তি ও খাহেশের আনুগত্য করো না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি বিশেষ পন্থা ও শরীয়ত নির্দিষ্ট করে দিয়েছি...

এখনও কি তারা জাহেলী যুগের হুকুম কামনা করে? (আল্লাহর উপর) বিশ্বাস স্থাপনকারীগণের জন্য আল্লাহর চাইতে উত্তম হুকুমদাতা কে হতে পারে?" (সূরা আল মায়েদা : ৪৮ - ৫০)

আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ ফয়সালা করে দিয়েছেন যে, উঁচু-নীচু নির্বিশেষে সকল মুসলমানের জান-প্রাণ, রক্ত একই মানের সমান পর্যায়ের, অথচ জাহেলী

যুগের অধিকাংশ হত্যা-খুন-জখম ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হতো প্রবৃত্তির চাহিদা ও খেয়াল খুশি মতো। ফলে নগর-বন্দর, নিভৃত পল্লীসহ সকল জনপদ এর বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে যেত। আপাত দৃষ্টিতে এর কারণ যাই থাকুক কিন্তু মূলত অন্তরের আল্লাহদ্রোহী প্রবণতা এবং বিচারের ক্ষেত্রে ন্যায়নীতি, আদল-ইনসাফের কার্যকর ভূমিকা না থাকাই ছিল এর জন্য এককভাবে দায়ী। গোত্রে গোত্রে একে অপরের উপর প্রাধান্য শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভুত্ব কায়েমের প্রতিযোগিতা চলতো অব্যাহত গতিতে– চাই সেটা হত্যা ও খুনের ব্যাপারে হোক কি ধন-সম্পদের বেলায়- একে অপরের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করাকে সম্মান ও গৌরবের বিষয় মনে করা হতো। ন্যায় নীতির কার্যকারিতা জলাঞ্জলি দিয়ে দু'দলের কেউ ধৈর্য, উদারতা ও মহানুভবতার ধার ধারতো না। পক্ষ প্রতিপক্ষ সকলেই একে অন্যের প্রতি অন্যায়-উৎপীড়ন ও জুলুম-নির্যাতন করতো। এক পক্ষ যা করতো প্রতিপক্ষও তার চাইতে কোন অংশে কম করতো না। এই ছিল তৎকালীন সামাজিক ন্যায় বিচারের বাস্তব চিত্র। সুতরাং এমনি এক অস্বস্তিকর ও অরাজক পরিবেশে পবিত্র কুরআন আদল ইনসাফ ও ন্যায়নীতি বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছে এবং সমকালীন সমাজে প্রচলিত সকল প্রকার জাহেলী আইন-কানুন, হুকুম-আহকাম বাতিল ঘোষনা করেছে। কোন মুজাদ্দিদ কোন সংস্কারক সমাজ সংস্কারের ভূমিকা ও বাস্তব পদক্ষেপ নিয়ে ময়দানে আসলে সূচনাতে আদল-ইনসাফ ও ন্যায়নীতি অবলম্বন করেই তাঁকে এগিয়ে যেতে হবে। এমনি ধারা চলে আসছে যুগ যুগ ধরে।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের ফয়সালা হলো–

وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ـ فَاِنْ بَغَتْ اِحْدٰهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى ـ فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِىْٓءَ اِلٰى اَمْرِ اللّٰهِ ـ فَاِنْ فَائَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ـ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ ـ (سورة الحجرات : ١٠-٩)

“আর মুসলমানদের দু'টি দল যদি পরস্পরে যুদ্ধ-সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে, তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দাও। অতঃপর একদল যদি অপর দলের উপর জুলুম অত্যাচার চালায়, তবে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করো যতক্ষণ না তারা

আল্লাহর হুকুমের প্রতি ফিরে আসে। অতঃপর যখন তারা প্রত্যাবর্তন করে, তখন সাম্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে উভয়পক্ষে সন্ধি করিয়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ও ইনসাফকারীকে পছন্দ করে থাকেন। মুসলমানগণ তো পরস্পর ভাই ভাই, কাজেই ভাইদের মধ্যে তোমরা আপোষের মিলমিশ এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্য স্থাপন করে দিও।" (সূরা হুজরাত : ৯-১০)

খুনের বদলার ব্যাপারে সব চাইতে উত্তম পন্থা হলো প্রথমতঃ নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। কেননা কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে :

وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ - فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ -

"জখমের প্রতিশোধ অনুরূপ জখমই। অতঃপর যে মজলুম ব্যক্তি নিজের উপর কৃত জুলুমের প্রতিশোধ ক্ষমা করে দেয়, তাহলে এটা তার স্বীয় গুনাহর কাফ্ফারা হয়ে যাবে।" (সূরা মায়িদা : ৪৫)

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণি আছে তিনি বলেছেন :

مَا رُفِعَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْرٌ فِيْهِ الْقِصَاصُ اِلاَّ فِيْهِ بِالْعَفْوِ - (ابو داود وغيره)

"কেসাসযোগ্য কোন ঘটনা বা মুকাদ্দমা নবী করীম (সা) এর খিদমতে পেশ করা হলে, তিনি ক্ষমার নির্দেশ দান করতেন।" (আবু দাউদ)

সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রা) এর রেওয়ায়েত সূত্রে বর্ণিত আছে, মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন :

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَّالٍ وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلاَّ عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ -

"সাদকার দ্বারা সম্পদের মধ্যে স্বল্পতা আসে না, আর যে ব্যক্তি অপরকে ক্ষমা করে দেয় আল্লাহ্ অবশ্যই তার মান-সম্মান বাড়িয়ে দেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য নম্রতা প্রকাশ করে, আল্লাহ্ তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন।" (মুসলিম)

ইসলামের সাম্যবাদী নীতি সম্পর্কেই আলোচনা হয়েছে, আলোচনায় পরিষ্কার হয়েছে যে, মুসলমান সকলে একই শ্রেণীভুক্ত এবং সাম্যের অধিকারী কিন্তু সমপর্যায়ের ক্ষেত্রে যিম্মী কাফির ও মুসলমান একই স্তরের হতে পারে না, বরং এখানে বিশ্বাসগত পার্থক্য বিদ্যমান। সকল আলিম এ ব্যাপারে একমত। তদ্রূপ

কোন যিম্মী কাফির ভ্রমণ কিংবা ব্যবসার উদ্দেশ্যে মুসলিম অধ্যুষিত শহরে আগমন করলে, সকলের ঐকমত্যে সেও মুসলমানের সমপর্যায়ের হবে না, আর সে মুসলমানের সম-অধিকারের যোগ্য পাত্রও বিবেচিত হবে না।

অবশ্য কোন কোন আলিম মন্তব্য করেছেন যে, যিম্মীর বেলায়ও 'কুফু' তথা ইসলামী সাম্য প্রযোজ্য হবে এবং সে একজন মুসলিম নাগরিকের ন্যায় যাবতীয় সুযোগ সুবিধা ভোগের অধিকার লাভ করবে।

দ্বিতীয় প্রকার, খুন হল "কতলে খাতা" (ভুলক্রমে হত্যা করা), যা شِبْهُ عَمَدَ তথা 'ইচ্ছাকৃত হত্যার' প্রায় অনুরূপ। এ সম্পর্কে মহানবী (সা)-এর ইরশাদ হলো :

اَلاَ اِنَّ فِىْ قَتْلِ الْخَطَاءِ شِبْهُ الْعَمَدِ مَا كَانَ فِى السَّوْطِ وَالْعَصَاءِ مِاَةٌ مِنَ الاِبِلِ مِنْهَا اَرْبَعُوْنَ خِلْقَةٌ فِىْ بُطُوْنِهَا اَوْلاَدُهَا.

"তোমরা সাবধান! কোড়া কিংবা লাঠির আঘাতে ইচ্ছাকৃত হত্যা অনুরূপ "কতলে খাতার" দণ্ডস্বরূপ একশো উট দিতে হবে। যার মধ্যে চল্লিশটি উটনী হবে (গর্ভধারী) গাভীন।"

বস্তুতঃ একে "শিব্‌হে আমাদ" বলা হয়েছে যে, কোড়া কিংবা লাঠি দ্বারা প্রহারকারী জুলুম অবশ্যই করেছে। কেননা আঘাতের বেলায় সে মাত্রার এবং সীমার ভেতর সংযত থাকতে পারেনি। কিন্তু এটাও সত্যও কথা যে, এ ধরনের 'প্রহারে সব সময়ই যে মৃত্যু ঘটবে তা নয়, বরং প্রায়শ এর ব্যতিক্রমও পরিলক্ষিত হয়।

তৃতীয় প্রকারের খুন হলো- "কতলে খাতা" তথা ভুলক্রমে হত্যা করা। যেমন কোন ব্যক্তি শিকারে গুলি বা তীর ছুড়লো কিন্তু তা লেগে গেল কোন মানুষের গায়ে। অথচ এর পিছনে তার আদৌ কোন ইচ্ছা বা পরিকল্পনা ছিল না। যার ফলে এহেন কল্পনাতীত ঘটনাটি ঘটে গেল। তাই এর বিনিময়ে 'হদ' তথা প্রাণদণ্ডের হুকুম জারী হবে না; বরং এরূপ ক্ষেত্রে কাফ্‌ফারা দিয়াত এবং রক্তমূল্য দেয়াই শরীয়তের বিধান। এ সম্পর্কিত বহু মাসআলা মনীষীগণের সংকলিত বা রচিত গ্রন্থরাজীতে লিখিত রয়েছে।

জখমের কিসাস ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কিসাস

জখমের কিসাস, হাত-পায়ের বিনিময়ে হাত-পা কাটতে হবে, দাঁত ভাঙ্গলে দাঁত ভাঙ্গতে হবে, কারো মাথা কেটে দিলে পরিবর্তে মাথা কাটতে হবে।

জখমের কিসাস বা বদলা লওয়া ওয়াজিব। কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা এটা প্রমাণিত। কিন্তু শর্ত হলো সমতা রক্ষা করার সীমানার ভেতরে থাকতে হবে। কেউ যদি অপর কারো হাত কব্জা থেকে ভেঙ্গে দেয়, তাহলে বদলাস্বরূপ আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে কব্জা থেকে তার হাত ভেঙ্গে দেয়া জায়েয। যদি কারো দাঁত ভাঙ্গা হয় তবে এর প্রতিশোধে প্রতিপক্ষের দাঁত ভেঙ্গে দেয়া জায়েয। মস্তক এবং মুখমণ্ডল যদি এমনভাবে জখম করে দেয়া হয় যে, ভেতরের হাড় পর্যন্ত দৃষ্ট হয় তবে আঘাতকারীর মুখমণ্ডল ও মাথা সমপরিমাণ হারে জখম করে দেয়া জায়েয। (অবশ্য এসব কিছু বিচার বিভাগের মাধ্যমে হতে হবে।)

বস্তুতঃ জখম যদি এমন পর্যায়ের হয় যে, প্রতিশোধমূলক প্রত্যাঘাতের মাধ্যমে সমতা বিধান করা সম্ভব নয়, যেমন– ভেতরের হাড় ভেঙ্গে ফেলেছে অথবা জখম এ পর্যায়ের যে, ভেতরের হাড় দৃষ্টিগোচর হয় না, এমতাবস্থায় কিসাস গ্রহণ করা যাবে না বরং জখমের আনুপাতিক জরিমানা আদায় করতে হবে।

কিসাস বা প্রতিশোধের ধরন হলো এই যে, হাত দ্বারা আঘাত করবে অথবা লাঠি দ্বারা প্রহার করবে। যেমন, চড়মারা কিংবা কিল-ঘুষি অথবা লাঠি দ্বারা আঘাত করা হবে। আলিমগণের এক অংশের মতে আলোচ্য পরিস্থিতিতে কিসাসের হুকুম প্রযোজ্য হবে না; বরং তাযীর অর্থাৎ শাসন ও শিক্ষামূলক শাস্তি বিধান করতে হবে। যেহেতু এ ক্ষেত্রে আনুপাতিক সমতা বিধান করা সম্ভব নয়। কিন্তু খুলাফায়ে রাশেদীন এবং অন্যান্য সাহাবীগণের উক্তিতে এ ক্ষেত্রে কিসাসের উল্লেখ শরীয়তসম্মতরূপে লক্ষ্য করা যায়।

ইমাম আহমদ (র) সহ অন্যান্য ইমামগণ এ মতই ব্যক্ত করেছেন এবং নবী করীম (সা)-এর হাদীসও এ ধরনের অর্থব্যঞ্জক। আবূ ফেরাস (র) বলেন ঃ এ সম্পর্কে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) একবার হাদীসের উদ্ধৃতি সম্বলিত ভাষণ পেশ করেন, যার ভাষ্য ছিল :

اَلاَ اِنِّىْ وَاللّٰهِ مَا اُرْسِلُ عُمَّالِىْ اِلَيْكُمْ لِيَضْرِبُوْا اَبْشَارَكُمْ وَلاَ

يَاْخُذُوْا اَمْوَالَكُمْ وَلٰكِنْ اُرْسِلُهُمْ اِلَيْكُمْ لِيُعَلِّمُوْكُمْ دِيْنَكُمْ وَسُنَنَكُمْ فَمَنْ فَعَلَ بِهٖ سِوٰى ذَالِكَ فَلْيَرْفَعْهُ اِلَىَّ - فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اِذًا لَاُقِصَّنَّهُ - (حديث عمر رض)

"সাবধান! তোমরা স্মরণ রেখো, আল্লাহর কসম, শাসনকর্তাগণকে আমি তোমাদের প্রতি এজন্য প্রেরণ করি না যে, তারা তোমাদেরকে প্রহার করে যাবে অথবা তোমাদের ধন-সম্পদ হস্তগত করার উদ্দেশ্যও তাদের প্রেরণ করি না, বরং তোমাদেরকে দ্বীন ও মহানবীর শিক্ষা আদর্শ সম্পর্কে শিক্ষা দানকল্পেই পাঠিয়ে থাকি। সুতরাং তাদের কেউ যদি এর ব্যতিক্রম কোন কাজ করে বসে, তাকে যেন আমার নিকট উপস্থিত করা হয়। সেই সত্তার কসম– আমার প্রাণ যার ক্ষমতার অধীন– ঐসব লোকদের (অত্যাচারী সরকারী কর্মকর্তার) কাছ থেকে আমি 'কিসাস' বা প্রতিশোধ নেবই নেব।"

অতঃপর হযরত আমর ইবনুল আস (রা) দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! কোন আমীর বা গভর্ণর যদি মুসলমানদের রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং জনগণের চরিত্র গঠন ও নৈতিক শিক্ষাদানে নিয়োজিত থাকে, তার থেকেও কি আপনি কিসাস গ্রহণ করবেন? হযরত উমর (রা) জবাব দিলেন ঃ হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! (অনুরূপ অন্যায় করলে) তার থেকেও আমি কিসাস নেব। আর কেবল আমিই কিসাস গ্রহণ করি না– খোদ্ নবী করীম (সা) নিজ প্রাণ ও আপন সত্তা থেকেও কিসাস বা প্রতিশোধ নিতেন। হুশিয়ার! মুসলমানদেরকে তোমরা মারধর করবে না, তাদেরকে অপমান করবে না, তাদের হক বা অধিকার দাবিয়ে রাখবে না। কেননা এসবের পরিণতিতে তাদের মধ্যে কুফরী প্রবণতা দেখা দেয়া বিচিত্র নয়।" (মুসনাদে আহমদ)

আলোচ্য বর্ণনার সার সংক্ষেপ এটাই যে, হাকিম, বিচারপতি, (আঞ্চলিক) শাসনকর্তা ও গভর্ণরগণ অন্যায়ভাবে কাউকে প্রহার করবে না– দণ্ড দেবে না। যদি বৈধ কারণে জনসাধারণের কাউকে প্রহার করা হয় এবং শরীয়তের বিধান অনুযায়ী প্রহার বা আঘাত করা হয় তবে 'ইজমা' তথা সর্বসম্মতিক্রমে (উল্লেখিত কর্মকর্তাদের) কিসাসের বিধান জারী হবে না। এ জন্যে যে, বৈধ ও শরীয়তসম্মত প্রহার, আঘাত ও জখম হয়তো ওয়াজবি হবে, না হয় মুস্তাহাব তথা পছন্দনীয় বৈধ হবে। আর এ তিনের কোনটিতেই কিসাস বর্তায় না।

[তেইশ]

বিভিন্ন ধরনের মানহানির কিসাস

মান-সম্মানের কিসাসও বৈধ, গালি দেয়া অপরাধ। এরও বিধিসম্মত কিসাস রয়েছে। কেউ কারো বাপ-দাদা, বংশ ও গোত্রের নামে অশালীন উক্তি এবং বক্তব্য প্রকাশ করলে, বিনিময়ে তারপক্ষে প্রতিপক্ষের বাপ-দাদা, বংশ ও গোত্রের নামে অনুরূপ উক্তি করা জায়েয নয়। কেননা তারা তো তার প্রতি কোন অন্যায় করেনি।

কারো মান-সম্মান ইয্যত-আবরুর প্রতিশোধ গ্রহণ করাটাও শরীয়তসম্মত বিষয়। তা এভাবে, যেমন এক ব্যক্তি কারো উপর অভিসম্পাত বাক্য বর্ষণ করলো অথবা বদ-দু'আ করলো, এর প্রতিশোধস্বরূপ প্রথম ব্যক্তির প্রতি অনুরূপ বাক্যবাণ প্রয়োগ করা দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য বৈধ। কেউ যদি সত্যিকার গালি দেয়, যার মধ্যে মিথ্যার কোন মিশ্রণ নেই, তবে প্রতি উত্তরে সেও গালি দিতে পারে। তবে ক্ষমা করে দেয়াই উত্তম। মহান আল্লাহ বলেন :

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا - فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِيْنَ - وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ -

"মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দই আর যে ক্ষমা করে দেয় এবং বিরোধ নিষ্পত্তি করে নেয়, তার প্রতিদান আল্লাহর নিকট রয়েছে। আল্লাহ অত্যাচারীদের পছন্দ করেন না। আর অত্যাচারিত হবার পর যারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে, তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। (সূরা শূরা : ৪০-৪১)

মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন :

اَلْمُسْتَبَانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِيْ مِنْهُمَا مَالَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُوْمُ -

"সামনা সামনি যে বলবে তার উপর তাই হবে, কিন্তু সূচনাকারীর উপর কিছু বেশী হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে মজলুমের উপর জুলুম করবে।"

বস্তুত এটাকেই اِنْتِصَار। তথা প্রতিশোধ গ্রহণ বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ গালি-গালাজ যদি এমন হয়, যার মধ্যে মিথ্যার কোন লেশ নেই, সেটিও প্রতিশোধ গ্রহণের

যোগ্য। যেমন, সে ব্যক্তির নৈতিক চরিত্রে যে দোষ-ক্রটি রয়েছে সেগুলো প্রকাশ করে দেয়া, অথবা কুকুর, গাধা ইত্যাদি বলা। কিন্তু কেউ যদি কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ ও মনগড়া দোষারোপ করে তবে, এর প্রতিশোধকল্পে তারও অনুরূপ বানোয়াট কথা ও মিথ্যা দোষারোপ করা জায়েয নয়। কেউ যদি অকারণে কাফির, ফাসিক বলে তবে, একে অনুরূপ কাফির, ফাসিক বলা তার জন্য জায়েয নয়। কেউ যদি কারো বাপ, দাদা, বংশ, গোত্র কিংবা স্বীয় শহরবাসীদের উপর অভিশাপ দেয়, তবে জবাবে তার পক্ষে অনুরূপ বাক্য প্রয়োগ করা বৈধ নয়। এটা অন্যায় ও জুলুম। কেননা, তারাতো তাকে কিছু করেনি। বরং তার উপর অন্যায় অত্যাচার যা কিছু করা হয়েছে সেটা করেছে উপস্থিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি। এ ব্যপারে মহান আল্লাহর বাণী হলো :

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ـ اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ـ (مائده : ٨)

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্য দানে তোমরা অবিচল থাকবে, কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ তথা তোমাদের প্রতিশোধ-স্পৃহা যেন এমন মাত্রার না হয় যে, তাতে তোমরা অবিচার করে বসো, বরং তোমরা সুবিচার করো। এটা তাকওয়া অর্থাৎ খোদাভীতির নিকটতর। (সূরা মায়িদা : ৮)

অতএব কারো মানহানি করা, ইয্যত-সম্মান হানির দ্বারা অত্যাচার করা হারাম। বস্তুত এটা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অধিকার। কাজেই যদি এ জাতীয় কষ্ট দেয়া হয়, যার প্রতিশোধ নেওয়া সম্ভব– যেমন এক ব্যক্তি অন্য একজনের প্রতি বদ-দু'আ করল, তবে মজলুম ব্যক্তি অতিরঞ্জিত ও বাড়াবাড়ি না করে প্রথম ব্যক্তির উপর সমপরিমাণ বদ-দু'আ করতে পারে। কিন্তু এর সাথে যদি আল্লাহর হক জড়িত থাকে, যেমন সে মিথ্যা বললো, তবে এর জবাবে মিথ্যা বলা তার জন্য জায়েয নয়।

অনুরূপভাবে অধিকাংশ ইসলামী আইনবিদগণ বলেন : কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে পুড়িয়ে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করে, অথবা পানিতে ডুবিয়ে মারে, গলাটিপে হত্যা করে কিংবা অন্য কোন পন্থায় প্রাণ নাশ করে, তবে তার প্রতিশোধ গ্রহণার্থে

(আদালত কর্তৃক) অনুরূপ পন্থাই অবলম্বন করা যেতে পারে যা সে করেছিল। অবশ্য লক্ষ্য রাখতে হবে প্রতিশোধমূলক শাস্তিটি যেন হারাম না হয়। যেমন কেউ একজনকে মদ পান করিয়ে দিল, বিনিময়ে সেও তাকে মদ্য পান করিয়ে দিল। অথবা পুংমৈথুন করেছিল, এর বদলে তার সাথেও তার 'লাওয়ালাত' তথা পুংমৈথুন করা।"

কোন কোন ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞের মত হলো : পুড়িয়ে মারা, পানিতে ডুবিয়ে মারা এবং গলাটিপে হত্যা করার শাস্তিস্বরূপ তরবারির আঘাতে তার শিরোচ্ছেদের দণ্ড হতে হবে। কিন্তু ইতিপূর্বে এ সম্পর্কিত উল্লেখিত মন্তব্যই কুরআন হাদীসের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল।

যিনা-ব্যভিচারের অপবাদ দানকারীর শাস্তি প্রসঙ্গে

মিথ্যা দোষারোপের কোন কিসাস নেই, অবশ্য এর জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে। **বিবাহিত, আযাদ নিষ্পাপ মুসলমানদের প্রতি ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ** প্রদানকারীর উপর 'হদ্দে কযফ' জারি হবে না। খোলাখুলি পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তির প্রতি যিনা তথা ব্যভিচারের قاذف অপবাদ দানকারীর উপর حد قذف কযফের হদ জারি হবে না, বানোয়াট কথা, মিথ্যা দোষারোপের বিরুদ্ধে কিসাসের বিধান নেই বরং শাস্তির বিধান রয়েছে। মিথ্যা দোষারোপের মধ্যে 'হদ্দে কযফ'ও অন্তর্ভুক্ত যা কুরআন হাদীস ও ইজমার দ্বারা প্রমাণিত। মহান আল্লাহর বাণী হলো–

وَالَّذِيْنَ يَرْمُـوْنَ الْمُـحْـصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَـةِ شُـهَـدَاءَ فَـاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً وَّلاَ تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَـهَادَةً اَبَدًا ـ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ ـ اِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَاَصْلَحُوْا ـ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ (سورة النور : ٤-٥)

"যারা সতী নারীগণের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, আর এর সপক্ষে চার জন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না; এরাই সত্য ত্যাগী। তবে এরপর তারা যদি তওবা করে ও নিজেদের সংশোধন করে (সেটার ভিন্ন হুকুম।) আল্লাহ্ অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা নূর : ৪-৫)

কোন সৎ লোকের উপর যদি যিনা কিংবা লাওয়াতাতের (পুংমৈথুন) অপবাদ আরোপ করা হয়, তবে এর উপর 'হদ্দে কযফ' (ব্যভিচারের অপবাদের শাস্তি) ওয়াজিব হবে। তখন তাকে আশিটি বেত্রদণ্ড দেবে। এছাড়া যদি অন্য কিছুর অপবাদ দেয়া হয় তবে তার উপর 'তাযীর' অর্থাৎ শাসনধর্মী শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে।

একান্তভাবে مَقْذُوْفٌ অপবাদ প্রদত্ত ব্যক্তি এই হদের অধিকারী। কাজেই এ হদ তখনই জারী হবে, যখন সে হদ জারী করবার আবেদন করবে। এটা বিশেষজ্ঞদের সর্বসম্মত ঐকবদ্ধ রায়। অপবাদ প্রাপ্ত ব্যক্তি যদি ক্ষমা করে দেয়, তবে হদ মাফ

করা যাবে। এ ব্যাপারেও আলিমগণের নিরংকুশ ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। কেননা এ ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির হক প্রবল। যেমন মালের কিসাস ইত্যাদি ব্যক্তির হক। আবার কেউ কেউ বলেন, হদ মাফ হবে না। যেহেতু এতে আল্লাহর হকও জড়িত রয়েছে। কাজেই অন্যান্য হদের ন্যায় এটিও মাফ হবে না।

'হদ্দে কযফ' তখনি কার্যকর হবে, 'মাকযূফ' (যার বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হয়েছে সে) যদি বিবাহিত, মুসলমান, মুক্ত এবং নিষ্কলঙ্ক হয়। সুতরাং বিভিন্ন অপবাদ ও পাপাচারে কলংকিত ব্যক্তির প্রতি অপবাদ দিলে হদ্দ জারী হবে না। অনুরূপভাবে কাফির ও গোলামের উপর মিথ্যা অপবাদ খাড়া করলেও হদ জারী হবে না। অবশ্য তাদের উপর 'তাযীর' কার্যকর করতে হবে। স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর ব্যভিচারের অভিযোগ প্রকাশ করা জায়েয– যদি স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং যদিও যিনার কারণে গর্ভবতী না হয়। কিন্তু যিনার দ্বারা যদি স্ত্রী অন্তসত্তা হয়ে পড়ে আর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে যায়, তবে স্ত্রীকে ব্যভিচারে অভিযুক্ত করা ফরয। আর "আমার নয়" বলে সন্তান অস্বীকার করে দেবে, যেন পরের জিনিস নিজের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে না পাড়ে।

স্বামী যদি স্ত্রীর উপর যিনার অপবাদ দায়ের করে, তবে স্ত্রী হয়তো যিনার কথা স্বীকার করবে নতুবা 'লি'আন' করবে, যা কুরআন হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। কাযফ অর্থাৎ, অপবাদ দানকারী যদি গোলাম হয় তবে, তার উপর অর্ধেক হদ জারী হবে। যিনা-ব্যভিচার ও মদ্য পানের সাজার বেলায়ও এ একই হুকুম জারী হবে যে, তাকে অর্ধেক সাজা দিতে হবে। তাই গোলাম-বাঁদী সম্পর্কে কুরআনের ইরশাদ হলো :

فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ -

"বিবাহিতা হবার পর যদি তারা ব্যভিচার করে তবে তাদের (গোলাম-বাঁদীদের) শাস্তি হবে স্বাধীন নারীর অর্ধেক।" (সূরা নিসা : ২৫)

কিন্তু যে হদ্দের সাজায় কতল করা অথবা হাত কাটা ওয়াজিব, সে ক্ষেত্রে সাজা অর্ধেক হবে না; বরং পূর্ণ সাজা কার্যকর করতে হবে– অর্থাৎ প্রাণদণ্ড পরিপূর্ণরূপে কার্যকর করতে হবে এবং হাতও যতটুকু কাটা দরকার ততটুকুই কাটতে হবে, এ ক্ষেত্রে সাজা আধাআধি করা যাবে না।

[পঁচিশ]

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক ও অধিকার

স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গমাধিকার, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, মোহর, খোরপোষ ও সাংসারিক বিষয়াদির পারস্পরিক হক এই পরিচ্ছেদেরই বিষয় বস্তু।

দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পাস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং একে অপরের হক বা অধিকার যথাযথ আদায়কল্পে আল্লাহর হুকুমের উপর আমল করা উভয়ের উপর ওয়াজিব। মহান আল্লাহর বাণী হচ্ছে :

فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَصْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ - (سورة البقرة : ٢٢٩)

"অতঃপর স্ত্রীকে হয় বিধিমত (নিজ সান্নিধ্যে) রেখে দেবে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দেবে।" (সূরা বাকারা : ২২৯)

স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের উপর ফরয হলো– দাম্পত্য জীবনে খুশীমনে, প্রফুল্লচিত্তে একে অপরের অধিকার যথাযথ আদায়ে যত্নবান হওয়া। স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর হক রয়েছে। স্বামীর জীবদ্দশায় তা হলো, মোহর ও খোরপোষ। দৈহিক অধিকার হলো, স্বামী বৈধ ও বিশুদ্ধ পন্থায় স্ত্রীর যৌন চাহিদা মিটাবে, তাকে যথাযথ ব্যবহার করবে। এ ব্যাপারে স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে 'ঈলা' তথা– "মিল করবে না" বলে কসম খায় তাহলে ঐ অবস্থায় সর্বস্তরের আলিমগণের সর্বসম্মত ঐকমত্যে স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার পাবে। স্বামী যদি কর্তিত পুরুষাঙ্গ বিশিষ্ট অথবা নপুংসক হয় এবং সঙ্গমে অক্ষম হয়, তবুও স্ত্রীর সাথে সঙ্গম একই বিছানায় অবস্থান করা তার উপর ওয়াজিব। কেউ কেউ বলেছেন, এর কারণ যদি জন্মগত হয় তবে, তার উপর সঙ্গম করা ওয়াজিব নয়। কিন্তু বিশুদ্ধ মত এটাই যে, সঙ্গম করা ওয়াজিব। কুরআন হাদীস ও শরীয়তের মৌল নীতি (اصول شريعت) এ মতেরই সমর্থনকারী। নবী করীম (সা) আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-কে দেখলেন, তিনি বেশী পরিমাণে রোযা রাখেন এবং নামাযে অধিক সময় ব্যয় করেন, তখন হুযূর (সা) বলেন যে, اِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ "তোমার উপর তোমার স্ত্রীরও হক রয়েছে।"

সুতরাং সঙ্গম করা ওয়াজিব। কিন্তু কতদিন অন্তর এ সঙ্গম করতে হবে? এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, অন্তত চার মাস অন্তর একবার সঙ্গম

করা ওয়াজিব। কেউ বলেছেন, না– বরং স্বামীর শক্তি এবং স্ত্রীর চাহিদা অনুপাতে ওয়াজিব, যেভাবে ওয়াজিব হয় খোরপোষ। বস্তুত এটাই হলো সঙ্গত মীমাংসা। পক্ষান্তরে স্ত্রীর উপরও স্বামীর অধিকার রয়েছে। অর্থাৎ, যখন ইচ্ছা সে স্ত্রী ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু শর্ত হলো, স্ত্রীর যেন কোন ক্ষতি না হয় কিংবা অন্য কোন ওয়াজিব হক আদায় করতে অক্ষম না হয়। স্বামীকে তার মনে তৃপ্তিদায়ক মিলনের সুযোগ দেয়া স্ত্রীর কর্তব্য। অধিকন্তু স্বামীর অনুমতি কিংবা শরীয়তের অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর স্বামীগৃহ ত্যাগ করা নিষিদ্ধ।

সাংসারিক কাজ-কর্মের ব্যাপারে ফকীহদের মতভেদ রয়েছে। যেমন বিছানা বিছানো, ঘরদোর ঝাড়ু দেয়া, ঘরবাড়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, ভাত-তরকারী ও রান্না-বান্না করা ইত্যাদির ব্যাপারে ইসলামী আইনবিদদের মধ্যে মতাবিরোধ রয়েছে। কারও মতে স্ত্রীর উপর এসব কাজ করা ওয়াজিব। আবার কারও মতে ওয়াজিব নয়। অপর এক শ্রেণী বলেন, মধ্যম ধরনের সেবা করাটাই স্ত্রীর উপর ওয়াজিব।

[ছাব্বিশ]

ধন-সম্পদের মীমাংসায় ন্যায়দণ্ড বজায় রাখা

ধন-সম্পদের মীমাংসা ন্যায়ের ভিত্তিতে করতে হবে, আচার-ব্যবহারে ন্যায়-নীতি অবলম্বন সুখ-শান্তির মূলমন্ত্র এবং দুনিয়া ও আখিরাত এ দ্বারাই পরিশুদ্ধ হয়।

আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা)-এর নির্দেশ অনুসারে ধন-সম্পদের মীমাংসা ন্যায়-নীতির ভিত্তিতেই করতে হবে। যেমন, ওয়ারিশদের মধ্যে সুন্নাহর আলোকে মীরাস বণ্টন করা কর্তব্য। অবশ্য যদিও এর কোন কোন মাসআলাতে মতভেদ রয়েছে। এমনিভাবে লেনদেন, আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে যথা– ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা, উকিল নিযুক্তি, শরীকী কারবার, হেবা, ওয়াক্ফ, ওয়াসীয়ত ইত্যাদিতে ন্যায়-ইনসাফের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত ফয়সালা করা ওয়াজিব। আর যে সকল লেনদেনে ক্রয়-বিক্রয় এবং হস্তগত করা শর্ত, সেসব ক্ষেত্রে ন্যায়-ইনসাফ কায়েম করা ওয়াজিব। কেননা ইনসাফের উপর জগতের স্থিতি নির্ভরশীল। এর অবর্তমানে ইহজগত ও পরজগতের স্বচ্ছতা- পরিশুদ্ধতা আসতেই পারে না। এ সকল ক্ষেত্রে ন্যায় ইনসাফের প্রয়োজনীয়তা বিবেকবান মাত্রই বুঝতে সক্ষম। যেমন, ক্রয় করা বস্তুর মূল্য সঙ্গে সঙ্গে আদায় করা খরিদদারের উপর ওয়াজিব। অপর পক্ষে বিক্রেতার ওয়াজিব হলো বিক্রিত মাল ক্রেতার হাতে সোপর্দ করে দেয়া। আর ওযনে কম-বেশী করা সম্পূর্ণ হারাম। কেনা-বেচার ক্ষেত্রে সত্য বলা, সঠিক বিবরণ দেয়া ওয়াজিব। পক্ষান্তরে মিথ্যা বলা, খিয়ানত করা, বিশ্বাস ভঙ্গ করা, ভেজাল দেয়া ও ধোঁকা দেয়া হারাম। ঋণ আদায় করা, ঋণদাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ও তার প্রশংসা করা ওয়াজিব।

যে সমস্ত আচার-আচরণ, ব্যবহার কুরআন হাদীস দ্বারা নিষিদ্ধ, সাধারণত সেগুলোতে ন্যায়-নীতি বা ইনসাফ কার্যকর হয় না, নিষিদ্ধ কর্মে কম-বেশী জুলুম ও অন্যায় হয়ে থাকে। যেমন– অন্যায় আয়-উপার্জন করা। যথা, সুদ, জুয়াখেলা। এগুলো নবী করীম (সা) কর্তৃক নিষিদ্ধ। সুতরাং সকল প্রকার জুয়া ও সুদ হারাম। অধিকন্তু ধোঁকা ও শঠতার মাধ্যমে বেচা-কেনা হারাম। উড়ন্ত পাখী (না ধরেই) বিক্রি করা, পানির নীচের মাছ না ধরেই বিক্রি করা, মেয়াদ ঠিক না করে বিক্রি করা, আন্দাজ-অনুমানে কোন জিনিস বিক্রি করা, খাঁটি বলে ভেজাল মাল ও নষ্ট মাল বিক্রি করা, খাওয়ার যোগ্য হওয়ার পূর্বেই ফল বিক্রি করা, নাজায়েয পন্থায় শরীকী কারবার করা, যেসব লেন-দেনের ফলে মুসলমানদের মধ্যে ঝগড়ার সৃষ্টি

হয়, আর যাতে কোন না কোন প্রকারের ক্ষতিকর বিষয় বর্তমান থাকে, সন্দেহজনক বেচা-কেনা, আর সেসব বেচা-কেনা, যেগুলো কিছু লোক বৈধ ও ন্যায়ানুগ মনে করে আর কিছু লোক অন্যায় ও জুলুম মনে করে, এসব বেচা-কেনা ফাসেদ। রাষ্ট্রীয়ভাবে এগুলো বাতিল হওয়া ওয়াজিব ও জরুরী। তাই এগুলো থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য। আল্লাহ বলেন :

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ - فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ - اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ - ذَالِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلاً -

(سورة النساء : ٥٩)

"যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস কর, তবে তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূল এবং তোমাদের মধ্যে যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তাদের আনুগত্য কর, কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে সে বিষয়ে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নীতি আদর্শের শরণাপন্ন হও। এটাই উত্তম এবং ব্যাখ্যায় সুন্দরতর।" (সূরা নিসা : ৫৯)

এ ক্ষেত্রে মূল নীতি হলো যেসব লেনদেন কাজ-কারবার কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী হারাম সেগুলো হারাম। আর যে ইবাদত শরীয়তসম্মত ও কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত সেটি ইবাদত। মহান আল্লাহ সেসব লোকের নিন্দা করেছেন, যারা এমন জিনিস নিজের উপর হারাম করে নিয়েছিল, যা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ হারাম করেননি। পক্ষান্তরে তারা এমন সব বস্তু নিজেদের জন্য জায়েয ও বৈধ করে নিয়েছিল, যেগুলো জায়েয হওয়ার শরীয়তসম্মত কোন দলীল প্রমাণ ছিল না।

اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنَا لاَنْ نَجْعَلَ الْحَلاَلَ مَا حَلَّلْتَهُ - وَالْحَرَامَ مَا حَرَّمْتَهُ - وَالدِّيْنَ مَا شَرَّعْتَهُ -

"হে আল্লাহ! আপনি যেই বস্তু হালাল করেছেন, সেইটি হালাল হিসাবে গণ্য করার সামর্থ্য আমাদের দান করুন। তেমনি আপনি যা হারাম করেছেন, সেইটি হারাম হিসাবে গণ্য করার তওফীক আমাদের প্রদান করুন।"

আর তওফীক দিন খোদা সেই বিধি ব্যবস্থা মেনে চলার, যা তুমি বিধিবদ্ধ করে দিয়েছ।

দেশ পরিচালনায় পরামর্শভিত্তিক ব্যবস্থা

আমীর, ক্ষমতাসীন ব্যক্তি ও শাসনকর্তার জন্য পরামর্শ গ্রহণ করা জরুরী। আল্লাহ পাক স্বীয় রাসূল (সা)-কে হুকুম দিয়েছেন, وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ "তাদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পরামর্শ করো।" যারা পরামর্শ গ্রহণ করে, আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেন :

وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ -

"ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গের পরস্পর পরামর্শ করা অপরিহার্য।"

স্বীয় রাসূল (সা)-কে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন :

فَاعْفُ عَنْهُمْ - وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ - اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ - (سورة ال عمران : ١٥٩)

"তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর, তাদের জন্য মাগফেরাতের দু'আ কর এবং কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর, আর কোন বিষয়ে তোমার 'মত' যদি সুদৃঢ় হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহর উপর নির্ভর করবে। আল্লাহর উপর নির্ভরকারীদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন।" (সূরা আলে ইমরান : ১৫৯)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :

لَمْ يَكُنْ اَحَدٌ اَكْثَرَ مُشَاوَرَةً لاَصْحَابِهٖ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (الحديث)

"স্বীয় সাহাবীগণের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাইতে অধিক পরামর্শ গ্রহণকারী দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না।"

বলা হয়েছে, সাহাবা কিরাম এর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই রাসূলুল্লাহ (সা)-কে পরামর্শ গ্রহণের হুকুম দেয়া হয়েছে। তদুপরি এটাও উদ্দেশ্য ছিল যে, পরবর্তী কালে যেন রাসূলুল্লাহ সা)-এর অনুসরণে পরামর্শ গ্রহণের ব্যাপার একটি নীতিতে পরিণত হয়। ওহীর মাধ্যমে যে বিষয়টির মীমাংসা হয়নি, যেমন, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং খুটিনাটি

বিষয়, সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে মানুষের মতামত নেয়া জরুরী। স্বয়ং নবী করীম (সা) যে ক্ষেত্রে পরামর্শ নিতেন, সে ক্ষেত্রে অন্যান্যরাতো আরো অধিক পরিমাণে পরামর্শের মুখাপেক্ষী। খোদ আল্লাহ্ (মানব সৃষ্টির প্রাক্কালে ফেরেশতাদের মতামত গ্রহণের ঘটনা দ্বারা বান্দাদেরও অনুরূপ করার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। যদিও তাঁর পরামর্শের দরকার হয় না) আল্লাহ্ পরামর্শ গ্রহণকারীদের প্রশংসা করেছেন। কাজেই ইরশাদ হচ্ছে :

وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى - لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ - وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَاغَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ - وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ - (سورة شورى : ٣٨-٣٦)

"আল্লাহর নিকট যা আছে তা অতি উত্তম ও স্থায়ী। ঐ সমস্ত মুমিন-মুসলমান আর যারা তাদের পালনকর্তার উপর নির্ভর করে, সেই উত্তম ও স্থায়ী উপভোগ্য বস্তু তাদেরই জন্য। আর যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য হতে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধাবিষ্ট হয়েও অপরকে ক্ষমা করে দেয়, আর যারা তাদের পালনকর্তার আহ্বানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে এবং নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে কর্ম সম্পাদন করে এবং আমার প্রদত্ত জীবনোপকরণ থেকে তারা ব্যয় করে (তারাও ঐ উত্তম ও স্থায়ী উপভোগ্য বস্তুর অধিকারী)।" (সূরা শূরা : ৩৬-৩৮)

'উলিল আমর' তথা ক্ষমতাবান কর্তৃপক্ষ বা নেতা। পরামর্শ গ্রহণের মাধ্যমে এবং কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হলে, তখন এর বিপরীতে কারো অনুসরণ করা নিষেধ। গৃহীত সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া ও সে মুতাবিক কাজ করা 'উলিল আমর' এর জন্যও ফরয হয়ে দাঁড়ায়। দ্বীন ও দুনিয়ার ছোট বড় সকল সমস্যা সম্পর্কেই একই নীতি। এ ক্ষেত্রে অন্য কারো অনুসরণ জায়েয নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্র নির্দেশ হলো :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ - (سورة النساء : ٥٩)

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য করো আর তোমাদের মধ্যে যারা সামগ্রিক দায়িত্বসম্পন্ন সেসব নেতা-কর্তৃপক্ষের আনুগত্য কর।" (সূরা নিসা : ৫৯)

কিন্তু সৃষ্ট কোনো সমস্যা সম্পর্কে যদি মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে এহেন পরিস্থিতিতে জনগণের কাছ থেকে পরামর্শ আহ্বান করা বিশেষ জরুরী। সুতরাং যে রায় ও যে পরামর্শ কুরআন-হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যশীল ও নিকটবর্তী, তার উপরই আমল করবে। আল্লাহ পাকের হুকুম হচ্ছে :

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ - اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ - ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلاً - (سورة النساء : ٥٩)

"কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে সে বিষয়ে আল্লাহ ও রাসূলের শরণাপন্ন হও। যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও। এটাই ভাল এবং পরিণতির দিক থেকেও উত্তম।" (সূরা নিসা : ৫৯)

"উলিল আমর" তথা ক্ষমতাসীন নেতৃত্ব দুই প্রকার। (১) শাসকবর্গ, (২) আলিমগণ। এঁরা যদি সৎকর্মশীল হন, তবে জনগণও সৎকর্মশীল হয়ে যাবে। কাজেই এ দু'শ্রেণীরই দায়িত্ব হলো– যাবতীয় কাজ ও কথায় যাচাই করা– অনুসন্ধান করা। কুরআন-হাদীসের আলোকে সমস্যার সুস্পষ্ট সমাধান পাওয়া গেলে তার উপর আমল করা ওয়াজিব। কঠিন কোন সমস্যা দেখা দিলে গভীর দৃষ্টিতে, অভিনিবেশ সহকারে উদ্ভূত সমস্যার চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে যে, সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসূল (সা)-এর অনুসরণ কি প্রকারে সম্ভব?

কুরআন-সুন্নাহর ইঙ্গিত কোন্ দিকে, সেটা লক্ষ্য করতে হবে। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিচার-বিবেচনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। সময়ের স্বল্পতা, যাচাইকারীর দুর্বলতা, বিপরীতমুখী দলীল-প্রমাণ কিংবা অন্য কোন কারণে ত্বরিত সমাধান সম্ভব না হলে তবে এ ক্ষেত্রে ক্ষমতাবানদের কর্তব্য হলো– এমন ব্যক্তির অনুসরণ করা, যার প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও দীনদারী সর্বজন স্বীকৃত। এটাই হলো বিশুদ্ধ সমাধান।

এও বলা হয়েছে যে, কারো 'তাকলীদ' বা অনুসরণ জায়েয নয়"। উক্ত তিন পন্থাই ইমাম আহমদ প্রমুখের মযহাবে বর্ণিত রয়েছে। আর বিচারপতি ও ক্ষমতাসীনদের যে সকল গুণাবলী ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য থাকা অপরিহার্য, সেগুলো আছে কিনা তাও লক্ষ্য করতে হবে। নামায-জিহাদ ইত্যাদি সকল ইবাদতে একই হুকুম যে, শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী আমল ও কাজ-কর্ম করতে হবে। যদি সংশ্লিষ্টদের শক্তিতে

না কুলায় এবং অপারগ হয়, তাহলে শক্তির বাইরে কাউকে হুকুম দেয়া আল্লাহর নীতি নয়।

এই একই মূলনীতির উপর তাহারাত-পাক-পবিত্রতার বিষয়াদিও প্রতিষ্ঠিত। যথা– প্রথমত পানি দ্বারা পবিত্রতা হাসিল করাই বিধান। কিন্তু পানি দুষ্প্রাপ্য হলে কিংবা ব্যবহারে ক্ষতির আশংকা থাকলে– যেমন, শীত অতি প্রচণ্ড ও তীব্র অথবা পানি ব্যবহার করাতে জখম বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকা থাকলে, এমতাবস্থায় তাইয়াম্মুম দ্বারা পবিত্রতা হাসিলের বিধান রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতেই নবী করীম (সা) ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন :

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلٰى جَنْبٍ ـ (الحديث)

"নামায দাঁড়িয়ে পড়, যদি সম্ভব না হয় বসে বসে পড়। যদি বসারও সামর্থ্য না থাকে, তবে শুয়ে শুয়ে পড়।"

এমনিভাবে আল্লাহ পাক নামায যথাসময়ে আদায় করার হুকুম দিয়েছেন– যেভাবে সে অবস্থায় সম্ভব হয়। এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে :

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً اَوْ رُكْبَانًا ـ فَإِذَا اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ـ (سورة البقرة : ٢٣٩-٢٣٨)

"তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে। যদি তোমরা দুশমনের আশংকা কর পদচারী অথবা আরোহী যে অবস্থায় হউক না কেন নামায পড়; আর যখন তোমরা নিরাপদ বোধ কর তবে আল্লাহকে স্মরণ করবে যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না।" (সূরা বাকারা : ২৩৮-২৩৯)

মহান আল্লাহ নামাযকে নিরাপদ, ভীত, সুস্থ, রুগ্ন, ধনী, গরীব, মুকীম ও মুসাফির সকলের উপর ফরয করেছেন, যা কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। অনুরূপভাবে পাক-পবিত্রতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সতর ঢাকা ও কেবলামুখী হওয়া ইত্যাদি নামাযের পূর্বশর্ত হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি এসব শর্ত

পূরণে অক্ষম, তাকে এ থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন। এমনকি যদি কারো নৌকা ডুবে যায়, চোর-ডাকাতরা তার মালামাল লুটে নেয়, তার পরিধেয় বস্ত্রাদি খুলে নেয় তবে এমতাবস্থায় সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিবস্ত্র হয়েই নামায আদায় করবে। এ অবস্থায় ইমাম সকলের মাঝখানে এমনভবে দাঁড়াবে, যেন কারো সতর দৃষ্টিতে না পড়ে। যদি কারো কেবলা জানা না থাকে, তবে জ্ঞাত হওয়ার জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করবে আর চূড়ান্ত প্রচেষ্টার পরই নামায আদায় করবে। কোন একটা দিক, নির্দিষ্ট করার মত কোন প্রমাণ যদি সে না পায়, তবে যেভাবে সম্ভব যেদিকে সম্ভব মুখ করে নামায আদায় করবে, যেমনিভাবে নবী করীম (সা)-এর সময়কালে নামায পড়া হয়েছিল।

জিহাদ, রাষ্ট্র পরিচালনা এবং সকল ধর্মীয় বিষয়ের এ একই অবস্থা। এ পরিপ্রেক্ষিতেই মূলনীতি ঘোষণা করে কুরআনে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন :

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ـ (سورة التغابن : ١٦)

"(হে মুসলমানগণ) সাধ্যমত তোমরা আল্লাহকে ভয় করো।" (সূরা তাগাবুন ঃ ১৬)

আর মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন :

اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِاَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ـ

"আমি যখন তোমাদের প্রতি কোন কাজের হুকুম করি তখন সাধ্যানুযায়ী তোমরা তার উপর আমল কর।"

তদ্রূপ 'খবীছ' তথা অপবিত্র, অখাদ্য ও দোষযুক্ত খাদ্য ও পানীয় পানাহারকে মহান আল্লাহ একদিকে তো হারাম ঘোষণা করেছেন, অপরদিকে তার পাশাপাশি এও বলেছেন :

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

(سورة البقرة : ١٧٣)

"যে অনন্যোপায় অথচ অন্যায়কারী বা সীমালংঘনকারী নয় (সে জীবন রক্ষা পরিমাণ মৃত জন্তুর গোশত খেলেও) তার কোন পাপ হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" (সূরা বাকারা : ১৭৩)

তিনি আরো বলেছেন ঃ

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ـ (سورة الحج : ٧٨)

"তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনে কঠিন কোন বিধান দেননি ।" (সূরা হজ্জ: ৭৮)

অন্যত্র বলেছেন ঃ

مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ - (سورة المائده : ٦)

"আল্লাহ তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না।" (সূরা মায়িদা : ৬)

সুতরাং মহান আল্লাহ তাই ফরয করেছেন যা মানুষের সাধ্যের আওতাভুক্ত। পক্ষান্তরে যা ক্ষমতা ও সামর্থ্যের বাইরে তা ওয়াজিব নয়। তাই অনন্যোপায় অবস্থায় যা ব্যতীত গত্যন্তর নেই, সেগুলো হারাম করেননি। সুতরাং গুনাহ্র পর্যায়ে পড়ে না বান্দা যদি নিরূপায় হয়ে এমন সীমিত আকারে হারাম বস্তু ব্যবহার বা কাজ করে, তবে তার কোন গুনাহ্ হবে না।

ক্ষমতা গ্রহণ ও শাসন পরিচালনা মহা দীনী কাজ

ক্ষমতা গ্রহণ, হুকুমত ও শাসন পরিচালনা দীনের বৃহত্তম স্তম্ভ এবং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বরং দীনের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব এরি সাথে সংশ্লিষ্ট।

এ পর্যায়ে নবী করীম (সা)-এর ইরশাদ হলো ঃ

اِذَا خَرَجَ ثَلٰثَةٌ فِىْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ ـ (ابو داود)

"তিন ব্যক্তি সফরে বের হলে, তারা একজনকে নেতা (ইমাম) নির্বাচন করে নিবে।" (আবু দাউদ)

ক্ষমতা গ্রহণ এবং রাষ্ট্র পরিচালনা দীনের বৃহত্তম এবং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, বরং দীনের অস্তিত্ব ও স্থিতি এরি সাথে সংশ্লিষ্ট। কেননা মানুষের জাতীয় ও সমষ্টিগত কল্যাণ ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যতীত সম্ভব নয়। কারো কারো প্রয়োজন ও চাহিদাতো এমন যে, এর সমাধান দল বা জামা'আত ছাড়া সম্ভবই নয়। যেহেতু জামা'আত ওয়াজিব ও অপরিহার্য, কাজেই জামা'আতের জন্য আমীর বা নেতা থাকাও ওয়াজিব।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) এর সূত্রে স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন– রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

لاَ يَحِلُّ لِثَلٰثَةٍ يَكُوْنُوْنَ بِفَلاَةٍ مِّنَ الْاَرْضِ اِلاَّ اَمَّرُوْا عَلَيْهِمْ اَحَدُهُمْ ـ (مسند احمد)

"তিন ব্যক্তি যদি কোন মরুপ্রান্তরে সফর করে, তবে তাদের মধ্য হতে একজনকে নিজেদের আমীর বানিয়ে নেয়া একান্ত প্রয়োজন।" (মুসনাদে আহমদ)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, দল যতই ক্ষুদ্র হোক, তারা একান্ত অস্থায়ী কিংবা সফররত যে কোন অবস্থাতে থাকুক, তাদের মধ্য হতে একজনকে আমীর নিযুক্ত করে নেয়া ওয়াজিব। এটা এজন্য যে, অন্যান্য সকল দলের পক্ষে যেন সতর্ক বাণীরূপে গণ্য হয় যে, ভ্রমণের উদ্দেশ্যে মাত্র তিন ব্যক্তি জমায়েত হলেও যে ক্ষেত্রে নিজেদের আমীর বা নেতা নির্বাচন করা ওয়াজিব, সে ক্ষেত্রে অন্যান্য জামা'আতের উপর এ হুকুম কার্যকরী করা আরো অধিক প্রয়োজন। কেননা আল্লাহ পাক اَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ (সৎ কাজের আদেশ) এবং نَهِى عَنِ الْمُنْكَرِ

(অসৎ কাজের নিষেধ)-কে ওয়াজিব করে দিয়েছেন। আর আমীর ছাড়া অন্যদের পক্ষে এ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা সম্ভব নয়।

অনুরূপভাবে জিহাদ, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, হজ্জ পালন করা, জুমু'আ ও দুই ঈদের নামায কায়েম করা, আর্ত-নির্যাতিতের সাহায্য, হদ কার্যকরী করা ইত্যাদি ফরয-ওয়াজিবসমূহ শক্তি, ক্ষমতা ও নেতার নেতৃত্ব ছাড়া বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। এ সম্পর্কেই রিওয়ায়েত করা হয়েছে :

اَنَّ السُّلْطَانَ ظِلُّ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ ـ

"নিশ্চয়ই (ন্যায়পরায়ণ) সুলতান বা শাসনকর্তা যমীনের বুকে আল্লাহর ছায়া স্বরূপ।"

উপরন্তু আরো বলা হয়েছে যে, জালিম অত্যাচারী সুলতান বা শাসনকর্তার ষাট বছরব্যাপী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা, একরাত শাসকবিহীন থাকার তুলনায় উত্তম। বাস্তব অভিজ্ঞতাও একথার ইঙ্গিত দেয় যে, শাসকবিহীন জীবন-যাপনের চাইতে অত্যাচারী জালিম বাদশাহ বিদ্যমান থাকা অধিক বাঞ্ছনীয়। এরি পরিপ্রেক্ষিতে ফযল ইবনে ইয়ায, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল প্রমুখ সলফে সালেহীন এ ধরনের উক্তি করেছেন :

لَوْ كَانَ لَنَا دَعْوَةٌ مُجَابَةٌ لَدَعَوْنَا بِهَا لِلسُّلْطَانِ ـ (مسند احمد)

"আমাদের দু'আ যদি অবধারিত কবূল হতো, তবে আমরা সুলতানের জন্য দু'আ করতাম।"

নবী করীম (সা) বলেছেন :

اِنَّ اللّٰهَ يَرْضٰى لَكُمْ ثَلَاثًا اَنْ تَعْبُدُوْهُ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَاَنْ تَعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ـ وَاَنْ تَنَاصَحُوْا مَنْ وَّلَّاهُ اللّٰهُ اَمْرَكُمْ ـ (مسلم)

"তিন জিনিসে আল্লাহ পাক তোমাদের উপর সন্তুষ্ট। এক : একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে, কাউকে তাঁর সাথে শরীক করবে না।[১] দুই : আল্লাহর রশিকে সম্মিলিতভাবে ধারণ করবে, বিচ্ছিন্ন হবে না। তিন ঃ যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শাসক নিযুক্ত করেন তাকে উপদেশ দেবে ও তোমরা তার মঙ্গল কামনা করবে।" (মুসলিম)

---

১. টীকা : আমীর ও শাসক ব্যতীত জনগণ কোন অবস্থাতেই জীবন-যাপন করতে পারে না। যেহেতু এমতাবস্থায় একে অন্যের প্রতি জোর-জুলুম ও অন্যায়-অত্যাচার করবে। (পরের পৃষ্ঠা দেখুন)

তিনি আরো বলেছেন :

ثَلاَثٌ لاَ يَغُلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ - اِخْلاَصُ الْعَمَلِ لِلّٰهِ وَمُنَاصَحَةُ وُلاَةِ الْاَمْرِ وَلُزُوْمُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاِنْ دَعْوَتَهُمْ تُحِيْطُ مِنْ وَّرَائِهِمْ - (اهل السنن)

"তিন বিষয়ে মুসলমানের অন্তর কৃপণতা প্রদর্শন করতে পারে না। (১) স্বীয় কাজ কর্ম আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরম নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করায়, (২) দেশের শাসকবর্গের প্রতি হিতোপদেশ প্রদান করার বেলায় এবং (৩) মুসলমানদের জামা'আতকে আঁকড়িয়ে ধরার ক্ষেত্রে। কেননা তাদের দু'আ পশ্চাৎদিক থেকে তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখে।" (আহলে সুনান)

সহীহ বুখারীতে নবী করীম (সা)-এর হাদীস বর্ণিত হয়েছে :

اَلدِّيْنُ اَلنَّصِيْحَةُ - اَلدِّيْنُ اَلنَّصِيْحَةُ - اَلدِّيْنُ اَلنَّصِيْحَةُ -

"দীন হিতোপদেশের নাম, দীন হিতোপদেশের নাম, দীন হিতোপদেশের নাম।" (বুখারী)

সাহাবীগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), নসীহত কার জন্যে? তিনি বললেন, "আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য এবং তার রাসূলের উদ্দেশ্যে মুসলিম জনগণ, তাদের ইমাম তথা নেতৃবৃন্দকে।"

সুতরাং মুসলমানদের উচিত দীন ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রেখে ইসলামী নেতৃত্ব সৃষ্টি করা ও ইসলামী শাসন কায়েম করা, যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন সম্ভব হয়। কেননা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর আনুগত্য করা সর্বোত্তম ইবাদত। কিন্তু সময় সময় এর মধ্যে ফিতনা-ফাসাদ ও বিশৃংখলা দেখা দেয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ছত্রছায়ায় ধন-সম্পদ লাভের আকাঙ্ক্ষা

(পূর্বের পৃষ্ঠার পর)

ফলে নিজেরা ধ্বংস হয়ে যাবে। কেননা অন্যায় উৎপীড়ন থেকে প্রতিরোধকারী ও রক্ষাকারী কেউ থাকবে না। দুর্নীতিপরায়ণ লোকেরা অবাধে নির্ভয়ে অত্যাচার চালিয়ে যাবে, একে অপরের মালামাল লুণ্ঠন করবে। অতঃপর তাদের মধ্যেও অরাজকতা ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে। এভাবে তারা নিজেরাও ধ্বংস হবে আর অন্যদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিয়ে ছাড়বে। সুতরাং এ কারণেই সুলতান তথা শাসক বর্তমান থাকা অতীব জরুরী, যদিও সে জালিম হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতেই বলা হয়েছে, "ষাট বছর পর্যন্ত জালিম শাসকের অধীনে শাসিত হওয়া, শাসন কর্তাবিহীন এক রাত কাটানোর চাইতে উত্তম।"

পোষণ করে আর এটাকে কাঙ্ক্ষিত সম্পদ অর্জনের মাধ্যম বানিয়ে নেয়। যার ফলে নিজের দীন ও আখিরাত বিনাশ করে خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ এর পাত্রে পরিণত হয়। যেমন, কাব ইবনে মালিক (রা) মহানবী (সা)-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন। হুযূর (সা) বলেন :

مَاذِئْبَانِ جَائِعَانِ اُرْسِلاَ فِىْ غَنَمٍ بِاَفْسَدَلَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِيْنِهِ ـ (قال الترمذى حديث حسن صحيح)

"এমন দুটি ক্ষুধার্ত বাঘকে বকরীর পালে যেন ছেড়ে দেয়া হয়েছে যারা বকরীগুলোর নিধন কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। একটি হল– মানুষের সম্পদের মোহ ও লোভ, দ্বিতীয় হল– দীনের ক্ষেত্রে মান-মর্যাদাবোধ।" (তিরমিযী এটাকে হাদীসুন হাসানুন বলেছেন)

এ ব্যাপারে মহানবী (সা) সতর্ক করে দিয়েছেন যে, সম্পদ ও ক্ষমতার মোহ দুটি এমন জিনিস যা দীন-ধর্মকে বিনাশ করে দেয়। আর বাস্তব ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায় যে, অধিকাংশ ফিতনা-ফাসাদ এ দুটি ক্ষুধার্ত বাঘের কারণেই সংঘটিত হয়ে থাকে। ক্ষুধার্ত এ বাঘ দুটিই প্রকৃতপক্ষে মানব পালকে ছিন্ন-ভিন্ন ও লুণ্ঠন করে ছাড়ে।

মহান আল্লাহ এমন ব্যক্তি সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন, যার আমলনামা বাম হাতে অর্পণ করা হবে। আর এটা দেখে সে বলে উঠবে ঃ

مَا اَغْنٰى عَنِّىْ مَالِيَهْ ـ هَلَكَ عَنِّىْ سُلْطَانِيَهْ ـ (سورة الحاقة : ٢٩-٢٨)

"আমার ধন-সম্পদ আমার কোনই কাজে আসে নাই। আমার ক্ষমতাও অপসৃত হয়েছে।" (সূরা আল হাক্কা ঃ ২৮-২৯)

রাজত্ব ও ক্ষমতালোভীদের পরিণাম ফিরাউনের ন্যায় এবং সম্পদ জমাকারীর অবস্থা কারূনের ন্যায় হয়ে থাকে।

মহান আল্লাহ কুরআন হাকিমে ফিরাউন ও কারূনের অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করে ইরশাদ করেছেন :

اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ط كَانُوْاهُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِى الْاَرْضِ فَاَخَذَ هُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ـ (سورة المؤمن : ٢١)

"এরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? তাহলে দেখতে পেত যে, এদের পূর্ববর্তীগণের পরিণাম কি হয়েছিল। পৃথিবীতে তারা ছিল এদের অপেক্ষা শক্তিতে ও কীর্তিতে প্রবল পরাক্রমশালী। অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন তাদের অপরাধের জন্য এবং আল্লাহর শাস্তি থেকে তাদেরকে রক্ষা করার কেউ ছিল না।" (সূরা মু'মিন : ২১)

আল্লাহ্ আরো বলেন :

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِـرَةُ نَجْـعَلُهَـا لِلَّذِيْنَ لَايُـرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَافَسَادًا - وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ - (سورة القصص :٨٣)

"ইহা আখিরাতের সেই আবাস যা আমি নির্ধারিত করি তাদেরই জন্য, যারা পৃথিবীতে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। আর শুভ পরিণাম কেবল মুত্তাকীদের জন্য।" (সূরা কাসাস : ৮৩)

মানুষ সাধারণত চার প্রকারের হয়ে থাকে।

(১) সেসব লোক যারা উচ্চ মর্যাদা, নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব ও সরদারীর অভিলাষী। আল্লাহর যমীনে এরা বিশৃংখলা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে থাকে। উচ্চ মর্যাদা ও নেতৃত্ব লাভের জন্য এরা কপটতা-শঠতা, ধোঁকাবাজি ইত্যাদি বৈধ বলে ধারণা করে। অথচ এটা কঠিন ও জঘন্যতম অপরাধ। এ জাতীয় রাজা-বাদশাহ, রাষ্ট্রপতি ও দুষ্কৃতিকারী নেতৃবৃন্দ ফিরাউন ও ফিরাউনচক্রের দলভুক্ত। আল্লাহ্র সৃষ্টি জগতের এরা নিকৃষ্টতম জীব। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ.

(سورة القصص : ٤)

"নিশ্চয়ই ফিরাউন নিজ দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং তথাকার অধিবাসীগণকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের একটি শ্রেণীকে সে হীনবল করেছিল; ওদের পুত্রগণকে সে হত্যা করতো এবং নারীগণকে জীবিত রাখতো। সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।" (সূরা কাসাস : ৪)

ইবনে আব্বাস (রা)-এর রিওয়ায়েত ক্রমে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন :

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ - وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ اِيْمَانٍ - (مسلم)

"যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার বিদ্যমান, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং সে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না যার অন্তরে বিন্দু পরিণাম ঈমান বর্তমান থাকে।" (মুসলিম)

কেউ একজন প্রশ্ন করলো, "হে রাসূলুল্লাহ (সা)! এটা আমার বড় পছন্দ লাগে যে, আমার পোশাক-পরিচ্ছদ ও জামা-জুতা সুন্দর দেখাক। তবে ইটাও কি অহংকার ও গর্বের অন্তর্ভুক্ত।" জবাবে তিনি বললেন :

لاَ اِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ - اَلْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ - (مسلم)

"না– এটা গর্ব ও অহংকার নয়। বরং আল্লাহ তা'আলা সুন্দর, সৌন্দর্যকে তিনি ভালবাসেন। অহংকার হলো, সত্যকে অস্বীকার ও পদদলিত করা এবং মানুষকে নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত মনে করা। এ হলো সে সকল লোকদের অবস্থা, যারা উচ্চাকাঙ্ক্ষী, নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব, মান-মর্যাদার প্রত্যাশী এবং সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।"

(২) ঐ সকল লোক যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী এবং বিশৃংখলার হোতা বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উচ্চমর্যাদা, নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। যেমন– চোর-ডাকাত, গুণ্ডা-বদমাশ ইত্যাদি। এ জাতীয় অপরাধীগণ সাধারণত সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী ও নিম্ন শ্রেণীর লোক হয়ে থাকে।

(৩) যে সকল লোক মান-মর্যাদা, ইয্যত-সম্মান কামনা করে কিন্তু তারা সমাজে বিশৃংখলা ও বিপর্যয় সৃষ্টিতে আগ্রহী নয়। এরা দীনদার শ্রেণীভুক্ত, যাদের নিকট দীন রয়েছে। আর এ দীনের দ্বারাই তারা মানুষের মধ্যে মান-সম্মান কামনা করে।

(৪) এ পর্যায়ে রয়েছে সে সকল লোক প্রকৃতপক্ষেই যারা জান্নাতের অধিকারী, তারা আল্লাহভক্ত ও হকপন্থী লোক। তারা মান-মর্যাদার অভিলাষী নয়। অধিকন্তু যমীনের বুকে তারা ফাসাদ সৃষ্টিকারীও নয়; তাসত্ত্বেও তারা উচ্চমর্যাদার অধিকারী। যেমন কুরআন করীমে ইরশাদ হয়েছে :

وَلاَ تَهِنُوْا وَلاَ تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ -

(سورة ال عمران : ١٣٩)

"তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না তোমরাই বিজয়ী থাকবে যদি তোমরা মুমিন হও।" (সূরা আলে ইমরান : ১৩৯)

তাতে আরো বলা হয়েছে :

فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْا اِلَى السَّلْمِ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ - وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ - (سورة محمد : ٣٥)

"তোমরা বলহীন হয়ো না এবং সন্ধির প্রস্তাব করো না, তোমরাই বিজয়ী থাকবে; আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন, তিনি তোমাদের কর্মফল কখনো বিনষ্ট করবেন না।" (সূরা মুহাম্মদ : ৩৫)

আল্লাহ আরো বলেছেন :

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ - (سورة المنافقون : ٨)

"মান-মর্যাদা শক্তিতো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদেরই জন্য।" (সূরা মুনাফিকূন : ৮)

মোটকথা, ক্ষমতাগর্বী ও অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষী এমনও রয়েছে, যারা সব চাইতে বেশী ঘৃণিত, লাঞ্ছিত ও পদদলিত, হীনতার চরমে নিপতিত। পক্ষান্তরে অনেক উচ্চমর্যাদাশীল ব্যক্তিও রয়েছে, যারা ফিতনা-ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করা থেকে দূরে থাকা সত্ত্বেও মর্যাদার শৈলচূড়ায় বিরাজমান। এটা এ কারণে যে, আল্লাহর সৃষ্টিকুলের উপর আধিপত্য বিস্তারের ধারণা পোষণ করাটা তাদের উপর জুলুমেরই নামান্তর। কেননা, গোটা মানব জাতি একই শ্রেণী একই গোত্রভুক্ত। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি সমগোত্রীয়দের উপর আধিপত্য লাভের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শক্তি ও কৌশল প্রয়োগে আত্মনিয়োগ করে, যাতে অন্যান্যরা তার অধিকার বলয়ে চলে আসে, এটা চরম অত্যাচার। কাজেই এ জাতীয় লোকদের প্রতি সমাজে হিংসা-বিদ্বেষ ও ক্ষোভের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে আপন ভাইয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করা, তাকে মানবেতর জীবন-যাপনে বাধ্য করার কল্পনাও অচিন্তনীয়। অবশ্য অত্যাচারী জালিম ব্যক্তি চায় যে, সকলের উপর তার প্রাধান্য ও সরদারী কায়েম থাকুক। তাদের নিকটও বিবেক বুদ্ধি রয়েছে। তারা এটা লক্ষ্য করে যে, একজনকে তাদের অন্যের উপর মর্যাদা দেয়া হয়েছে। যেমন– فَضَّلْنَا بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ আয়াতাংশে বর্ণিত হয়েছে। ইতিপূর্বে আরো বলা হয়েছে যে, আকার-আকৃতি বিশিষ্ট মানব দেহের সংশোধন তার সেরা অংগে মস্তক ছাড়া সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাকের ইরশাদ হলো ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَا اٰتَاكُمْ ـ (سورة الانعام : ١٦٥)

"তিনিই তোমাদেরকে দুনিয়ায় প্রতিনিধি করেছেন এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন, সে সম্পর্কে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কতককে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করেছেন।" (সূরা আন'আম : ১৬৫)

আল্লাহ আরো বলেছেন :

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ـ (سورة الزخرف : ٣٢)

"তাদের পার্থিব জীবনে আমিই তাদের মধ্যে জীবিকা বণ্টন করি এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করি, যাতে একে অন্যের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে।" (সূরা যুখরুফ : ৩২)

রাষ্ট্র ও ধন-সম্পদ সার্বিকভাবে আল্লাহর পথে নিয়োজিত রাখা এবং যথাযথরূপে দীনের কাজে ব্যয় করার জন্য ইসলামী শরীয়ত জোর নির্দেশ দিয়েছে। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যও তাই যে, এর দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা, দ্বিতীয়ত আল্লাহর দীন যেন কায়েম ও মজবুত হয়। সুতরাং আল্লাহর পথে যখন ধন-সম্পদ ব্যয় করা হবে, ফলশ্রুতিতে দ্বীন-দুনিয়া উভয় জাহানের কল্যাণ সাধিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। পক্ষান্তরে আমীর, সুলতান তথা শাসক যদি ইসলাম থেকে দূরে সরে থাকে, তাহলে জনগণের নৈতিক, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক সকল দিক নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়।

আল্লাহ পাকের অনুগত বান্দাদের এবং গুনাহগার ও অবাধ্যদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা যায় তাদের উদ্দেশ্য ও সৎকাজ দ্বারা। এ প্রসঙ্গে বুখারী-মুসলিমের হাদীসে হুযূর (সা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَلاَ اِلٰى اَمْوَالِكُمْ وَاِنَّمَا يَنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَاِلٰى اَعْمَالِكُمْ ـ (بخارى ومسلم)

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের আকৃতি চেহারা ও তোমাদের মালের প্রতি তাকান না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর, তোমাদের আমলের প্রতিই লক্ষ্য করে থাকেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

অধিকাংশ রাষ্ট্রপতি, শাসক, আমীর ও রঈস এখন দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন। অর্থবিত্ত, কুলগৌরব, বুযুর্গী ইত্যাদিকে পার্থিব স্বার্থে ও দুনিয়াবী গরজে ব্যবহার করা হয়। তারা ঈমানের মূল ভাবধারা এবং পরিপূর্ণ দীন থেকে সরাসরি বঞ্চিত। অবশ্য তাদের কারো কারো মধ্যে দীনী চেতনাবোধ প্রবল বটে, কিন্তু যদ্দারা এর পরিপূর্ণতা হাসিল হয়, তা থেকে এরা অনবহিত। ফলে তারা এ বিষয়গুলো পরিহার করে বসেছে। অপরপক্ষে তাদের কেউ হয়তো এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা এ থেকে বিমুখ হয়ে আছেন। আর তা এ জন্যে যে, রাষ্ট্র পরিচালনা, নেতৃত্ব, সরদারী ইত্যাদিকে তারা ইসলাম বিরোধী কার্য-কলাপ বলে ধারণা করে নিয়েছেন। বস্তুতঃ তাদের বিশ্বাস হলো যে, এসব দীন ইসলামের পরিপন্থী কাজ। তাদের মতে দীন হলো অপমান ও লাঞ্ছনার নামান্তর। ইয্যত, সম্মান ও মর্যাদার উচ্চাসন থেকে এরা মূলত বঞ্চিত ও মাহরূম।

ইহুদী, নাসারা ধর্মাবলম্বীদের অবস্থাও একই এবং প্রায় অভিন্ন। নিজেদের ধর্মকে তারা অসম্পূর্ণ মনে করে নিজেদেরকে অক্ষম অপরাধী ধারণা করে। তদুপরি দীন প্রতিষ্ঠার কাজে নানাবিধ আপদ-বিপদ লক্ষ্য করে হীনবল হয়ে যায়। দীনকে অপমানকর মনে করে তা পরিত্যাগ করে বসে। ফলে দীনের পরিসীমা সংকোচিত হতে থাকে এবং এমনিভাবে দীন ধর্ম দ্বারা তাদের নিজেদের অথবা অপরের কোন কল্যাণ সাধিত হবার নয়, তাই মূল ধর্মকেই তারা বর্জন করে। এমনি দুটি দীন দুটি পথ একদা ছিল। একদল দেখলো তাদের নিজেদের দীনকে অসম্পূর্ণ উদ্দেশ্যে, তদুপরি দীন প্রতিষ্ঠায় শত বাধা বিঘ্ন দেখে তারা ভীত হয়ে যায়। ফলে দ্বীনী পথ সুকঠিন হয়ে পড়ে। দীনকে অপমানের বস্তু মনে করে তারা দীন পরিত্যাগ করে। তদুপরি দীন প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষমতা, ধন-সম্পদ ও রণ-কৌশল সম্পর্কিত জ্ঞান অপরিহার্য। তাদের দীন-ধর্ম তাদের চাহিদা পূরণ করতে কার্যত অক্ষম; তাই ঘৃণাভরে মূল ধর্মই ত্যাগ করে এথেকে তারা সরে দাঁড়ায়।

অপর পক্ষীয়রা রাষ্ট্র; অর্থবিত্ত, সামরিক উপায়-উপকরণ সংগ্রহ এবং প্রয়োজনে যুদ্ধ-বিগ্রহের দিক নির্দেশনা নিজেদের ধর্মীয় ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান দেখতে পায়; কিন্তু দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া তাদের উদ্দেশ্য বহির্ভূত বিধায় আসল ধর্মকেই তারা বিসর্জন দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। পক্ষ দুটি হল مَغْضُوْبِ

عَلَيْهِمْ (অভিশপ্ত) ইহুদী ও ضَالِّيْن (পথভ্রষ্ট) নাসারা। ইহুদীরা তো (দ্বীনী) রাজত্ব, শাসন, সরদারী সব পরিত্যাগ করেছে, খৃষ্টান নাসারাগণ মূল ধর্মই ছেড়ে দিয়েছে।

সুতরাং সিরাতে মুস্তাকীম (সরল-সহজ পথ) তাদেরই গমন পথ যাদের উপর আল্লাহর বিশেষ রহমত-করুণা নাযিল হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে :

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنِ وَالصِّدِّقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ -

"এটা সে সকল লোকদের পথ যাদের উপর আল্লাহ বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন। যেমন, নবী (আ), সিদ্দিকীন, শহীদ এবং সৎকর্মপরায়ণ মানুষ।"

হযরত মুহাম্মদ (সা), তাঁর পর খুলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কিরাম এবং পরবর্তী কালে তাঁদের অনুগামীদের এই একই পথ, একই তরীকা ছিল।

এ প্রসঙ্গে কুরআনের শাশ্বত বাণী হলো :

وَالسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّلَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِىْ تَحْتَهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا - ذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ - (سورة التوبة : ١٠٠)

"মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা সর্বপ্রথম ঈমানের দাবী অনুযায়ী অগ্রসর হয়েছিল তারা এবং যারা সততার সাথে তাদের অনুসরণ করছিল, আল্লাহ তাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হলেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হলো। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার তলদেশে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত, যেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী। এটা মহা সাফল্য।" (সূরা তওবা : ১০০)

সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে দীন প্রতিষ্ঠার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা ফরযে আইন বা অবশ্য কর্তব্য। যার উপর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও শাসনভার ন্যস্ত, তার দায়িত্ব ও কর্তব্য এ ব্যাপারে সর্বাধিক। এ দ্বারা সে আল্লাহর আনুগত্য, ইকামতে দীন ও মুসলমানদের কল্যাণ সাধনের কাজ আঞ্জাম দিবে আর রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভের

পশ্চাতেও এই একক উদ্দেশ্য। কাজেই এ জন্য রাষ্ট্র ও শাসন ক্ষমতার হিফাযত জরুরী। সাধ্যমত হারাম জিনিস থেকে শাসক নিজে বেঁচে থাকবে এবং অপরকেও রক্ষা করতে তৎপর থাকবে। তার ক্ষমতার বাইরে কোন কিছুর জন্য তাকে জিজ্ঞেস করা হবে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অসৎ লোকদেরকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা উচিত নয়। অবশ্য যে ব্যক্তি নেতৃত্ব ও সরদারীর মাধ্যমে দীন প্রতিষ্ঠা ও আল্লাহর পথে জিহাদ করার দায়িত্ব পালনে অপারগ, সে ততটুকু খিদমতই আঞ্জাম দিবে যতটুকু করতে সে সক্ষম। আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে জাতীয় কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখবে, উম্মতে মুহাম্মদীর পরস্পরের মহব্বত ও মঙ্গলের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করবে। অধিকন্তু সাধ্যমত কল্যাণ সাধনে ব্যাপৃত থাকবে। কেননা আল্লাহ্ পাক ক্ষমতার বাইরে কারো উপর দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না বা হুকুম করেন না। আল্লাহর কিতাব কুরআনের পথ নিদের্শনায়ই দীনের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। কেননা ইহা পথ প্রদর্শক। আর এ ব্যাপারে হাদীসে রাসূলের কার্যকরী ভূমিকা রয়েছে। এ দুটিকে পথ নির্দেশক বানিয়ে আল্লাহর সাহায্য অর্জন করা যেতে পারে। স্বয়ং আল্লাহও এ বিষয়ে কুরআনে হুকুম আহকাম বর্ণনা করেছেন।

সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয হলো কুরআনে হাকীম ও হাদীসে রাসূল (সা)-কে সব কিছুর উপর প্রাধান্য দেয়া। অতঃপর একমাত্র আল্লাহরই নিকট সাহায্য ও মঙ্গল কামনা করতে থাকবে। স্মরণযোগ্য যে, দুনিয়া এজন্যই যে একে দীনের খিদমতে ব্যয় করা হবে। যেরূপ হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা) বলেছেন :

يَا ابْنَ اٰدَمَ اَنْتَ مُحْتَاجٌ اِلٰى نَصِيْبِكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَنْتَ اِلٰى نَصِيْبِكَ مِنَ الْاٰخِرَةِ ـ مِنَ الْاٰخِرَةِ اَحْوَجُ فَاِنْ بَدَأْتَ بِنَصِيْبِكَ مِنَ الْاٰخِرَةِ وَبِنَصِيْبِكَ مِنَ الدُّنْيَا نَنْتَظِمُهَا اِنْتِظَامًا وَاِنْ بَدَأْتَ بِنَصِيْبِكَ مِنَ الدُّنْيَا فَاتَتْ نَصِيْبُكَ مِنَ الْاٰخِرَةِ وَاَنْتَ مِنَ الدُّنْيَا عَلٰى خَطَرٍ ـ (قول صحابه)

"হে বনী আদম! তুমি তোমার দুনিয়ার ও সম্পদের মুখাপেক্ষী, তদ্রূপ আখিরাতেও

তোমার সঞ্চয়ের তুমি মুহতাজ কিন্তু আখিরাতের সঞ্চয়ের তুমি অধিক মুখাপেক্ষী। কাজেই তুমি তোমার আখিরাতের অংশ নিয়েই কাজ শুরু কর। আর সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার ভাগের জন্য কিছু চেষ্টা করো। কিন্তু যদি তুমি দুনিয়ার সম্পদের চেষ্টায় প্রথম মনোযোগ দাও, তবে তোমার আখিরাতের সম্পদ হারিয়ে বসবে, আর দুনিয়া তোমার জন্য বিপদজনক হয়ে দাঁড়াবে।"

তিরমিযী কর্তৃক রিওয়ায়েত কৃত নবী করীম (সা)-এর হাদীস তাঁর উক্তির সমর্থন করে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন :

مَنْ اَصْبَحَ وَالْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ هَمِّهٖ جَمَعَ اللّٰهُ لَهٗ شَمْلَهٗ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِىْ قَلْبِهٖ وَاَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِىَ رَغِمَةٌ - وَمَنْ اَصْبَحَ وَالدُّنْيَا اَكْبَرُ هَمِّهٖ فَرَّقَ اللّٰهُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهٗ وَجَعَلَ فَقْرَهٗ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهٖ مِنَ الدُّنْيَا اِلاَّ كُتِبَ لَهٗ - (ترمذى)

"যে ব্যক্তির এমতাবস্থায় ভোর শুরু হয় যে, আখিরাতের চিন্তাই হয় তার মূখ্য বিষয়, আল্লাহ পাক তার অবস্থা সুসংহত করে দেবেন এবং তার অন্তরে প্রাচুর্যের প্রশান্তি সৃষ্টি করে দেবেন, আর দুনিয়া তার নিকট লাঞ্ছিতাবস্থায় হাযির হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় সকাল করে যে, দুনিয়াই হয় তার মূখ্য উদ্দেশ্য, আল্লাহ তার মালামাল বিচ্ছিন্ন করে দেবেন। আর দারিদ্র্য তার চোখের সামনে উপস্থিত হবে। বস্তুত দুনিয়াতে সে পরিমাণই পাবে, আল্লাহ পাক তার জন্য যে পরিমাণ লিখে রেখেছেন।"

প্রকৃতপক্ষে এ হাদীসের মূল ভাবধারা কুরআনে হাকীমেও নিহিত বিদ্যমান যেমন−

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَ لِيَعْبُدُوْنِ - مَا اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِنْ رِّزْقٍ وَّمَا اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنَ - اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنِ -

(سورة الذاريت : ٥٨-٥٦)

"আমার দাসত্ব ও নিরঙ্কুশ আনুগত্যের জন্যই আমি সৃষ্টি করেছি মানুষ এবং জিনকে। তাদের নিকট থেকে আমি রিযক চাই না আর এও কামনা করি না যে, তারা আমার আহার্য যোগাবে। একমাত্র আল্লাহই রিয্ক দান করেন এবং তিনি প্রবল পরাক্রমশালী সত্তা।" (সূরা আজ জারিয়াত : ৫৬-৫৮)

পরিশিষ্ট ও দু'আ

মহান আল্লাহর দরবারে আমরা এই বলে দু'আর হাত তুলছি, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে, আমাদের দীনী ভাইদেরকে এবং মুসলিম কাওমের সকলকে তোমার সেই প্রিয় বস্তু দান করো, যাতে তুমি সন্তুষ্ট।

فَاِنَّهُ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ - وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا دَائِمًا اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ -

(সমাপ্ত)

আহসান পাবলিকেশন

মগবাজার বাংলাবাজার কাটাবন



www.ahsanpublication.com